সোনার চেয়ে দামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই খণ্ড একত্রে

প্রথম মুদ্রণ

ভাদ্র ১৩৬৭

প্রকাশিকা

অরুণা বাগচী

অরুণা প্রকাশনী

৭ যুগলকিশোর দাস লেন

কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট

পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর

মথুরামোহন দত্ত

মা শীতলা প্রেস

১০ ডব্লু. সী. ব্যানার্জী স্ট্রীট

কলকাতা ৬

বেকার

১

মাসখানেক গলাটা খালি সাধনার।

সোনার হারটি একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। এখানে ওখানে ছিঁড়ে যেতে আরম্ভ করার পরেও টিপেটুপে নিয়ে আর স্তো দিয়ে বেঁধে কছুকাল গলায় লটকানো গিয়েছিল। তা ওভাবে জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করাও অসম্ভব হয়ে যাওয়ায় এখন বাধ্য হয়ে বাক্সে তুলে রাখতে হয়েছে।

ও হার আর গলায় ঝুলানোর মানে হয় না।

পরতে গেলেই ছিঁড়ে যাচ্ছে। হয় স্তোর বাঁধন নয় জোড়ের কোন মুখ। হারটা শেষে কোথায় পড়ে গিয়ে হারিয়ে যাবে জন্মের মত। তার চেয়ে বাক্সে তালা থাকাই ভাল।

দিনরাত্রি কাটছে একেবারে শূন্য গলায়। ওই যে কথায় বলে গলায় দড়িও জোটে না সেইরকম যেন অবস্থা। সাধনা অবশ্য গলায় দড়ির কথা ভাবেও না, মুখে বলেও না। অত সস্তা মেয়ে সে নয়। কিন্তু অসুবিধাটা সত্যই সে বোধ করেছে নিদারুণভাবে। সর্বদাই কেমন একটা বিশ্রী বে-আব্রু ভাব।

রাত্রে অবশ্য কেউ দেখতে আসে না গলায় তার সোনার আবরণের প্রতীক এই আভরণটি আছে কিনা। রাখালের কাছে তার কোনরকম আব্রু দরকার হয় না এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ-রাত্রির শুরু রাত সাড়ে দশটা এগারটার পর। ভোর থেকে আত্মীয়বন্ধু পাড়াপড়শী সবার সামনে শূন্য গলায় বার হতে হয়—এই একটানা অস্বস্তিটাই কাবু করেছে সাধনাকে।

সবাই যেন বিশেষ করে বিশেষ দৃষ্টিতে তার গলার দিকেই তাকায় আজকাল।

মুখে কিছু বলে না অনেকেই। কিন্তু মুখের ভাব দেখে বেশ বোঝা যায় মনে মনে তারা আঁচ করে নিয়েছে ব্যাপারটা কি।

বিশেষত সবাই যখন জানে যে রাখাল আজ অনেকদিন বেকার, ছাঁটাই হবার পর এখন পর্যন্ত আর সে কাজ জোটাতে পারে নি।

রাখাল অনেকদিন বেকার আর সাধনার গলাটা একদম খালি। দুটি সহজ সত্যের যোগ কষে দিলেই কি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে না অভ্রান্ত ?

সকলের অনুমান যদি সত্য হত, যদি সত্যই বেচে দেওয়া হয়ে থাকত হারটা, এতটা খারাপ লাগত না সাধনার। এ যে একেবারে মিথ্যা অনুমান ! স্বামীর বেকারত্ব তার হারটি গ্রাস করে নি, জলজ্যান্ত জিনিসটা বাক্সে তোলা আছে তবু এরকম অন্যায় কথা সকলে ভাববে কেন ?

এটাই বড় প্রাণে লাগে।

ললিতার মত যারা একনজর তাকিয়েই বলে, একি গলা খালি যে ?

তারা বাঁচিয়ে দেয় সাধনাকে।

বলা যায়, আর বলিস কেন ভাই !

গয়নাটার কি হয়েছে শোনানো যায়। শহরের নামকরা মস্ত জুয়েলারি দোকান একগাদা মজুরি নিয়ে কি ছাইয়ের গয়নাই গড়িয়ে দিয়েছিল, তিনটা বছর টিকল না ?

কি দশা হয়েছে গ্যাখ্।

বলে, জিনিসটা বার করে দেখানোও যায়। প্রত্যক্ষ অকাট্য প্রমাণ যে স্বামী বেকার বটে তবু হারটা তার বজায় আছে।

কিন্তু সবাই তো এরকম সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে না।

শোভার মা বার বার গলার দিকে তাকায় কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলে না।

অতিষ্ঠ হয়ে যেচে তাকে গয়নাটা বার করে শোভার মার হাতে দিয়ে বলতে হয় মাসীমা, দেখুন তো কিজন্য এমন হল ? এত নামকরা দোকানের জিনিস এমনভাবে খসে খসে গেল কেন ? প্যাটার্নটার জন্যে, না সোনাই খারাপ ?

বেলা আসে। ছেলেবেলার বন্ধু বেলা। গলার দিকে চেয়ে বলে, পাঁচটা টাকা চাইব ভেবেছিলাম। তা বুঝতেই পারছি তোকে কে দেয় তার ঠিক নেই।

সাধনা ম্লান হেসে বলে, এ আর বোঝা কঠিন কি ?

সাধনা অপেক্ষা করে। বেলা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে কিভাবে কেন হারটা গেল, কি বৃত্তান্ত। ভদ্রতা বাঁচিয়ে কথাটা এড়িয়ে যাবার সম্পর্ক তার সঙ্গে বেলার নয়।

কিন্তু বেলাও এড়িয়ে যেতে চায় কথাটা।

অগত্যা তাকেই যেচে বলতে হয়, গলার হারটা—

বেলা সঙ্গে সঙ্গে বলে, থাক্ না ভাই, শুনতে চাই না। আমি জানি।

: শোন্ না কথাটা।

: না না আমি শুনব না। জানা কথা আবার শুনব কি? তোকে বলতে হবে না।

: একটা পরামর্শ চাইছি।

: পরামর্শ?

সাধনা হারটা বার করে। বলে, মেরামত করাব, না নতুন করে গড়াব? কোথায় দেব বল্ তো? ওই বড় দোকানেই দেব, না সাধারণ স্যাকরার কাছে দেব? বড় দোকানে সত্যি আর আমার বিশ্বাস নেই।

বেলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, হারটা তবে বেচিস নি!

সাধনাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, না।

কিন্তু এভাবে মুখ রাখা যায় কতজনের কাছে? যেচে যেচে কতজনকে কৈফিয়ত দেওয়া যায়? তার কি আর কাজ নেই, ঝনঝাট নেই, দুর্ভাবনা নেই! এর চেয়ে একটা কাগজে লিখে গায়ে এঁটে রাখাই সোজা—গয়না আমার বিক্রী হয় নি গো, তোমরা যা ভাবছ সত্যি নয়!

কিন্তু কেন এই অস্বস্তি? এই লজ্জাবোধ? এত তার খারাপ লাগবে কেন? একথাও সাধনা ভাবে।

গুণহীন অপদার্থ মানুষ তো রাখাল নয়। নিজের খেয়াল খুশীতে সে তো বেকারত্ব বরণ করে ঘরে বসে নেই। বাপের জমিদারি বা নিজের যথাসর্বস্ব বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়ে সে তো এই দুরবস্থা ডেকে আনে নি। খাটতে সে অরাজী নয়। যেমন প্রাণপণে খেটে কলেজে সে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তেমনি মন দিয়ে প্রাণপণে খেটে সে করে যাচ্ছিল অফিসের কাজ। বিনা দোষে ছাঁটাই হওয়ার জন্য সে তো দায়ী হতে পারে না। অলস হয়ে সে বসেও নেই, কাজের খোঁজে ঘোরাটাই তার দাঁড়িয়ে গেছে প্রাণান্তকর খাটুনিতে, সেই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া তিনটে টিউসনি। এত চেষ্টা করেও কাজ না পেয়ে হারটা যদি নিরুপায় হয়ে বেচেই দিয়ে থাকে রাখাল, দশজনে কি ভাবছে ভেবে তার এত খারাপ লাগার কি আছে?

আজ তো সকলেরই এরকম দুরবস্থা। নিছক পেটের জন্য আর একেবারে উলঙ্গ হওয়া ঠেকাবার জন্য কত লোকে শেষ সম্বলটুকুও বেচে দিচ্ছে। তারাও নয় সেই দলে ভিড়েছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক।

হারটা এখনো অভাবের গ্রাসে যায় নি। কিন্তু গেলেও খাপছাড়া ব্যাপার

হত না কিছুই। দশজনে যদি ধরেই নেয় যে তাই ঘটেছে, সে কেন এত বিচলিত হয়?

যা খুশী ভাবুক না দশজনে!

কিন্তু এত ভেবেও মনে জোর পায় না কিছুতেই। কোন মতেই সে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারে না যে দশজনে মিথ্যা করে তার স্বামীকে তার গলার হারটা বেচে দেবার অপরাধে অপরাধী ভাবছে।

কোথায় যেন বড় একটা ফাঁকি রয়ে গেছে জীবনে। শাড়ি গয়না দিয়ে দশজনের কাছে বড়লোক সাজবে, স্বামীসোহাগিনী সাজবে—এ চিন্তাটাও আজ হাস্যকর হয়ে গেছে। সকলের সঙ্গে অতল ফাঁকিতে হাবুডুবু খেতে খেতে এসব ছেলেমানুষী ফাঁকির খেলায় আর মন মজে না, সারা গায়ে গয়না-চাপানো বাসন্তীকে দেখলে শুধু হাসি পায় না, গাও যেন ঘিন ঘিন করে। অথচ রাখাল তার গলা খালি করে হারটা বেচে দিয়েছে—দশজনের এই ভুল ধারণাটা অসহ্য ঠেকছে তার। খালি গলার দিকে মানুষ নজর দিলে বিশ্রী লাগার সীমা থাকছে না।

হাতে শুধু শাঁখা পরে ভোলার মা পাঁচ বছরের ছেলেকে সাথে নিয়ে ডিম বেচতে আসে, সে নজর দিলে পর্যন্ত।

একতলাটা দু'ভাগ করা। ওপাশের ভাগটা সম্পূর্ণ বাসন্তীদের দখলে। এপাশে একখানা ঘরে সাধনা থাকে,—অন্য ঘর দুখানা আশাদের। তার স্বামী সঞ্জীব ভাল চাকরি করে।

ছোটখাট হলেও এভাগের যেটা রান্নাঘর, আগে সাধনাই সেখানে রাঁধত। এখন আশাকে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে তাদের ভাড়া কমেছে সাত টাকা।

ভাগের দেয়ালে লাগানো তার ঘর। টিনের চালার কলঘরটার মধ্যে একটু সরু ফাঁক, ঘরে যাতায়াতের জন্য। এই ফাঁকের কোণটা ঢেকে নিয়ে সাধনা রান্না করে। উনানের ধোঁয়া আর রান্নার ঝাঁঝ জানলা দিয়ে ঘরে যায়, বসে রাঁধতে রাঁধতে মনে হয় ঘরের দেয়াল আর কলঘরের দেয়াল বুঝি গায়ে ঠেকছে দু'দিক থেকেই।

বাসন্তী এসে বলে, কি রাঁধছেন ভাই। লাউ খোসার ছেঁচকি? আঃ, কি সুন্দর যে লাগে! আমি কখনো ফেলি নে। চিংড়ি দিয়ে মুগডাল ভেজে লাউ রাঁধি, তার চেয়ে ভাল লাগে খোসার ছেঁচকি!

সাধনার চেয়ে দু'চার বছর বেশীই হবে বয়স। একটু বেঁটে সর্বাঙ্গ পুষ্ট ও স্পষ্ট। সেই সর্বাঙ্গে যেখানে আঁটা সম্ভব সেখানেই গয়না।

বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে বিড়ির পাতা আর তামাকের ছোটখাট ব্যবসা করে বৌকে এত গয়না দিয়েছে রাজীব।

তাও সে বৌ রোজ কোমর বেঁধে ঝগড়া করে! প্রত্যেক দিন বাসন্তীর গলা দু-একবার তীক্ষ্ণ উঁচু পর্দায় চড়ে যায়, কলহের ধারালো কথাগুলি এপাশ থেকেও শোনা যায় স্পষ্ট।

এত গয়না গায়ে দিয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে দেয়ালের ওপাশ থেকে ঘুরে তার সঙ্গে কথা কইতে আসে! রাখাল বেকার, সাধনার গলা শূন্য, তবু যেন তার ভাবনা নেই যে ভাব করতে গেলে সাধনা পাছে কিছু চেয়ে বসে।

এক অংশে বাস করেও আশা কিন্তু তাদের এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে আশ্চর্য কৌশলে। সঞ্জীবও।

মানুষটা আশা যে বাকসংযমী তা নয়। রাখালের চেয়েও বড় রকমের বেকার; ঘরছাড়া দেশছাড়া একটা মানুষের বৌ ভোলার মা ডিম বেচতে এলে সে এক জোড়া ডিম কিনে দশ জোড়ার কথা জিজ্ঞেস করে। মানুষ এত নিরুপায় হয়েও টিকে থাকতে পারে ধারণা করা কঠিন, তাই বোধ হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে তার ভাল লাগে। সমানভাবে কথা কইতে হয় না, আলাপ করলে টাকা পয়সা ধার চেয়ে বসবে এ ভয়ও নেই। শুধু ডিমের দামটা দিলেই চলে। বাসি বাড়তি রুটি থাকলে একখানা একটু চিনি দিয়ে ভোলার হাতে দিলে তো কথাই নেই।

পুরনো ছেঁড়া আর ময়লা হোক, ভোলার মা'র পরনের কাপড়খানা তাঁতের এবং রঙীন। নতুন হলে আশাও নিশ্চয় পরতে আপত্তি করত না। এই কাপড়খানাই সব সময় ভোলার মা'র পরনে দেখা যায়। সরকারদের মস্ত বাগানটার প্রাচীরের পাশ দিয়ে তফাতে ফাঁকা জমিতে হোগলার যে খেলাঘরগুলি উঠেছে, তারই একটাতে তারা থাকে। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে একটি। ওই হতভাগীই এখন নাকি সবার বড় দুর্ভাবনা—ভোলার বাপ-মার।

ভোলার মা কাঁদুনি গায় না। দুর্দশার সে স্তর তারা পার হয়ে গেছে। বোধ হয় সেই জন্যই নানা কথা জিজ্ঞাসা করার পরেও দাম দেবার সময় আশা যখন অনায়াসে বলে, তোমার ডিমের দাম বেশী ভোলার মা!

তখন ভোলার মা রাগও করে না, নিজের দুরদৃষ্টকে শাপও দেয় না, সোজা-সুজি স্পষ্ট ভাষায় বলে, কি কথা কন? এক পয়সা বেশী না। বাজার দরে বেচি। উনি পাইকারী দরে কিনা আনেন, খুচরা দরে বেচনের লাভটুকু থাকে।

সাধনাকে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনে নিবেন না?

সধনা মাথা নাড়ে।

তার গলার দিকে চেয়েই যেন ভোলার মাও মাথা হেলিয়ে তার ডিম কেনার অক্ষমতায় সায় দেয়, না কেনাকে সমর্থন করে!

গলার কাছটা শির শির করে সাধনার। বিছাহারের শূন্যতা যেন বিছার মত হাঁটছে।

রাখাল পাড়ার একটি স্কুলের ছাত্রকে সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পড়ায়। পড়িয়ে সটান চলে যায় মাইলখানেক দূরে আরেকটি কলেজের ছাত্রকে পড়াতে।

বাড়ি ফিরে নেয়ে খেয়ে বার হয়। সারাদিন ঘোরে চাকরি এবং রোজগারের চেষ্টায়—আরও কিসের ধান্দায় সাধনা জানে না। সন্ধ্যায় রাখাল একটি ছাত্রীকে পড়ায়—দুঘণ্টা। এই টুইসানিটাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাসান্তে ক'টা টাকা পাওয়া যায় বলেই শুধু নয়, রোজ এখানে সে চা আর কিছু খাবার পায়—অন্ততঃ দুখানা বিস্কুট।

আশ্চর্য যোগাযোগ! সারাদিনের শ্রান্তি বয়ে নিয়ে গিয়ে শুধু ওই চা আর খাবারটুকু পেয়ে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, প্রভাকে ভাল করে পড়াতে পারে বলে প্রভারাও খুশী হয়ে তাকে রোজ চা জলখাবার দেয়।

যেদিন বাসে ফেরে রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হয়। হেঁটে ফিরলে দশটা বেজে যায়।

হেঁটে ফিরলে সাধনা বলে, ছ'টা পয়সা বাঁচালে। দেহের ক্ষয়টা হিসাব করেছ? যে রোগটা হবে দু'শো টাকায় সারাতে পারবে?

রাখাল মুখ বাঁকায়। —রোগ হলে আর সারাবে কে? জ্যোৎস্নারাত, বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম। ছ'পয়সার সিগারেট কিনলাম তিনটে।

সাধনা চুপ করে থাকে। গা যখন জ্বলে যায় তখন কথা কওয়া মানেই ঝগড়া করা। তিনটে সিগারেট কিনতে হবে, তার অজুহাত হল জ্যোৎস্নারাত! সিগারেট কেনার দায়ে রাখাল হেঁটে আসে নি, জ্যোৎস্নারাত দেখে শ্রান্তক্লান্ত অভুক্ত দেহটাকে মনের আনন্দে দু'মাইল পথ হাঁটিয়েছে।

খেয়ে উঠে সাধনা মাই দিয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়ায়। বড় হয়েছে, দস্যুর মত আধ-শুকনো মাই টানে ছেলেটা, বহুক্ষণ মাই দুটি তার টনটনিয়ে থাকে। পোয়াটেক গরুর দুধ না বাড়ালে আর চলে না।

হঠাৎ তাই সখেদে বলে, হারটার ব্যবস্থা করবে না? খালি গলায় থাকতে পারব না আমি। নতুন করে তো চাইছি না, সে আশা ছেড়ে দিয়েছি। সোনা

আছে, শুধু মজুরি দিয়ে গড়িয়ে দেবে, তাও জুটবে না কপালে? দশজনের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না।

রাখাল কথা বলে না। গা যখন জ্বলে যায় তখন কথা কওয়া মানেই ঝগড়া করা। তিনটে সিগারেটের একটি আধখানা টেনে নিভিয়ে রেখেছিল, সকালে খাবে। সেটা নিয়ে রাখাল ধরায়। ঘুম আসছে। ঘুমোলেই একেবারে সকাল। তবু মনে হয় সকালের এখনো অনেক দেরী।

মাঝে মাঝে অসহ্য ঠেকলেও দু'চারজনের কাছে যেচে যেচে কৈফিয়ত দিয়ে আর হারটা যে তার বজায় আছে তার প্রমাণ দেখিয়েই সাধনা দিন কাটিয়ে দিত।

মুশকিল হল হঠাৎ রেবার বিয়েটা ঠিক হয়ে যাওয়ায়।

রেবা রাখালের দিদি অনিমার বড় মেয়ে।

বিকালে রেবার বাবা প্রিয়তোষ স্ত্রী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে খবরটা দিতে এবং নিমন্ত্রণ জানাতে আসে।

আচমকা সব ঠিক হয়ে গেছে, আগে থেকে কিছুই জানতে পারে নি, ক'দিন বাদেই বিয়ে—এত অল্প সময়ের নোটিশে মেয়ের মামামামীকে একেবারে বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসার অপরাধটা প্রিয়তোষ যেন কিছুতেই হজম করতে পারছে না। বার বার সে বলে যে আগের দিন না পারলে বিয়ের দিন সকালবেলাই তাদের যাওয়া চাই, না গেলে চলবে না। তারা তিন ভাই, ভিন্ন হলেও তিন ভায়ের ছেলেমেয়ের মধ্যে এই প্রথম বিয়ে হচ্ছে তার মেয়ের—মেয়ের মামামামী না গেলে দশজনের কাছে তারা মুখ দেখাতে পারবে না।

অনিমা বলে, তোমরা না গেলে আমারও কিন্তু মাথা কাটা যাবে ভাই। শুধু রাখালকে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি যেন আবার নিয়ম রক্ষা করো না!

অনিমা তার খালি গলার দিকে চেয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে জেনে জোর করে হেসে সাধনা বলে, কি যে বলেন, রেবার বিয়েতে আমি যাব না?

প্রিয়তোষ বলে, আমরা বরং একটু বসি। রাখালকে নিজে বলে যাব। ও আবার যে রকম মানী লোক—

: ওর ফিরতে রাত দশটা।

তাহলে অবশ্য মহাবিপদ। রাত দশটা পর্যন্ত বসে থাকা তো সম্ভব নয় প্রিয়তোষের পক্ষে। কাল-পরশু আবার যে একবার আসবে তাও অসম্ভব। হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে, কত দিকে কত যে ঝামেলা—

সাধনা হেসে তাকে অভয় দিয়ে বলে, আমায় তো বলে গেলেন, তাতেই হবে।

তার খালি গলার দিকে বিশেষভাবে চেয়ে থেকে প্রিয়তোষ যেন সংশয়ভরে বলে, হবে তো ? না মরি বাঁচি যে করে পারি —

: না না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওর দেখা পাওয়া মুশকিলের কথা। এমনি ছুটোছুটির অন্ত নেই, তার ওপর আরেক কাজ জুটলো. আমার বিয়ের হারটা ছিঁড়ে পড়ে আছে, দু'দিনের মধ্যে সারিয়ে এনে দিতে হবে। আজ করি কাল করি করে অ্যাদ্দিন করে নি, বাক্সে ফেলে রেখেছি হারটা। এবার তো আর গড়িমসি করলে চলবে না। মামী তো আর খালি গলায় হাজির হতে পারবে না প্রথম ভাগ্নীর বিয়েতে !

অনিমার মুখ থেকে ছায়া সরে যায়। প্রিয়তোষ পরম পরিতুষ্ট হয়ে নস্যি নেয়। সাধনার গলা খালি দেখে সেও সত্যি ভড়কে গিয়েছিল। এতক্ষণে সে সিঙাড়ার কোণ ভেঙে মুখে দেয়, ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দেয়।

একখণ্ড ফেলনা কাগজে রাখালের নাম নিজে সই করে পাড়ার ছেলে নন্দকে দিয়ে শ্রীভারতী থেকে চা ও সিঙাড়া আনিয়ে সাধনা কোনমতে এদের কাছে মান-মর্যাদা রক্ষা করেছে। দোকানটা কাছে, তিনটি বাড়ির পরে বামচলা বড় রাস্তার ধারে, পাড়ার রাস্তার মোড়ে—পাকিস্তান থেকে গোড়ার দিকে যারা এসেছিল তাদের একজন, নাম শ্রীসীতাপতি সাহা, মোড়ে বাড়ি করেছে এবং জয়েন্ট রেস্টুরেণ্ট ও ময়রার দোকান খুলেছে। ঘর একটাই, এক পাশে কাঁচওলা আলমারিতে রসগোল্লা, পান্তুয়া প্রভৃতি সাজানো, অন্য পাশে তিনটে ডেস্ক ও বেঞ্চে বসে খাবার বা চা-পানাদির ব্যবস্থা। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট মামলেট ভেজিটেবিল চপ পাওয়া যায়, তার বেশী কিছু নয়, মাংসাদি অপ্রাপ্য। অনেকেই সিঙাড়া দিয়ে চা খায় -সারাদিনে শ' দুই লোক। প্রথম প্রথম রাখালের সঙ্গে সাধনা সিনেমা দেখতে আসা-যাওয়ার সুবিধার জন্য এই দোকানে চা সিঙাড়া খেত।

সে অনেকদিনের কথা। টাকা ত্রিশেক বাকী পড়েছে। তবু এখনো সাধনা তার স্বামীর নাম-সই-করা কাগজের টুকরো পাঠালে দোকান থেকে খাদ্য আসে।

কারবার ছিল সোনার। দোকান দিয়েছে খাবারের। মেয়েরা স্লিপ পাঠালেই সীতাপতি মুখ বুজে খাবার পাঠায়।

চা খাবার খেয়ে আপনজনেরা বিদায় নেয়।

এদিকে সাধনার মনে হয় মাথায় যেন তার বজ্রাঘাত হয়েছে। এমনি না হয় একরকম চলে যাচ্ছিল, খালি গলায় সে বিয়ে-বাড়িতে যাবে কি করে ? আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে সবাই জড়ো হবে সেখানে, কোন মুখে সে গিয়ে সকলের সামনে দাঁড়াবে ?

অথচ না গেলেও সে হবে আরেকটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। ওরা নিজে এসে এত করে বলে গেছে, আগের দিন তারা যদি নিজে থেকে না যায়, পরদিন সকালে নিশ্চয় ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হবে প্রিয়তোষ নিজে কিম্বা তার ছেলে কিম্বা অন্য কেউ।

না যাবার কোন অজুহাত নেই।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে সাধনার। এমনভাবে ভিতরটা জ্বালা করে যে সে নিজেই বুঝতে পারে রাখালের উপর এত রাগ আজ পর্যন্ত কখনো তার হয় নি। রাখাল বাড়ি থাকলে আজ এখন বীভৎস কলহ হয়ে যেত। অন্ধ বিদ্বেষে অবুঝের মতই আঘাত হানত সাধনা।

রাত দশটা পর্যন্ত সময় পাওয়ায় এই মারাত্মক আক্রোশটা তার খানিক জুড়িয়ে আসে। ক্রমে ক্রমে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে সে নিজেই বুঝতে পারে যে এরকম মরিয়া হয়ে শুধু ঘা দেবার জন্য আঘাত করার কোন মানে হয় না। সে রকম সাধ থাকলে এতদিনে রাখালকে সে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারত—নিজেও সেই সঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়ে।

কিন্তু ক্ষোভ যাবার নয়। রেবার বিয়েতে যাওয়া না যাওয়ার সমস্যাটা মিটে যায় নি।

রাখাল বাড়ি ফেরা মাত্র তাকে খবরটা জানিয়েই তিক্তস্বরে না বলে সে পারে না, নতুন কিছু কিনে দেবে সে আশা ত্যাগ করেছি। ভাঙা জিনিসটা শুধু সারিয়ে দেবে, এতদিনে তাও পারলে না, বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল। এখন আমি কি উপায় করি?

: আগে যদি তেমন করে বলতে—

সাধনা ঝেঁজে ওঠে, তেমন করে? মানুষ আবার কেমন করে বলে। আমি বলে চুপ করে থাকি, সব সয়ে যাই। অন্য কেউ হলে—

সাধনা অন্য কেউ হলে কি হত তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাখালের নেই, তবে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না। চারিদিকে গাদাগাদি ঘেঁষাঘেঁষি করে তারি মত উপায়হীনদের পাতা সংসার, প্রাণপাত করেও ভাঙন ঠেকানো যাচ্ছে না। মেজাজ আর তিক্ততার অনেক নমুনাই পাওয়া যায়। তার মধ্যে সোনার গয়না নিয়েও দু'চরটা কুৎসিত মর্মান্তিক ঘটনা কি আর ঘটে না।

রাখাল নিশ্বাস ফেলে বলে, জানি, অন্য কেউ হলে আমায় ঝাঁটা মারত। আমিও সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তাতে আসল ব্যাপারের এতটুকু সুরাহা হত না। তোমার সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি, তাই—

: তামাশা করো না।

: তামাশা করি নি। এরকম সস্তা তামাশা আমি করি? তুমি জানো ওটা সারানো যাবে না, নতুন করে গড়াতে হবে।

: তাই তো বলছি আমি। সোনা কিনে নতুন জিনিস গড়িয়ে দিতে বলেছি তোমায়? শুধু মজুরিটা দিয়ে—

চোখে জল এসে যায় সাধনার। চোখ মুছে বলে, এটুকু অন্তত বুঝবে তো তুমি? এতটুকু তো তাকাবে আমার দিকে? কদ্দিন হয়ে গেল খালি গলায় সসংকোচে বেড়াচ্ছি। রেবার বিয়ে এসে গেল, এবার কি উপায় হবে? শুধু মজুরি দিয়ে জিনিসটা যদি করিয়ে রাখতে, আজ এ বিপদ হত?

: মজুরিও তো সোজা নয়। ওদের দোকানে বেশী মজুরি নেয়—পঞ্চাশ টাকার মত লেগে যাবে। বাজে দোকানে সস্তা হয়, কিন্তু দিতে ভরসা হয় না। আমি তাই ভাবছিলাম—

: তাই করো তুমি, ভেবেই চলো। আমি এদিকে সং সেজে বিয়ে-বাড়ি যাই। অন্য হারটা নিয়েছ মনে আছে?

মনে আছে? সাধনা তাকে ঝাঁজের সঙ্গে নালিশের সুরে জিজ্ঞাসা করছে তার ছোট হারটি বেচে দেবার কথা রাখালের মনে আছে কিনা—এখনো দু'মাস হয় নি। বিয়েতে দুটি হার পেয়েছিল সাধনা। চাকরি থেকে আচমকা বেকারত্বে আছড়ে পড়াটা গোড়ার দিকে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে সাধনাই একরকম জোর করে তাকে দিয়ে ছোট হারটি বিক্রী করিয়েছিল। রাখাল নিজেই বরং ইতস্ততঃ করেছিল কয়েক দিন। সাধনা দ্বিধা করে নি। বাড়তি ওই হারটা মানেই যখন কিছু নগদ টাকা, কেন তারা অনর্থক অচল অবস্থায় হিমসিম খাবে, পরদিন কি দিয়ে রেশন আনা বাজার করা হবে ভেবে কূল-কিনারা পাবে না? চাকরি কি আর হবে না রাখালের? তখন আবার সে তাকে গড়িয়ে দেবে ওরকম একটি সোনার হার। কিছু লোকসান হবে—সোনার কারবারীরা সোনা কেনেও লাভ রেখে বেচেও লাভ রেখে। কিন্তু তার আর উপায় কি।

তখনকার চেয়ে আজ তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে কষ্ট তারা করছে অনেকগুণ বেশী। সেদিন বোধ হয় তারা কল্পনাও করতে পারত না যে এরকম অনটন সয়েও জীবন থেকে প্রায় সব কিছুই ছাঁটাই করে দিয়ে আধা উপবাসেও তারা বেঁচে থাকবে। মাসে মাসে চাকরির বাঁধা মাইনে বন্ধ হওয়ামাত্র সবদিক দিয়ে এই চরম কষ্ট যেচে বরণ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে আবার একটা কিছু জুটে যাবে এই আশাও সেটা সম্ভব হতে দেয় নি। সম্ভব হলে তাদের সামান্য সম্বলটুকু অত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত না।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সাধনা সেজন্য কখনো আপসোস করে নি। যা সম্ভব ছিল না সেজন্য দুঃখ কিসের? সম্বল খুইয়ে এভাবে একটু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার বদলে চরম দুর্গতির এই স্তরে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়লে হয় তো তারাই শেষ হয়ে যেত। এখনো তবু তারা টিকে আছে, এখনো লড়াই করছে, এখনো আশা আছে সুদিনের। এটুকু বুঝবার মত সহজ বুদ্ধি সাধনার আছে।

কিন্তু আজ তার হয়েছে কি? এমন অবুঝের মত কথা বলছে কেন? সাধনা কি জানে না নতুন হার গড়াবার মজুরি দেবার ক্ষমতাও তার নেই? সারা মাস টুইসনি করে যা পায় অনটন সেটা শুষে নেয় তপ্ত তাওয়ায় জলের ফোঁটার মত?

নিছক বেঁচে থাকার জন্য যা না হলে নয় মানুষের সেই প্রয়োজনগুলিও তাদের মেটে না?

জেনেও আজ এভাবে নালিশ জানাচ্ছে, অনুযোগ দিচ্ছে। সেই হারটির কথা তুলে খোঁচা দিতে তার বাধছে না!

সব দিকে সব বিষয়ে এত হিসাব বুদ্ধি বিবেচনা আর ধৈর্য সাধনার, আজ গয়নার ব্যাপারে সে সম্ভব অসম্ভব ভুলে গেল?

দুঃখে চোখে জল আসতে পারে। মাঝে মাঝে কাঁদাও দুঃখেরই অঙ্গ। তাতে শুধু ক্ষতি নেই নয়, সেটা ভালই। কাঁদলে দুঃখের চাপ কমে যায়। সাধনাকে কাঁদতে দেখলে একটা অদ্ভুত অসহ্য কষ্টে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে যায় রাখালের কিন্তু তার সহজ বুদ্ধি গুলিয়ে যেতে দেখে কষ্টবোধের সঙ্গে জাগে দারুণ একটা আতঙ্ক!

মনে হয়, সর্বনাশ! তাহলে তো আর বাঁচা যাবে না!

সাধনা যদি ধৈর্য হারায়, অবুঝ হয়ে পড়ে, এ অবস্থায় বাঁচার লড়াই চালাবার সবচেয়ে বড় অবলম্বনটাই সে যদি হারায়, দুজনেই তারা শেষ হয়ে যাবে।

ঘুমের মধ্যে খোকা স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে। দু'বছরের শিশুর স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠার মধ্যেও কেমন একটা অস্বাভাবিক আর্ত স্বর। বিকৃত বিভ্রান্ত নিঃস্ব জীবনের প্রচণ্ড ক্ষোভ আর বিক্ষোভ এতটুকু অবুঝ শিশুর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভয়ের স্বপ্ন যেন হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশী ভয়ঙ্কর কিছু।

ছেলেকে থাপড়ে শান্ত করতে গিয়ে সাধনা নিজেও যেন শান্ত হয়ে যায়। তার স্বাভাবিক হিসেবী স্বরে বলে, আমি বলি কি, এটা বেচে দাও। ওই টাকায় কম সোনার তৈরী হার একটা কিনে ফেলি। একটু সরুই নয় হবে।

: না।

: কেন ? দোষ কি ?

: তুমি ভুলে গেছ, আমি ভুলি নি। তোমার ওই হারটা বেচবার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার গায়ের এক রতি সোনা জীবনে কখনো বেচব না।

এতক্ষণে সাধনার মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। সেই সকালে তেলের অভাবে বেগুনভাজার বদলে বেগুনপোড়া দিয়ে দুটি খুদ-মেশানো চালের ভাত খেয়ে উপার্জনের ফিকির খুঁজতে বেরিয়ে রাখাল রাত প্রায় দশটায় বাড়ি ফিরেছে, এটা কি এতক্ষণে তার খেয়াল হয়েছে ? মনে পড়েছে বেকারির খাটুনিতে শ্রান্ত ক্লান্ত আধমরা মানুষটাকে একটু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করাও দরকার ?

তার হাসি দেখে এই সন্দেহই জাগতে থাকে রাখালের মনে। নিজেকে সে গুটিয়ে নিতে থাকে নিজের মধ্যে। আর সহ্য হয় না। বোমার মত ফেটে গিয়ে আজ সাধনাকে চরমভাবে বুঝিয়ে দেবে যে তার কাছে এরকম ফাঁকা হাসি আর নেকামির কোন দাম নেই।

সাধনা শুধু মুখ ফুটে একটা মিষ্টি কথা বলুক ! তাই যথেষ্ট মনে করবে রাখাল।

সাধনা হাসিমুখেই বলে, আমি কিছুই ভুলি নি। গা জ্বলে গিয়েছিল তোমার কথা শুনে।

বোমার মত ফাটার বদলে রাখাল ঝিমিয়ে যায়,—তাই নাকি ! কিছু তো বল নি !

: গা জ্বলে গিয়েছিল বলেই বলি নি। বললে ঝগড়া হত। সেদিন বলি নি, আজ বলছি। হারটা বুঝি বেচেছিলে তুমি ? গয়না আমার, তুমি বেচবে কি রকম ? আমার গয়নারও মালিক নাকি তুমি যে ও রকম প্রতিজ্ঞা কর ? সেবারও আমার গয়না আমি বেচেছিলাম, এবারও আমিই বেচব। সেবারের মত এবারও আমার হয়ে তুমি দোকানে যাবে এইমাত্র।

: তাই নাকি !

: তা নয় ? তুমি পরামর্শ দিতে পার, বারণ করতে পার, ধমক দিতে পার— একবার কেন, একশোবার ? তুমি জোর করে বললে আমি কি সত্যি সে হারটা বেচতাম, না এটা বেচব ? সে হয় আলাদা কথা। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা বললে কি না। ও রকম প্রতিজ্ঞা তুমি করতেই পার না।

রাখাল আলনায় ঝুলানো জামার পকেট থেকে আধখানা সিগারেট বার করে এনে ধরায়। এই আধখানা সিগারেট তার রাত্রে খাওয়ার পর টানার জন্য বরাদ্দ থাকে। তিক্তস্বরে বলে, প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি। তোমার গয়না

তুমি বেচবে কি না বেচবে সেটা ভিন্ন কথা। আমার দরকারে মরে গেলেও আমি তোমার গয়না নিয়ে বেচব না, এ প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি।

: না, তাও তুমি পার না। দরকার কি তোমার একার? ফুর্তি করে উড়িয়ে দেবার জন্য মরে গেলেও বৌয়ের গয়না নেবে না, তুমি কি এই প্রতিজ্ঞা করার কথা বলছ? সংসার চালাবার দরকার তোমার যেমন আমারও তেমনি।

সাধনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কার কিসে কতটা দরকার বোঝাবার জন্যই বোধ হয়। এতক্ষণের তর্কবিতর্ক রাগ আব ঝাঁজালো অভিমান কোথায় উড়ে যায় কে জানে, আতঙ্কে রাখালের বুক ধড়ফড় করে। কোথায় গেল সাধনা? কিছু করে বসবে না তো?

এক পলকে সে বুঝে গেছে, এ সমস্তই ফাঁকি। দশজনের মত বৌ ছেলে নিয়ে সংসার করতে চায় অথচ সংসার করবার জন্য দরকারী পয়সা উপার্জনের ক্ষমতা তার নেই, নানা প্যাঁচালো কথায় সে তাই সাধনাকে মজিয়ে রাখতে চায়, নিজেকে খাড়া রাখতে চায় সাধনার কাছে।

স্বামী রোজগার করবে আর বৌ ঘর সামলাবে, এই চিরন্তন রীতির সংসারটা আজো তার কাম্য হয়ে আছে—অচল হয়ে এলেও যে ভাবে হোক চালিয়ে যেতে হবে। ভিত্তিটা সে বজায় রাখতে চায় আগের দিনের—অথচ আসলেই তার ফাঁকি। সংসার আছে, রোজগার নেই। সংসারের মায়া আছে, রোজগারের সামর্থ্য নেই।

সাধনা ফিরে এসে বলে, তবে তাই ঠিক রইল। সকালে আগে এটা করবে, তারপর অন্য কাজ। খাবে এসো।

: আমি তো খাব না।

চোখ বড় বড় করে সাধনা বলে, খাবে না মানে? ছেলেমানুষি করো না!

ছেলেমানুষের মত সে ভাতের উপর রাগ করতে পারে ভেবে সাধনা যে ভঙ্গি করে তাতে হঠাৎ তাকে ভারি সুন্দর মনে হয় রাখালের। অনেকদিন পরে মনে হয়। এবং সেজন্য এটাও তার খেয়াল হয় যে, সাধনার রূপ-লাবণ্যে আজকাল বেশ ভাঁটা পড়েছে। তাকে আদর করাও আজকাল একরকম হয়ে ওঠে না। সময়ের অভাবে নয়। শক্তি আর ইচ্ছার অভাবে।

: খাব না মানে খেয়ে এসেছি। প্রভাদের বাড়ি খাইয়ে দিল।

সাধনা বলে, এতক্ষণ বল নি?

: বলবার সময় দিলে কই? ঘরে পা দেওয়ামাত্র গয়নার কথা আরম্ভ করলে।

: আমি তবে খেয়ে আসি।

ঘরে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে রাখালের একটা গুরুতর কথা মনে পড়ে যায়। সাধনাকে কথাটা বলতে তার এক মুহূর্ত দেরী সয় না, তাড়াতাড়ি উঠে যায় রোয়াকের কোণে সাধনা যেখানে খেতে বসেছে।

খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সাধনার।

: তুমি তো শুধু নিজের গেলার ব্যবস্থা ঠিক করলে। একটা কথা ভেবেছ?

: কি কথা?

: রেবাকে কিছু দিতে হবে না?

সাধনার হাত অবশ হয়ে ভাতের গ্রাস পড়ে যায়। সুখের বিষয় থালাতেই পড়ে। ভাতের বড়ই টানাটানি আজকাল।

রাখাল চেয়ে ছাখে, এলুমিনিয়মের ভাতের হাঁড়িটা শূন্য, সাধনা চেঁছেপুছে সব ভাত বেড়ে নিয়েছে। ডালতরকারীর পাত্র দুটিও চাঁছামোছা।

অর্থাৎ সে আজ বাইরে থেকে খেয়ে না এলে যে ভাত আর ডালতরকারী দুজনে ভাগ করে খেত, সাধনা একাই তা খেয়েছে। অনেকদিন পরে আজ তাদের পেট ভরেছে দুজনেরই। তার ভরেছে বড়লোকের বাড়ির মাংসভাতে, সাধনার ভরেছে স্বামীর ভাগের অন্নটুকু বাড়তি পেয়ে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে হেঁসেল তুলে ঘরে গিয়ে সাধনা বাক্স খোলে। কিনে কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, নিজের বিয়েতে পাওয়া কিছু দিয়ে যদি মান রক্ষা করা যায়।

গম্ভীর মুখে হুকুমের সুরে রাখাল বলে, সোনার কিছু দিতে পারবে না।

সাধনা মুখ ফিরিয়ে তাকায়। —কানপাশাটা মজুত আছে। ওটাই দেব।

: তোমার কানপাশা যদি তুমি রেবাকে দাও—

: কি করবে? মারবে? একটা কিনে দাও, আমারটা দেব না। বার আনি সোনাতেই কানপাশা হবে।

: আমরা রেবার বিয়েতে যাব না।

: তুমি না যেতে পার, আমি যাব।

আজ রাত্রে তারা অনেকদিন পরে পেট ভরে খেয়েছে।

আজ রাত্রেই অনেকদিন পরে তাদের সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি সামনা-সামনি সংঘাত বাধল।

একেবারে চুপ হয়ে গেল দুজনে। পেটভরা অন্ন আর বুকভরা জ্বালা কি মানুষকে বোবা করে দেয়?

এ কিরকম কলহ ? এতখানি ভদ্র ও মার্জিত ? স্বামী নিষেধ করে দিল, আমার ভাগ্নীর বিয়েতে তোমার বিয়ের গয়না দেওয়া চলবে না। স্ত্রী জানাল, এ হুকুম সে মানবে না। স্বামী বাতিল করে দিল তাদের বিয়েতে যাওয়া। স্ত্রী জানাল, আরেকজন যাক বা না যাক, সে যাবেই।

সেখানেই শেষ।

একটু কটু কথা নয়, রাগারাগি চেঁচামেচি নয়, গলায় দড়ি দিয়ে বা যেদিকে দু'চোখ যায় চলে গিয়ে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিজ্ঞা নয়, একপক্ষের কপাল চাপড়ানো আর অন্যপক্ষের কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া নয়—একরকম কিছুই নয়।

একটু নীরস রুক্ষ রাগতভাবে পরস্পরের অ-বনিবনাটা যেন পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হল।

তবু দুজনেরি মনে হল বিয়ের পর আজ তারা প্রথম সত্যিকারের কলহ করেছে, একেবারে চরম কলহ, লঘুক্রিয়াতে যা শেষ হবে না।

সংযত ভদ্রভাবেই পরস্পরের বুকে যেন তারা বিষমাখা শেল বিঁধিয়ে দিয়েছে।

যার ফলে হতভম্ব হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকতে হল তাদের।

তারপরেও অবশ্য সাধারণ দরকারী কথা হল সাধারণ ভাবেই। খানিকটা প্রাণহীন উদাসহীনতার সঙ্গে। এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটল দুজনের। প্রাণের জ্বালায় কিছুতে ঘুম না আসায় দুজনেরি মনে হল ভালবাসার খেলায় হয়তো বা এই নিষ্ঠুর ব্যবধান খানিকটা ঘুচিয়ে দেওয়া যাবে। অন্তত সামঞ্জস্য ঘটানো যাবে খানিকটা।

কিন্তু চাইলেই যেমন চাকরি মেলে না, শুধু স্বাদ হলেই তেমনি বিবাদও ঘুচে যায় না মানুষের। সাধের সাধ্য কি বাস্তবকে বাতিল করে দেয়।

সকালে পাড়ার ছেলেটিকে পড়াতে গিয়ে রাখাল ভাবে, তার ছাত্রটির মা-বাবার মত প্রাণ খুলে কোমর বেঁধে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তারা যদি ঝগড়া করতে পারত, ওদের মতই আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সব মিটমাট করে নিতে পারত নিজেদের মধ্যে—যেন কিছুই ঘটেনি।

সকালবেলা কলতলায় জলের জন্য দাঁড়িয়ে বাড়ির পাশের অংশের নতুন ভাড়াটে রাজীবের স্ত্রী বাসন্তীর চড়া ঝাঁঝালো সরু গলার আওয়াজ শুনতে শুনতে সাধনা ভাবে, ছোট বড় সব ব্যাপারে সেও যদি এইরকম যখন তখন মেজাজ দেখাত আর রাখাল সেটা সয়ে যেত !

রাখালের সকালের এই ছাত্রটি সতীশ মল্লিক চৌধুরীর ছেলে বিশু। দেবেন ঘোষের দোতলা বাড়িটা কিনে নিয়ে সতীশ সপরিবারে পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে বসবাস করতে এসেছে। বিশু সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, বুদ্ধি একটু ভোঁতা। কিন্তু মুখস্থ করে পরীক্ষায় বেশ পাস করে এসেছে বরাবর।

গোড়ায় প্রতিদিন এক ঘণ্টা তাকে পড়া বোঝাবার চেষ্টায় রাখাল হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। মাস দুয়েকের মধ্যে নিজের বোকামি বুঝতে পেরে এখন সে বিশুকে যতটুকু তার সহজবোধ্য ততটুকু বুঝিয়ে বাকী পড়া মুখস্থ করতে দেয়।

মাসকাবারে বেতনের টাকা নেবার সময় মনটা একটু খচ্ খচ্ করে। কিন্তু উপায় কি ! একটি ছাত্রের সঙ্গে লড়াই করে সে তো সংসারের একটা ব্যবস্থা পাল্টে দিতে পারবে না একা।

সতীশ ছেলেমেয়েকে দামী পেস্ট আর দাঁতের বুরুশ কিনে দিয়েছে, নিজের কিন্তু তার দাঁতন ছাড়া চলে না। ছত্রিশ হাজার টাকায় কেনা তার এই বাড়িটাতে যেটা ছিল পৃথক কিন্তু পাকা বাথরুম, সেটাকে সে পরিণত করেছে গোয়ালঘরে। তিনটি গরুর মধ্যে একটি গাভীন, অন্য দুটি দুধ দেয়।

একটির বাছুর মরে গেছে। দেশে সতীশেরা বাছুর-মরা গরুর দুধ খেত না। এখানে গয়লা রামেশ্বরের পরামর্শে মরা বাছুরের চামড়া খড়ে জড়িয়ে বাঁশের বাতায় ঠ্যাং লাগিয়ে সামনে রেখে গরুটির দুধ দোয়ানোর ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে।

তবে এ গরুর দুধটা ছেলেমেয়েরাই খায়। বাছুরওয়ালা গরুটির দুধ ভিন্ন দোয়া হয় সতীশের জন্য, জ্বালও দেওয়া হয় ভিন্ন কড়াই-এ! নিয়ম-ভাঙা অনিয়ম তার চেয়ে ছেলে-মেয়েদের পক্ষে মেনে নেওয়া অনেক সহজ।

দোতলায় কোণার ঘরে পড়ানোর ব্যবস্থা। মেঝেতে শীতল পাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। বৈঠকখানা আছে কিন্তু সেখানে সতীশ বসবে নিজে। অন্তঃপুরে নিরিবিলিতেই ছেলেপিলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

ছেলের মাস্টারও খানিকটা গুরু জাতীয় মানুষ। পরের মত তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখতে মন খুঁতখুঁত করে। শিক্ষাদানের মত পুণ্য কাজটা তিনি বাড়ির মধ্যে ঠাকুরঘরে করবেন এটাই সঙ্গত।

ভক্তিভাজন পুণ্যকর্মা মানুষ বলেই বাড়ির লোকের সাধারণ চা-খাবারের ভাগ রাখালকে দেওয়া হয় না। বিশু খাবার খায়, একবাটি দুধ খায়, রাখাল জানালা দিয়ে খানিক তফাতে ফাঁকা মাটির মধ্যে ছেলেবেলার ঘরের মত ছোট ছোট কুঁড়ে দিয়ে গড়া উদ্বাস্তদের কলোনিটার দিকে চেয়ে থাকে। ভোলার মা ওই কলোনি থেকে ডিম বেচতে বেরোয় চারিদিকের পাড়ায়।

দেখা যায়, রাস্তার কলটাতে কলোনির দশ-বারোটি মেয়ে বৌ ভিড় করেছে।

পূজা-পার্বণের প্রসাদ মাঝে মাঝে রাখাল পায়! বিশুর মা অথবা তার বিধবা বোন নির্মলা থালায় সাজিয়ে ফলমূল নাড়ু মোয়া তক্তি সন্দেশ ইত্যাদিতে প্রায় পনের বিশ রকমের প্রসাদ এনে দেয়।

বলে, প্রসাদ খান।

বিশুর মা'র রঙ একটু কালো। দেহটি যেন সযত্নে কুঁদে গড়া। কে বলবে তার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, বড় মেয়ের বয়স সতর-আঠার এবং সম্প্রতি মেয়েটির একটি ছেলে হওয়ায় সে দিদিমা হয়েছে। পয়সারও অভাব নেই—অন্তত এতকাল মোটেই ছিল না—খাটবার লোকেরও অভাব নেই, তবু প্রাণের উল্লাসে বিশুর মা সংসারের পিছনে কি খাটুনি খাটে আর কত নিয়মনীতি মেনে চলে দেখে রাখাল বুঝতে পেরেছে তার দেহের ঠাট কিসে এরকম বজায় আছে।

শুধু ভাল খাওয়া ভাল থাকার জন্য নয়। দেহ-মনের সমস্ত অকারণ ক্ষয়ক্ষতি নির্যাতন বর্জন করার জন্য। সতীশের সঙ্গে যখন তখন ঝগড়া করে কিন্তু মানুষটা সে সোজা সহজ সংযমী—সংস্কার কুসংস্কার গ্রাম্যতা সভ্যতা নিয়মনীতি সমেত নিজের জীবনে মশগুল। স্বামীর সঙ্গে কলহ তার কাছে সংসারধর্ম ঠিকমত পালন করারই একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার, তার বেশী কিছু নয়।

ব্রত পূজা-পার্বণের উপলক্ষে বিশুর মা'র উপবাস লেগেই আছে। আজ বা এ মাসে এটা খেতে নেই, কাল বা ও মাসে ওটা খেতে হয়, এসব নিয়ম পালনের ব্যাপারেও সে খুব কড়া।

প্রথম প্রথম অবজ্ঞার হাসি ফুটত রাখালের মুখে। ভাবত, ময়রার অরুচি জন্মে মিষ্টান্নে। সব রকমের পুষ্টিকর সুখাদ্য যার এত বেশী জোটে যে শুধু চেখে দেখতে গেলে পেট খারাপ হতে বাধ্য, সে ব্রত-পার্বণের অজুহাতে উপোস করবে না তো করবে কে?

ক্রমে ক্রমে সে বুঝেছে অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কথাটা। বুঝেছে সাধনাকে পেট ভরে খেতে না পেয়ে চোখের সামনে রোগা হয়ে যেতে দেখে। পুষ্টিকর খাদ্য সে পায় না, আগেও পেত না। সে-অতীতকে আজকের তুলনায়

তার সুদিন মনে হয়, তখনও তার খাদ্য ছিল সাধারণ ডাল-ভাত। তবে পেটটা তখন দু'বেলা ভরতো, আজ তাও ভরে না।

বিশুর মা চিরদিন দুধ ঘি মাছ খেয়েছে, আজও খায়। কিন্তু উপোস আর খাদ্যের এত বাছবিচার তার ভাল জিনিসে অরুচির জন্য নয়। শরীররক্ষার জন্যই এসব তাকে পালন করতে হয়। নিয়মিত শাঁসালো খাবার খাওয়ার এটাই হল নিয়ম। বার মাস মাছ দুধ ক্ষীর সব ঠিক এভাবেই খেতে হয়। মাঝে মাঝে উপোস দিয়ে।

কিন্তু এদেশে বিশুর মা'র মত জমিদার-গিন্নি হবার ভাগ্য আর কজনে করেছে। বার মাস যারা পেট ভরে ডালভাতও পায় না তারাও তো এসব ব্রত পূজার নিয়ম মানে, উপোস করে। এমনিই যাদের কমবেশী নিত্য উপবাস, তাদের বেলাও বাড়তি উপোসের প্রথা কেন?

বাইরে ঠিকা ঝি মায়ার গলা শোনা যায়, ওবেলা এস্‌বো নি মা, আগে থেকে বলে রাখলুম। দু'দিন উপোস আছি।

বিশুর মা বলে, উপাস খালি তুমি করছ নাকি? আমরা উপাস করি না? উপাস কইরা কাম করন যায় না?

: তা জানি নে মা। ও বেলা পূজা দিতে যাব।

: তাই কও, পূজা দিতে যাইবা।

সেই পুরনো দিন থেকে এসব উপোসের বিধি চলে আসছে, সবাই যখন পেট ভরে খেতে পেত। ওরকম দিন কি কখনো ছিল এদেশে? কেউ গরীব ছিল না, সবাই মিঠাইমণ্ডা যত খুশী খেত? রাখাল বিশ্বাস করে না। দরকার মত অন্ন পেত মানুষ, সাধারণ শাকান্ন। মাঝে মাঝে উপোস দিয়ে খেতে হয় এমনি সব ছাঁকা ছাঁকা খাদ্য সকলের জুটত বার মাস, এ অবাস্তব কল্পনা।

বাড়ির ঝি মায়ার বয়স সাধনার চেয়ে বেশী হবে না। বারান্দা মুছতে মুছতে সে দরজার সামনে আসে। ঠাকুর ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত তার মুছবার সীমা, চৌকাঠ পার হওয়া বারণ।

: গরীবের সাধ করে উপোস দিয়ে লাভ কি বাছা?

হঠাৎ তার প্রশ্ন শুনে ঘর-মোছা ন্যাতা উঁচু করে ধরে মায়া একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কিন্তু আচমকা বলেই কথাটা সে হালকা ভাবে নেয় না। এ মানুষটা তার সঙ্গে তামাশাই বা করতে যাবে কেন?

: গরীব বলে ধম্মোকম্মো রইবে নি?

: তা রইবে। এমনি তো খেতে জোটে না, ফের উপোস দিয়ে কি হয়?

: নিয়ম আছে, মানতে হয়।

তাই বোধ হয় হবে। রোজ পেট ভরা শুধু শাকান্ন জুটলেও মাঝে মাঝে উপোস দিলে উপকার হয়। একদিন তাই সকলের জন্যই এ নিয়ম হয়েছিল, রাজরানীর বা চাকরানীর মধ্যে তফাত করা দরকার হয়নি। আজ মায়াদের পেট ভরে না কিন্তু নিয়মটা রয়ে গেছে।

নীচে নেমে বিশুর মাকে দেখে রাখাল আজ অবাক হয়ে যায়। বেনারসী পরেছে দেখে নয়, গায়ে তার গয়নার বহর দেখে। কোন অঙ্গই বুঝি বাদ যায় নি, মোটা মোটা দামী দামী গয়না চাপিয়েছে নানা প্যাটার্নের। এত সোনাও আঁটে একটা মানুষের গায়ে!

অথচ, আশ্চর্য এই, এতদিন তার গায়ে গয়নার একান্ত অভাবটাই খাপছাড়া মনে হত রাখালের। হাতে ক'গাছা চুড়ি আর গলায় সাধারণ একটি হার ছাড়া কোথাও সোনা তার চোখে পড়ে নি আজ পর্যন্ত।

সতীশের বেশ দেখে বোঝা যায় কর্তা গিন্নি কোথাও যাবে।

বিশুর মা বলে, কুটুমবাড়ি যামু, গাড়ির লেইগা খাড়াইয়া আছি। এমন মানুষ আর সংসারে পাইবা না। সময় মত খেয়াল কইরা গাড়িটা আনতে দিব—

সতীশ বলে, দেই নাই! কখন লোক পাঠাইছি। হারামজাদা রসিকটা কোন কামের না।

: যেমন মানুষ তুমি, তোমার লোকও জোটে তেমন।

রাস্তায় নামতে রাখাল ভাবে, কুটুমবাড়ি থেকে ফিরে বিশুর মা কি গয়নাগুলি খুলে রাখবে? এ রকম কোন বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া সে গয়না গায়ে চাপায় না কেন?

এত গয়না আছে অথচ দু-একখানার বেশী গায়ে চাপায় না, কে জানে এর মধ্যে কি রহস্য আছে!

ছেলের জন্য সারাদিনে মোটে এক পোয়া দুধ। মাই ছাড়ানো উচিত ছিল ক'মাস আগেই কিন্তু ওই জন্যই সম্ভব হয় নি। এক পোয়া দুধে ওর কি হবে? কিন্তু এদিকে বুকের দুধও তার শুকিয়ে এসেছে। কদিন পরে দুধের বরাদ্দ আরেকটু না বাড়ালে উপায় থাকবে না।

উনান ধরিয়ে সাধনা জল মিশিয়ে দুধটুকু জ্বাল দিচ্ছে, এত সকালে বাসন্তী এল।

ওদিকে বিশুর মা'র গায়ে রাখাল যেমন দেখেছে তার সঙ্গে তুলনা না হলেও

বাসন্তীর গায়েও গয়না কম নয়। সোনাদানা যা-কিছু আছে দিনরাত সে গায়ে গায়েই রাখে। সকালবেলা এখন ঘরে পরার সাধারণ শাড়ি সেমিজের সঙ্গে গায়ে এত গয়না শুধু বেখাপ্পা ঠেকে না, অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে রাত্রে সে কি এতগুলি গয়না গায়েই শোয়? অথবা রাত্রে কিছু খুলে রেখে সকালে ঘুম ভেঙে প্রাতঃকৃত্য সারবার মত আগে গয়নাগুলি গায়ে চাপায়?

সাধনার চেয়ে কয়েক বছর বয়সে বড়। কিন্তু মুখখানা তার চেয়েও কচি দেখায়। তাকে দেখে কল্পনা করাও কঠিন যে মানুষটা সে অতিমাত্রায় ঝগড়াটে আর ঝগড়ার সময় তার গলা দিয়ে অমন বাঁশীর মত সরু আওয়াজ বার হয়!

সাধনা বলে, ঘরে চলুন, এখানে আমারি বসার জায়গা হয় না।

বাসন্তী বলে, না না, বসব না। আপনি কাজ করেন। এখন কথা বলার সময় আপনারও নেই, আমারও নেই। আমিও ভাত চাপিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে সে মেঝেতেই বসে পড়ে।

: উনি বাজারে গেলেন। আমি ভাবলাম, এই ফাঁকে আপনাকে একটা দরকারী কথা বলে যাই।

তার কাছে দরকারী কথা? সাধনা একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, বলুন না?

: বলি। আগে বলুন রাগ করবেন না?

: রাগ করব? কি কথা বলবেন যে রাগ করব?

: আগে কথা দিন রাগ করবেন না। নইলে বলব না।

তার আদুরেপনায় সাধনার হাসি পায়। একটু আহ্লাদী না হলে সব সময় এত গয়না গায়ে চাপিয়ে রাখার সাধ কারো হয়! সে মৃদু হেসে বলে, বেশ তো, কথা দিলাম।

বাসন্তী ইতস্তত: করে, অকারণে একবার একটু হাসে, তারপর বলে, আপনার ভাঙা হারটা আমায় বেচে দিন। রাগ করবেন না বলেছেন কিন্তু।

রাগ করবে না কথা দিলেও মুখ অন্ধকার হয়ে আসে সাধনার। সে তিক্তস্বরে বলে, আপনি কি করে শুনলেন আমাদের কথা! আপনাদের ঘর থেকে বুঝি শোনা যায়?

বাসন্তী যেন আকাশ থেকে পড়ে।

: আপনাদের কথা? কই আপনাদের কথা তো শোনা যায় না কিছু?

: তবে কি করে জানলেন আমি হার বেচব?

: আপনিই তো আমাকে পরশুদিন বললেন ভাই। বেচবার কথা বলেন নি, বলেছেন ওটা আর সারানো যাবে না, নতুন গড়িয়ে নেবেন।

সাধনা লজ্জা পায়। তাই বটে, তার বাক্সে তুলে রাখা ভাঙা একটি হারের কথা কাউকে বলতে সে কি বাদ রেখেছে। তার একটা ভাঙা হার আছে, সেটার বদলে সে নতুন হার গড়িয়ে নেবে এ খবর যে সারা শহরে রটে যায় নি তাই আশ্চর্য।

: কিছু মনে করবেন না। আমারি ভুল হয়েছে।

: মনে তো করবেন আপনি। আমি কোন স্পর্ধায় আপনার ভাঙা হার কিনতে চাইব? তারই জন্যে তো কথা আদায় করেছি, রাগ করবেন না। কাল বুঝি এই নিয়ে কথা হয়েছে কর্তার সঙ্গে? আমি সব শুনে ফেলেছি ভাবছিলেন বুঝি?

বাসন্তী সজোরে মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, একটা কথাও শুনি নি। আপনাদের ঘরের কথা শুনতে পেলেও শুনতে যাব কেন ভাই?

পরক্ষণে মুখের ভাব ও গলার স্বর পালটে বলে, ওমা, ওদিকে ভাত চড়িয়ে এসেছি। আমি বরং খোলাখুলি সব বলি আপনাকে। আপনার কাছে লুকোব না। শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমি হারটা কিনতে চাইলে আপনাদের কোন অপমান নেই। আপনাদের কোন ক্ষতি নেই। এদিকে আমার যদি একটা উপকার হয়—

সাধনা বলে, তাই ভাবছি। ভাঙা হার কিনবেন কেন?

: সে কথাই বলছি। কথাটা কিন্তু ভাই কাউকে বলবেন না। কাউকে বলবেন না মানে অবিশ্যি আপনার উনিকে বাদ দিয়ে। ওনাকে তো নিশ্চয় বলবেন।

বাসন্তী একগাল হাসে। হাসিটা যতখানি সম্ভব বজায় রেখে বলে, ব্যাপারটা কি জানেন, লুকিয়ে কিছু নগদ টাকা জমিয়েছি। টাকা কি লুকিয়ে রাখা যায়? তাই ভাবলাম, আপনার ভাঙা হারটা কিনে রাখি, টাকার বদলে সোনা থাক। লুকোচুরিরও দরকার থাকবে না। কে জানছে বাক্সের ভাঙা হারটা আমার নয়? মেয়েছেলেদের কোন গয়না আস্ত আছে কোন গয়না ভেঙে গেছে অত খবর কি ব্যাটাছেলে রাখে?

সাধনা মনে মনে ভাবে, তা এক কাঁড়ি গয়না থাকলে আর কি করে খবর রাখবে!

বাসন্তী এবার মুখখানা গম্ভীর করে। বলে, আপনাদের ভাববার কিছু নেই। দোকানে ওজন করিয়ে দর কষে আনবেন, যা দাম হয় আমি তাই দেব। দোকানে বিক্রী করতেন, তার বদলে আমায় করছেন।

সাধনা একটু ভেবে বলে, আপনি নতুন কিনবেন না কেন?

বাসন্তী মুচকি হাসে। এবারও মুচকি হাসিটা বজায় রেখেই বলে, আসল কথা, টের পেয়ে যাবে। নতুন সোনার গয়না কি লুকানো যায়? তা ছাড়া, আর গয়না চাই না ভাই, ঢের আছে। টাকার বদলে সোনা রাখব, নিজের জমানো টাকা কেন নষ্ট করব নতুন গড়াবার মজুরি দিয়ে?

সে উঠে দাঁড়ায়, নাঃ, ভাত আমার পোড়া লাগবে ঠিক। এখন বলবেন, না আরেকজনের সাথে পরামর্শ করে—?

সাধনা বলে, কিনতে চাইলে আপনাকে দেব না কেন?

বাসন্তী যেন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যায়।

থানিক পরেই রাখাল ফিরে আসে।

বিশুকে পড়িয়ে সে সাধারণতঃ বাড়ি আসে না, সোজা চলে যায় দু'নম্বর ছাত্রটিকে পড়াতে। এ ছাত্রটির বাড়ি বেশ থানিকটা দূরে, হেঁটে যেতে মিনিট কুড়ি লাগে। আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত তাকে পড়াবার কথা। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বিশুকে পড়িয়ে কাছাকাছি হলেও নিজের ঘরে উঁকি দিয়ে যাবার সময় থাকে না।

সাধনা ভাবে, রাখাল কথা তুলবে। নইলে বাড়ি এল কেন?

রাখাল ভাবে, সাধনা নিশ্চয় বুঝেছে এখন তার ঘরে আসার মানে। সে-ই নিশ্চয়ই আগে কথা তুলবে।

ডাল চাপিয়ে সাধনা বলে, রেশন এলে ভাত হবে। কাল বলে রেখেছি।

রাখাল বলে, কার্ড আর থলি দাও। বিমলকে পড়াতে যাবার পথে কার্ড জমা দিয়ে যাব। এখন বড় ভিড়। আসবার সময়—

ঃ বরাবর তাই তো কর। এদিকে আমার উনুন যাবে কামাই। একদিন আগে রেশনটা এনে রাখলে দোষ হয়? কয়লা কিনতেও তো পয়সা লাগে?

সাধনার গলা চড়েছে। পার্টিশনের ওপাশে বাসন্তী যাতে অনায়াসে শুনতে পারে, এতখানি চড়েছে!

জীবনে আজ পর্যন্ত সে এতথানি গলা চড়িয়ে সাধারণ কথা কেন, কোন কথাই বলে নি।

ঃ সত্যবাবু আজ টাকা না দিলে রেশন আসবে না।

তার দু'নম্বর ছাত্র বিমলের বাবা সত্যবাবু সরকারী উকিল। তার কাছে মাসকাবার বলে কিছু নেই। অবশ্য শুধু এটা ঘর থেকে টাকা বার করে পাওনা মেটাবার বেলায়। পাওনা সে কারো বাকী রাখে না, যাকে যা দেবার শেষ

পর্যন্ত দিয়ে দেয়, কিন্তু সময়মত দেয় না। টাকা সম্পর্কে তার মূল-নীতি হল, নগদ যা আসবে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরে আনা, যা দিতে হবে তা যতদিন সম্ভব দেরী করে ঘর থেকে বার করা। মাসে দশ বার তারিখের আগে রাখাল তার কাছে ছেলে পড়ানোর মজুরি আদায় করতে পারে না।

সাধনা তা জানে। সত্যবাবুর কাছে গত মাসের বেতন আদায় করে তবে আজ রাখাল রেশন আনবে এটাও তার আগে থেকেই জানা। কিন্তু জানা হল নিছক জ্ঞান। ছাঁকা জ্ঞান দিয়ে মানুষ কারবার করছে, কেউ কোনদিন শুধু জ্ঞান ধুয়ে জল খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা রাখতে পারে নি।

সাধনা বলে, রেশন না এলে একলা আমি উপোস দেব না।

: আজ টাকা না দিলে কাজ ছেড়ে দেব।

: তা ছাড়বে বৈকি, নইলে চলবে কেন ? একটা কাজ ছেড়েছ গোয়ারতুমি করে, অভিমানে আরেকটা কাজ ছেড়ে একেবারে উপোস তো দিতেই হবে।

রাখাল একটু থ' বনে যায়। সাধনার তাহলে মুখ খুলছে ? এবার তারা কলহবিদ্যায় ক্রমে ক্রমে ধাতস্থ হবে নাকি ?

: আটটা বাজে, আমি যাই।

বলেই রাখাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। যেন পালিয়ে যায়। না গিয়ে তার উপায় নেই। সত্যবাবুর ছেলেকে পড়াতে যাবার সময়ও নির্দিষ্ট আছে। আজ সত্যবাবুর কাছে তার ছেলেকে পড়ানোর বাকী মজুরিটা আদায় করতেই হবে, নইলে রেশন আসবে না। সময়-মত কাজ হওয়া দরকার। সাধনা এসব বোঝে।

তবু সাধনার বুক জ্বলে যায়। কিছুতে তুলল না হারের কথাটা। ব্যবস্থা করার জন্য সেই আবার নিজে থেকে তোষামোদ করুক, এই ইচ্ছা রাখালের ?

এদিকে রাখালের প্রাণটাও জ্বালা করে। রেশন কার্ড আর থলিটাও এগিয়ে দেবে না সাধনা, তাকেই খুঁজে পেতে নিয়ে যেতে হবে। তা, তার মত অপদার্থ মানুষ আর কি ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে ?

জ্বালার উপর জ্বালা। একজনের মর্মান্তিক অভিমানের, আরেকজনের সর্বনাশা আত্মগ্লানির।

রাখাল বেরিয়ে যেতেই পাশের ঘরের আশা এসে বলে, চিনিটা দেবে ভাই ?

: রেশন আনতে গেছে। এলেই দেব।

আশা মুখ ভার করে ফিরে যায়।

আধ কাপ চিনি ধার করেছিল, তারই জন্য তাগিদ। পাশের ঘরে থাকে তবু কত অনায়াসে সঞ্জীব আর আশা তাদের এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে ভাবতে গেলে সাধনার মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ হয়। মাঝে মাঝে, সব সময় নয়।

আজ ইচ্ছা হচ্ছিল একটা চাপড় মারে আশার গালে। রেশন কার্ড আর থলি নিয়ে রাখালকে বেরোতে দেখেই যে আশা চিনিটুকু ফেরত চাইতে এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিনি সাধনা দিতে পারবে না জানে, সেজন্য বিরক্ত হবার সুযোগ জুটবে। টাটকা তাগিদটা ভুলতেও পারবে না সাধনা, খানিক বাদে রেশন এলে চিনিটা ফেরত দেবে।

তারই আগেকার রান্নাঘরটি দখল করে রাখে, দিনে শতবার মুখোমুখি হতে হয় উঠানে, বারান্দায়, কলতলায়, আশা যেন তাকে দেখতেই পায় না। কত লোকের সঙ্গে যেচে কত কথা বলে সঞ্জীব, রাখালের সঙ্গে মুখোমুখি হলেও যেন বোবা বনে থাকে। এক বাড়িতে পাশাপাশি থেকেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই ওরা একান্ত নিস্পৃহ উদাসীন।

সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কটা বাজল দিদি ?

জবাব আসে ঘড়ি ঠিক নেই।

ওই বেঠিক ঘড়ি ধরেই ঠিক সময়ে সঞ্জীব কিন্তু আপিস যায়, রেডিও চালায়। পিয়ন যাকে সামনে পায় তার হাতেই দু'ঘরের চিঠি দেয়। তাদের চিঠি সঞ্জীব বা আশার হাতে দিলে পিয়নকে ফিরিয়ে দেয়, বলে, আমাদের চিঠি নয়।

বলে ঘরে চলে যায়!

সঞ্জীব আপিস গেলে আশা ঘরে তালা দিয়ে রান্না ঘরে যায়—দশ মিনিটের জন্য নাইতে গেলেও ঘরের দরজায় তালা পড়ে। পাশেই আছে সস্ত্রীক এক বেকার।

তবু আশার কাছেই সাধনা আধ কাপ চিনি ধার করেছিল। কি করে করেছিল কে জানে?

আশা গয়না পরে কম। হাতে দু'গাছা করে চুড়ি আর গলায় একটি হার। ভাল ভাল রঙীন শাড়ি ছাড়া তার সাধারণ কাপড় একখানাও নেই, তার বাড়িতে ব্যবহারের জামাও বিশেষ ধরনে ছাঁটা। খোঁপা সে বাঁধে না, কিন্তু পাকানো চুলের যে দলাটি ঘাড়ের কাছে ঝোলে খোঁপার চেয়ে তার বাঁধন শক্ত মনে হয়—সাধনা তো কখনো খসতে ছাখে নি। বাড়িতে সব সময়ে সে স্যাণ্ডেল পায়ে দেয়।

তাকে দেখলেই টের পাওয়া যায় গয়না তার যথেষ্টই আছে কিন্তু বেশী গয়না গায়ে রাখা সে অসভ্যতা গ্রাম্যতা মনে করে।

ন'টার আগেই সঞ্জীব নাইতে যায়। ফর্সা রোগা মানুষটা অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারীর মত দেখতে। উঠানটুকু পার হবার সময় পলকের জন্য সে একবার সাধনার রান্নার জায়গাটুকুর দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাচু করে।

হঠাৎ কি মনে হয় সাধনার, ছেলেকে কোলে নিয়ে একটা চায়ের কাপ হাতে সে যায় বাসন্তীর কাছে। বলে, আধ কাপ চিনি ধার দেবেন?

: ধার দেব না। আধ কাপ চিনি আবার ধার দেব কি রকম ভাই?

: আজকাল চিনি কি এমনি নেওয়া যায়, না দেওয়া যায়? বাসন্তী কাপটা ভর্তি করে চিনি এনে দিয়ে হেসে বলে, এখন আমার বাড়তি আছে। আমার যখন দরকার হবে, আমিও গিয়ে খানিকটা চেয়ে আনব।

সাধনা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে। আশার কাছে আধ কাপ চিনি ধার নেওয়ার ধাক্কায় এই সহজ আদান-প্রদানের সম্পর্কটা সে ভুলতে বসেছিল?

ফিরে গিয়ে আধ কাপ চিনি নিয়ে সাধনা আশার রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বলে, আপনার চিনিটা দিদি।

সঞ্জীব তাড়াতাড়ি নাওয়া সেরে ইতিমধ্যে খেতে বসেছিল। সে মুখ তুলেও চায় না।

সাধনা বলে, আপনার আপিসটা কোথায়?

সঞ্জীব বলে, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে।

: এখন কি ক্লাইভ ষ্ট্রীট আছে? নতুন কি নাম হয়েছে না? গায়ের জোরে সাধনা যেন ওদের উদাসীনতাকে উপেক্ষা করে আশাকে পর্যন্ত ডিঙিয়ে একেবারে সঞ্জীবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করবে। ভাব করলেই বেকার তারা অনুগ্রহ চেয়ে বসবে ভেবে তোমাদের যতই মিছে আতঙ্ক থাক, সে যেন তা গ্রাহ্য করবে না।

চিনিটা ঢেলে রেখে আশা খালি কাপটা এগিয়ে দেয়। তবু নড়ে না সাধনা।

সত্যবাবুর কাছে টাকা পেয়ে রেশন আর তরকারী আনলে তবে তার আজ রান্নাবান্নার হাঙ্গামা। সামনে মানুষ থাকতে কেন সে অবসরের সময় দুটো কথা কইবে না?

আশা তাকে বসতে বলে না। বিব্রত সঞ্জীব খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় হঠাৎ বলে, আপনি বসুন?

আশার দিকে একনজর তাকিয়ে সাধনা হেসে বলে, না যাই, কাজ আছে।

নিজের ঘরে গিয়ে তার কান্না আসে। মনে হয়, গায়ের জোরে সে যেন সঞ্জীবের কাছে সার্টিফিকেট আদায় করেছে যে সেও একটা মানুষ, একজন বেকার মানুষের বৌ হলেও। এ রকম সার্টিফিকেটের দরকারও তার হচ্ছে?

ছি ছি!

বাইরে থেকে ডাক আসে, রাখালবাবু আছেন? রাখালবাবু?

রাজীবের গলা। মোটাসোটা কালো মানুষটিকে সাধনা চোখে দেখেছে, সামনা-সামনি এ পর্যন্ত কখনো ওর সঙ্গে কথা বলে নি। বাড়িতে গেলে রাজীব নিজেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তার পর্দা রক্ষা করে!

বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে সাধনা বলে, উনি তো বাড়ি নেই।

ঃ তবে তো মুশকিল হল!

ঃ কিছু বলবার থাকলে বলে যান।

রাজীব ইতস্তত: করে বলে, রাখালবাবু চাকরি খুঁজছেন—একটা খবর পেয়েছিলাম। আজকেই ওনার যাওয়া দরকার। তা আমি তো বেরিয়ে যাচ্ছি—

ঃ আপনার আপিসের ঠিকানাটা দিয়ে যান, উনি গিয়ে দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। কখন যাবেন?

রাজীব একেবারে ছাপানো ঠিকানা তাকে দেয়—কার্ড নয়, একটা ছাপা বিলের মাথাটা ছিঁড়ে দেয়। সাধনা জানত রাজীব লেখাপড়া বেশী করে নি, তার কথার ধরন ও চালচলনে সে অল্পশিক্ষিত ছোট ব্যবসায়ীর সেকেলে ভোঁতা ভাবটাই পুরোমাত্রায় প্রত্যাশা করছিল। আজ সামনাসামনি মানুষটার সঙ্গে কথা বলে সে আশ্চর্য হয়ে যায়। মার্জিত রুচি শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে কোনই তো তফাত নেই তার! এই রাজীবের ব্যবসায় বিড়ির পাতা আর বিড়ির তামাকের! সুখা আর পাতা বেচে, তাও বন্ধুর সঙ্গে ভাগে, বাসন্তীকে গায়ে যে এত গয়না

দিয়েছে! লুকিয়ে বাসন্তী এত টাকা জমিয়েছে যে তার ভাঙা হারটা কিনে টাকার একটা অংশকে সোনা করে জমানো সে সুবিধাজনক মনে করে!

রাজীব জানায় বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে রাখাল যেন যায়। রাখালকে সঙ্গে নিয়ে চেনা একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, সে আবার রাখালকে নিয়ে যাবে যে আপিসে চাকরি খালি আছে—হাঙ্গামা অনেক!

হাঙ্গামা বৈকি। ঘরে গিয়ে সাধনা তাই ভাবে। এমন লোকও আছে জগতে আপনজনকে চাকরি জুটিয়ে দেওয়া যাদের কাছে ডাল ভাত—মায়ের পিসতুতো ভাই সম্পর্কে এমনি একজন মামা থাকায় ওই বাগানওলা বাড়ির হাবাগোবা ছেলে কুমুদ চাইতে না চাইতে তিনশ' টাকার চাকরি পেয়ে গেছে। কিন্তু বিড়ির পাতা আর তামাকের ছোটখাট ব্যবসায়ী রাজীব তো সে দরের বা স্তরের মানুষ নয়, এ বাজারে একজনকে চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাটাই তার পক্ষে হাঙ্গামার ব্যাপার বৈকি!

স্বেচ্ছায় যেচে সে এই হাঙ্গামা করতে চায় কেন?

রাখাল তার আত্মীয়ও নয়, বন্ধুও নয়। ভাল রকম জানাশোনাও নেই তাদের মধ্যে। রাখালের চাকরির জন্য তার এত মাথা ব্যথা কেন?

বাসন্তী বলেছে?

বাসন্তী কেন রাখালকে চাকরি জুটিয়ে দেবার কথা রাজীবকে বলবে? তার স্বার্থ কি?

সাধনা নিশ্বাস ফেলে। ঠিকমত বোঝা গেল না। শুধু ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থ নিয়ে যে জগৎ চলে না, এ কি তারই একটা প্রমাণ? আধ কাপ চিনি ধার চাইতে যেতে বাসন্তী কি রকম খুশীতে ডগমগ হয়ে কাপভর্তি চিনি দিয়ে বলেছিল যে, ধারের কারবার তাদের মধ্যে নয়, বার বার সে-দৃশ্য মনে আসে। মনে আসে তার হারটি কিনতে চাওয়ার ভূমিকা করা। এভাবে হারটা কিনতে চাওয়ায় পাছে তাকে অপমান করা হয়, সে রাগ করে, এজন্য সত্যই ভয় ছিল বাসন্তীর!

রাজীবের সঙ্গে বাসন্তীর অনেক অমিল, অনেক বিষয়ে রাজীবকে তার অবিশ্বাস। শুধু রাজীবের বেলা নয়, পুরুষ মানুষ সম্পর্কে বাসন্তীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বড় কম। এটা বাসন্তী গোপনও করে না এবং সাধনাও আগেই টের পেয়েছিল।

পুরুষ রাখাল তার ভাঙা হারটা দোকানে বেচতে যাবে এ চিন্তা কি অসহ্য ঠেকেছে বাসন্তীর? জমানো টাকা সোনা করতে চায় এসব কি তার বানানো কথা? আসলে তার অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে সে ব্যবস্থা করতে চায় যে পুরুষ

এবং স্বামী রাখালের বদলে সে যাতে হারটা নিজেই বেচতে পারে, নগদ টাকাটা যাতে সে-ই হাতে পায় ?

অথবা এ সমস্ত তারই উদ্ভট কল্পনা ?

জানালা দিয়ে দেখা যায় পাড়ার ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। ছেলেরা একলা অথবা দু'তিন জনে একসাথে মেয়েরা আট দশজনে দল বেঁধে। সেও এমনিভাবে স্কুলে যেত, বেশীদিনের কথা নয়। তখনও টের পেত বাপের তার অভাবের সংসার। ওই ছেলেমেয়েরাও কি টের পায় আজকের সংসারের ভয়াবহ অভাব— দু-চার জন ছাড়া ? কোন মন্ত্রে বয়স কমে গিয়ে একবার যদি সে ভিড়ে পড়তে পারত ওদের দলে! নিদারুণ অস্থিরতা জাগে সাধনার, একটু ছটফট করে বেড়াবার জায়গা পর্যন্ত তার নেই। এই একখানা ঘরে সে একা। তার কাজ নেই, বেঁচে থাকার মানে নেই। এক পোয়া দুধ জাল দিয়ে আর এক মুঠো ডাল সিদ্ধ করে উনানটাকে নিভতে দিয়ে তার শুধু প্রতীক্ষা করে থাকা যে কতক্ষণে দুটি চাল আসবে, শাকপাতা আসবে, আবার উনান ধরিয়ে ভাত-তরকারী রাঁধবার সুযোগ পাবে!

বাক্স খুলে সাধনা ভাঙা হারটা বার করে। খোকা ঘুমিয়ে আছে, না জেগে আছে তাকিয়েও দ্যাখে না। আবার সে বাসন্তীর কাছে যায়।

বাসন্তী চুলে তেল দিচ্ছিল, নাইতে যাবে। আজকেই আগে সে দু'বার বাসন্তীকে দেখেছে—গায়ে শুধু তার গয়নার আবরণ নয়, মোটা ছিটের জামা কাপড় যেন বোরখার মতই গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত তার নারীত্বকে ঢেকে রেখেছিল।

এখন শুধু ফিনফিনে একখানা পাতলা কাপড় আলগাভাবে গায়ে জড়ানো।

রাজীব বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই দেহকে সে আড়াল থেকে মুক্তি দিয়েছে!

: কি হয়েছে ভাই ?

: কিছু হয় নি। হারটা সত্যি কিনবেন ?

: কিনব না ? আমি কি তামাশা করছিলাম আপনার সঙ্গে ?

: তবে কিনে নিন।

বাসন্তী দ্বিধার সঙ্গে বলে, ওজন হল না, আজকে সোনার দর কত জানা নেই—

সাধনা বলে, ওজন তিন ভরি ধরুন। দোকানের রসিদ এনেছি, তিন ভরি দেড় আনা ওজন লিখেছে, দেড় আনা বাদ দিন। সোনার দর কাগজেই আছে—

বাসন্তী হঠাৎ হাসে, তা তো আছে, কিন্তু সোনামণিই যে নেই!

তার মানে?

তুমি বোন বড্ড ছেলেমানুষ।

সাধনা ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

বাসন্তীও গম্ভীর হয়ে বলে, ঝোঁকের মাথায় ছুটে এলে, একবার ভাবলেও না, আরেকজনকে গোপন করে এটা আমায় বেচে দেয়া যায় না? সে ভদ্রলোকের কিছু জানা না থাকলে বরং আলাদা কথা ছিল। মেয়েদের অমন আড়ালে আড়ালে অনেক কিছু করতেই হয়। কিন্তু এটা জানা বিষয়, তুমিই এটা নিয়ে কত পরামর্শ করেছো মানুষটার সঙ্গে। তাকে একেবারে বাদ দিয়ে কি এটা বেচতে পার?

: আমার জিনিস —

: হোক না তোমাব জিনিস। এ তো শুধু তোমার সোনার জিনিস। তুমি নিজে কার জিনিস? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ? একেবারে বরবাদ করে দিয়েছ মানুষটাকে? যতকাল বাঁচবে কথাও কইবে না, পাশেও শোবে না তো?

সাধনা বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য মানুষ।

বাসন্তী বলে, তুমি সত্যি ছেলেমানুষ। মেয়েছেলে দশ বছরে পেকে ঝাড় হবে, পনের বছরে রসাবে। বুড়োমি পাকামি সব তলিয়ে থাকবে রসে। নইলে কি ব্যাটাছেলের সঙ্গে পারা যায়? ছেলেমানুষ রয়ে গেলে আর উপায় নেই, সে বেচারার অদেষ্ট মন্দ!

: এত ফন্দি এঁটে চলতে হবে?

: আরে কপাল! এ নাকি ফন্দি আঁটা? মতলব আঁটা? মেয়েছেলেদের চালচলন স্বভাব হবে এটা। ব্যাটাছেলের মত ব্যাটাছেলে হবে, মেয়েছেলের মত মেয়েছেলে হবে, যেমন সংসার যেমন নিয়ম। তাতে ফন্দি আঁটার কি আছে? বুঝে শুনে চলবে না তো কি বোকাহাবা হবে মানুষ? ছেলেমানুষের মত ঝোঁকের মাথায় চলবে? সাধ করে জেনেশুনে সুখশান্তি নষ্ট করবে? না ভাই, এটা মোটে কাজের কথা নয়।

ছেলের কান্না শুনে সাধনা তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে। বাড়িতে পা দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে ছাখে, তার ছেলে আজ আশার কোলে উঠেছে!

তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে ঝাঁঝালো গলায় আশা বলে, তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে? একলা ফেলে রেখে গেছ ছেলেটাকে! রোয়াক থেকে পড়ে মাথাটা যে ফাটে নি—

: একলা কেন ? তুমি তো ছিলে।

সাধনা হাসে কিন্তু আশা গম্ভীর মুখেই ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যায়। এ তো হাসি-তামাশার কথা নয়!

রেশন, কিছু তরকারী আর আধ পোয়া মাছ নিয়ে রাখাল বাড়ি ফেরে। সত্যবাবুর কাছে মাস'ভর খাটুনির মজুরির টাকা আজ সে আদায় করে ছেড়েছে। তার চাইবার ধরন দেখে আজও তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবার সাহস সত্যবাবুর হয় নি।

সাধনার কাছে রাজীবের কথা শুনে সে বলে, ভাঁওতা বোধ হয়।

: তোমাকে ভাঁওতা দিয়ে মানুষটার লাভ কি ?

: কে জানে কি মতলব আছে। সোজাসুজি আমায় বললেই হত!

স্থির দৃষ্টিতে সে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে।

তরকারী কুটবে কি, সে দৃষ্টি দেখে মাথা ঘুরে যায় সাধনার!

: সারাদিন বাইরে কাটাও, কখন তোমার দেখা পাবেন ?

: পাশাপাশি ঘর, ইচ্ছা থাকলে আর দেখা হত না ? রাত্রে তো বাড়ি ফিরি আমি ?

সাধনা চুপ করে থাকে। রাখালের একটা চাকরি বাগিয়ে দেবার জন্য বাসন্তী রাজীবের উপর চাপ দিয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে নিয়ে গিয়েও মুখ ফুটে বাসন্তীকে সে কিছু বলতে পারে নি। কুণ্ঠা বোধ করেছে। মনে হয়েছে, বাসন্তী যদি আড়ালে থেকে তার ভাল করতে চেয়ে থাকে এ বিষয়ে তাকে আড়ালে থাকতে দেওয়াই ভাল।

বাসন্তী যেচে তার সঙ্গে ভাব করতে চায়, কেন চায় সে হিসাবটা এখনো সাধনার ঠিক হয় নি বলে এই কুণ্ঠা। বাসন্তী যদি তার প্রশ্নের জবাবে সহজভাবে হেসে বলেই বসে যে, হ্যাঁ ভাই, আমিই ওকে বলেছি,—কি ভাষায় কিভাবে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে সাধনা ? নিজের মান বাঁচিয়ে জানাবে ?

রাজীবের ঠিকানা-লেখা কাগজটা নাড়তে নাড়তে রাখাল আবার ব্যঙ্গের সুরে বলে, আমার জন্য হঠাৎ এত দরদ জাগল কেন ? আমি তো ভদ্দরলোক চাকরি খুঁজে দিতে বলি নি ? চাকরি কি না গাছের ফল, যেচে প্রতিবেশীদের বিতরণ করেন !

এবার সাধনা শান্ত সুরে বলে, অন্য কারণও তো থাকতে পারে ?

: কি কারণ ? ভাল জানাশোনা পর্যন্ত নেই—

: তোমাদের নেই, ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার ভাব আছে।

: ও, তাই বল। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে তাদের স্বামীদের দিয়ে তুমি আমার চাকরি জোটাবার চেষ্টা করছ? বেশ, বেশ—এবার তাহলে আর ভাবনা নেই!

রাখাল একখানা চিঠি লিখতে বসে। চিঠিখানা রাখাল তিনশো মাইল দূরে তার ভাই-এর কাছে লিখছে জানতে পারলে সাধনার মাথা আরও ঘুরে যেত। হাতের কাজ করতে করতে বাসন্তীর সহজ বাস্তববুদ্ধির কথা ভাবে—বাসন্তী ঠিক বলেছে। তারা কত শিক্ষিত ভদ্র ভালমানুষ, তাদের মধ্যে কত বিশ্বাস আর ভালবাসা, এসব গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সোজাসুজি বলে দিয়েছে যে, রাখালকে অন্তত একবার না জানিয়ে হারের ব্যবস্থা সে করতে পারে না, ওটা সংসারের নিয়ম নয়!

নিয়ম নয় এই হিসাবে যে, শুধু এই গোপনতাটুকুর জন্য স্বামীকে যা খুশি তাই ভাববার সুযোগ দেওয়া হয়। রাখাল পছন্দ করুক বা না করুক, তার অবাধ্যতায় যতই রাগ করুক, গুরুতর মনোমালিন্য ঘটে যাক—সে হবে আলাদা কথা! রাখালকে জানিয়ে কাজটা করলে রাখাল কোনমতেই এটাকে তার সামনাসামনি বিদ্রোহ করার অতিরিক্ত অন্য কিছু বানাতে পারবে না। না জানিয়ে করলে যা খুশি মানে করতে পারবে তার কাজের।

তাই বটে। এমনিই রীতি এ সংসারের। তারাও বাদ নয়। রাখালকে না জানিয়ে সে ভাব করেছে বাসন্তীর সঙ্গে, শুধু এই জন্যই এমন অসম্ভব সম্ভব হল। গোপন করার ইচ্ছা থাক বা না থাক, জানাবার কথা মনে আসে নি আর প্রয়োজন বোধ করে নি বলেই হোক, সেজন্য কিছুই আসে যায় না। স্বামীকে না জানিয়ে পাড়ার একটি বৌয়ের সঙ্গে ভাব করেছে এটাই হল আসল কথা।

রাখাল তাই নানারকম মানে করতে পেরেছে অতি সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনার। রাজীব যেচে তার চাকরি করে দিতে চায়, কেন সে যখন বাড়ি থাকে না ঠিক সেই সময়ে কথা বলতে আর ঠিকানা দিতে আসে সাধনার কাছে, তারই মানে।

ধারালো মানে, কাঁটা-ভরা মানে। দুজনেরি মনকে যা কাটবে আর বিঁধবে।

মনের মধ্যে মানে করতে করতে তাই সে ওরকম স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে পেরেছে।

এও তবে সম্ভব জগতে? রাখালের পক্ষে এসব কথা ভাবা?

কলের মত কাজ করে যায় সাধনা। জগৎ সংসারে যেন জীবনের জোয়ার-

ডাঁটা নেই, স্তব্ধ থমথমে হয়ে গেছে সব। ভাত নামায়, আলু কুমড়ার তরকারি চাপায়, আধপোয়া মাছ সাঁতলে ঝোল করে—তারই ফাঁকে ফাঁকে ছেলেকে আধ-শুকনো মাই চুষতে দেয়।

এসব যেন অন্য কেউ করছে, সাধনা নয়।

কত বিশ্বাস, কত ধারণা, কত সংস্কার যে তার মিথ্যা হয়ে গেছে এই একটা অসম্ভব সম্ভব হওয়ায়—যা সম্ভব কি অসম্ভব এ বিষয়ে চিন্তা পর্যন্ত করার দরকার হয় নি এতদিন, সেটা একেবারে কঠোর বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেওয়ায়। উনান নিভে এসেছে।

কয়লা রাখার পুরনো ভাঙা বাক্সতিটার দিকে চেয়ে সাধনার হাসি পায়। একটুকরো কয়লা নেই। অন্ততঃ পাঁচ সের কয়লা এনে দেবার জন্য রাখালকে বলতে হবে। নইলে মাছের ঝোল নামবে না।

ঘরে গিয়ে তাক থেকে একটা বই নিয়ে আসে—মস্ত এক গয়নার দোকানের ক্যাটালগ। কত প্যাটার্নের সাধারণ অসাধারণ কত রকমের সোনা আর জড়োয়া গয়নার ছবিসুদ্ধ তালিকাই যে বইটাতে আছে। যত্ন করে তাকে তুলে রেখেছিল—কোনদিন যদি দরকার হয় প্যাটার্ন বেছে পছন্দ করার!

পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উনানে দিয়ে সে ঝোল রাঁধে।

রাখাল এসে লেখা চিঠিখানা তার হাতে দেয়। তার দাদা প্রসন্নকে নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা খুলে লিখে রাখাল জানিয়েছে যে, সাধনা যদি মাস তিনেক গিয়ে তার কাছে থেকে আসে তাহলে বড়ই উপকার হয়। ইতিমধ্যে রাখাল তার সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে।

পড়ে চিঠিটাও সাধনা উনানে গুঁজে দেয়।

: তুমি যাবে না ?

: না।

: ভায়ের কাছে বোন যায় না ?

: এ অবস্থায় যায় না।

রাখাল ব্যঙ্গ করে বলে, এ অবস্থায় আত্মীয়ের বিয়ে-বাড়িতে মানুষ নাচতে নাচতে যায়, ভায়ের বাড়ি যায় না, না ?

সাধনা কড়াই কাত করে মাছের ঝোল উনানে ঢেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

৪

রাখাল স্নান করে নিজেই ভাত বেড়ে খায়। ডাল তরকারি দিয়ে খায়।

বড় মাছের আধপোয়া পেটি এনেছিল সাত আনা দিয়ে। চমৎকার ছিল মাছটা। পোড়া মাছের গন্ধ শুঁকেই খাওয়ার সাধ মেটাতে হল।

খেয়ে উঠেই জামা গায় দেয়। বলে, কই ঠিকানাটা দাও।

: পুড়িয়ে ফেলেছি।

: বন্ধুর কাছ থেকে জেনে এসো।

: তোমার এ চাকরি করতে হবে না।

রাখাল কাঠের চেয়ারটাতে বসে। বলে, তোমার কি মাথা বিগড়ে গেল? একজন চাকরি করে দিচ্ছে, চেষ্টা করব না? তার মনে যাই থাক—

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে সাধনা ফোঁস করে ওঠে, মাথা বিগড়েছে তোমার, আমার নয়। বারবার বলছি মানুষটার সঙ্গে আগে আমার একটা মুখের কথা হয় নি, শুধু ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ, তবু তোমার ওই এক চিন্তা!

গলা চড়িয়ে চীৎকার করে সাধনা যোগ দেয়, ভদ্রলোকের মনে কিছু নেই, থাকতে পারে না! যদি কিছু থাকে সব তোমারি মগজে।

: তবে তো কথাই নেই। ঠিকানাটা জেনে এসো।

রাখালের শান্তভাবে সাধনা বড়ই দমে যায়। ঝিমিয়ে গিয়ে গভীর একটা হতাশা বোধ করে।

নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমিই জেনে যাও।

রাখাল বলে, সেই ভাল। যাবার সময় চাকরটার কাছেই জেনে যেতে পারব।

রাখাল বেরিয়ে যায়। সাধনার হারের কথা উল্লেখও করে না।

রাখাল বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই ভোলার মা দরজার বাইরে থেকে ডাকে, খোকার মা কি করেন?

সাধনা শ্রান্ত কণ্ঠে বলে, ডিম রাখব না ভোলার মা।

: একটা কথা ছিল।

শিথিল আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে সাধনা উঠে আসে, কি বলবে বল?

ভোলার মা তার মুখের থমথমে ভাব নজর করে ভাখে, কিন্তু কিছুই বলে না। জিজ্ঞাসাও করে না যে তোমার জ্বর এসেছে নাকি ? কিসের প্রক্রিয়ায় এমন হয় সে ভাল করেই জানে। কথায় এর প্রতিকার নেই।

বলে, ভিতরে একটু আড়ালে গিয়া কমু কথাটা। আর কিছু না, একটা পরামর্শ দিবেন।

এত মানুষ থাকতে তার কাছে ভোলার মা পরামর্শ চায় ?

: ঘরে এসো।

ঘরে ঢুকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে ভোলার মা বলে, অন্য মাইন্‌ষেরে জিগাইতে সাহস পাইলাম না! কার মনে কি আছে কেডা কইবো ?

বলতে বলতে সযত্নে আঁচলের কোণে বাঁধা এক জোড়া সোনার মাকড়ি বার করে, সাধনার সামনে রেখে বলে, আর কিছু নাই, এইটুকু সোনা সম্বল ছিল।

ভোলার মা'র কয়েকটা টাকা দরকার। মাকড়ি দুটো বাঁধা রাখবে। কার কাছে গেলে ভাল হয় যদি বলে দেয় সাধনা ? যার কাছে গেলে কাজও হবে, জিনিসটা গচ্ছিত রেখে ভোলার মাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে ?

: বাঁধা রাখবে ? বেচবে না ?

: না, বেচুম না। সবই তো বেইচা দিছি, এই একখান চিহ্ন রাখুম।

কিসের চিহ্ন ? প্রথম বয়সে ভালবেসে ভোলার বাবা মাকড়ি দুটো কিনে দিয়েছিল তাকে।

আজও ভোলার মা'র কাছে মূল্যবান হয়ে আছে স্বামীর প্রথম বয়সের ভালবাসা! সে-দিনগুলি স্বপ্নের মত বহুদূর পিছনে পড়ে আছে—সোনার মাকড়ি দুটি তার বাস্তব প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে মিথ্যা স্বপ্ন নয়, সত্যই একদিন জীবনে এসেছিল সেই দিনগুলি!

: কি ভাবেন ?

সাধনা লজ্জা পায়—নিজের কাছে! সে-ই ভোলার মা'র অতীত স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল।

: আমার টাকা নেই।

: আপনে যদি না পারেন, কইয়া ত্মান না কার কাছে যামু ?

: তাই বা কার নাম করি বল ? কে নেবে কে নেবে না—

ভোলার মা চুপ করে থাকে।

: দু'একজনকে বলে দেখতে পারি :

: বৈকালে আসুম ?

: এসো।

ভোলার মা মাকড়ি দুটি বাড়িয়ে দেয়। সাধনা আশ্চর্য হয়ে বলে, রেখে যাবে ?

: যারে কইবেন, জিনিসটা দেখাইবেন না ?

ভোলার মা চলে যাবার পর সাধনা ধীরে ধীরে বুঝতে পারে সে কেন বিশেষ করে তার কাছে এসেছিল। ভোলার মা টের পেয়ে গেছে তার অবস্থা। সেও নামতে আরম্ভ করেছে ভোলার মা'র স্তরে, তাদের দুজনেরি অবস্থা খানিকটা ইতরবিশেষ।

সে তাই অনেকটা কাছের মানুষ ভোলার মা'র। সে সহজেই বুঝবে ভোলার মা'র কথা, সহজেই অনুভব করতে পারবে মাকড়ি বাঁধা রেখে ক'টা টাকা পাওয়া তার কাছে কতখানি গুরুতর ব্যাপার! অন্যে তো এতখানি মর্যাদা দেবে না ভোলার মা'র প্রয়োজনকে!

হয় তো গায়েই মাখবে না তার কথা। হয় তো সন্দেহ করবে নানা রকম। আধঘণ্টা জেরা করে বলবে, তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা কর!

তাই, আশা যদিও প্রায়ই তার কাছে ডিম রাখে, নানা কথা জিজ্ঞাসা করে এবং মাকড়ি বাঁধা রেখে টাকাও সে অনায়াসে দিতে পারে তাকে, তবু আগে সে পরামর্শ চাইতে এসেছে সাধনার কাছে।

খেয়ে উঠে ঘরে তালা দিয়ে সাধনা বাসন্তীর কাছে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় তার ভাঙা হার। বলে, তুমি তো এমনি নেবে না হারাটা, দোকানে যাচাই না করে ?

বাসন্তী বলে, নেয়া কি উচিত ? তুমিই বল ভাই ? বেশী দিলে ভাববে দয়া করেছি, কম দিলে ভাববে ঠকিয়েছি।

তবে চলো দোকানে যাই। যাচাই করিয়ে আসি।

বাসন্তী গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা, তুমি আমি একলাটি যাব ? কিছু যদি হয় ?

সাধনা হেসে বলে, কি হবে ? বাঘে খাবে ? পুরুষের চেয়ে মেয়েদের রাস্তায় ভয় কম, তা জানো ? তুমি যদি মিথ্যে করে একজনের নামে বল, এ লোকটা অভদ্রতা করেছে, কেউ আর তার কথা কানেও তুলবে না, দশজনে মিলে মেরে তার হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

বাসন্তী মাথা নেড়ে বলে, সেটাই তো খারাপ। আমরা যেন মানুষ নই ইয়ে! রাস্তার মানুষের কাছে আমরা আহ্লাদী।

দুপুরবেলার আলস্যে আর শৈথিল্যে যেন থৈ থৈ করছে বাসন্তী, দেখে মনে

করা দায় যে, সেও আবার ভাল করে গা ঢাকে, উঠে চলে ফিরে বেড়ায়, সংসারে গিন্নিপনা করে। সে পছন্দ করে না, কিন্তু উপায় কি, পুরুষের কাছে মেয়েরা আহ্লাদী। খারাপ হলেও নিয়মটা মেনে নিয়ে সে দুপুরবেলা ঘরের কোণে একা থাকার সময়েও আহ্লাদী হয়েই আছে। যে ভূমিকা অভিনয় করতেই হবে বরাবর, দুদণ্ডের জন্য তার হাবভাব চালচলন ছাঁটাই করে রেখে তার লাভ কি?

গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হাই তুলে উঠে দাঁড়ায়। বলে, মানুষটা ফিরলে বলতে হবে তোমার সাথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

: মিছে কথা বলবে?

: মিছে কথা? তোমার যেন সবতাতেই খুঁতখুতানি। মিছে কথা কিগো? তোমার সাথে দুপুরবেলা বেরিয়েছিলাম এটুকু শুধু জানাব মানুষটাকে। সত্যি সত্যি তো বেরুচ্ছি তোমার সাথে।

: যদি জিজ্ঞাসা করেন কোথা গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে?

: ইস্! জিগ্যেস করলেই হল! আমি কি বাঁদী নাকি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলতে হবে? বেরিয়েছিলাম, জানিয়ে দিলাম, ফুরিয়ে গেল। কোথা গেছিলাম কি করেছিলাম, খুশি হয় বলব, খুশি হয় বলব না—জিগ্যেস করলেই বলতে হবে নাকি আমায়!

সাধনাকে খালি ঘরে একলা রেখে সে বাথরুমে যায়। আশার ঘরে এত দামী দামী জিনিস নেই, আশার বাক্সে এত টাকা আর গয়না নেই—আশা পারত না।

দুজনে বাসে চেপে গয়নার দোকানে যায়। মস্ত দোকান, সারি সারি কাঁচের শো-কেসে ঝলমল করছে হরেক রকমের গয়না। কত নাম, কত বৈচিত্র্য, কত রকমের রুচির কাছে কত ধরনের আবেদন। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে একটু ভয় ভয় করে, একটু ছম ছম করে গা।

শত শত মেয়েলোকের মনপ্রাণ রূপযৌবন যেন রূপক হয়ে ঝলমল করছে শো-কেসে।

রাজীব বলে, আসুন রাখালবাবু, বসুন। একটা সিগারেট খান!

একটা টুল এগিয়ে দেয়। পার্টনার দীননাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, কি আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন মশাই, কাল দীনুর কাছে শুনলাম চাকরিটার খবর, আজ খেয়ে দেয়ে দোকানে বেরুব স্ত্রী জানালেন আপনি নাকি চাকরি খুঁজছেন। ভাবলাম কি, এমন সুযোগ তো ছাড়া ঠিক নয়। একে প্রতিবেশী, তায় আবার গিন্নির বন্ধুর হাজব্যাণ্ড! লাগিয়ে দিতে পারি তো আমায় পায় কে? ঘরে খাতির, আপনাদের কাছে খাতির!

রাজীব একগাল হাসে।—আপনাতে আমাতে বেশী আলাপ হয় নি, স্ত্রীরা দুজন বেশ জমিয়ে নিয়েছেন!

অনর্গল কত কথাই যে বলে রাজীব পাঁচসাত মিনিটের মধ্যে! বাড়িতে বাসন্তীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় ছাড়া তার গলা একরকম শোনাই যায় না। বাড়িতে কম কথা বলাটা বোধ হয় বাইরে পুষিয়ে নেয়!

বলে, কিন্তু দাদা, যদি ফসকেই যায়, রাগ করবেন না যেন।

: না না, রাগের কি আছে? আমার জন্য চেষ্টা করেছেন এটা কি কম কথা হল!

যদি ফসকে যায়! যদি! চাকরি হওয়া সম্পর্কে এরা এতখানি সুনিশ্চিত যে না-হওয়াটা নিছক 'যদি'র কথা! আশায় রাখাল অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

দীননাথ বলে, তুমি তো একধার থেকে বকে চলেছ। কোথায় চাকরি কি চাকরি সে-সব বিত্তান্ত বল ভদ্দরলোককে? ওঁরও তো পছন্দ অপছন্দ আছে?

: সে তো তুমি বলবে।

দীননাথ অত্যন্ত শীর্ণ মানুষ। গায়ের হাড়গুলি যেন তার পাঞ্জাবি ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। কথা বলার সময় থেকে থেকে চোখ মিটমিট করে। রঙ খুব ফর্সা। চেহারায় সে যেন একেবারে রজীবের রূপধরা বিপরীত!

দীননাথ বলে, আপনি বন্ধু-মানুষ, খুলেই বলি আপনাকে! আপিসটা আমার এক আত্মীয়ের। ব্যাপারটা হল কি জানেন, ইনকামট্যাক্সের চোটে তো আর করে খাবার পথ নেই মানুষের। কর্তাদের একটু কড়া দৃষ্টি পড়েছে এই আত্মীয়টির

উপর। কাগজে কলমে একটা পোস্ট আছে—সেলস অর্গানাইজার। আপিস-টাপিসে আসেন না, ঘুরে ঘুরে সেল অর্গানাইজ করে বেড়ান আর মাসে মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে নেন। বুঝলেন না?

দীননাথ্ নিজের মনেই হাসে—নীরবে। শব্দ করে হাসাটা বোধ হয় তার আসে না।

বলে, তা, এবার একবার মানুষটার সশরীরে হাজির হওয়াটা দরকার পড়ে গেছে। ওরা বলছে, তোমাদের এইটুকু কারবার, পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে সেলস্ অর্গানাইজার রেখেছো? মজাটা দেখুন একবার। আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে অর্গানাইজার রাখি, আর হাজার টাকা দিয়ে রাখি, তোদের কিরে বাপু? বাজার ধরতে লোকে গোড়ায় টাকা ঢালে না, লোকসান দেয় না? কিন্তু তা বললে চলবে না, প্রমাণ দিতে হবে ওই পোস্টে সত্যি লোক আছে।

রাখাল চুপ করে শুনছিল। আশা ঘুচে যাওয়ায় সে স্বস্তি পেয়েছে। তার বদলে এবার যেন রাজীব কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে মনে হয়।

রাখাল বলে, আমাকে ওই কাজে লাগাবেন?

: ঠিক ধরেছেন! আপনার মত লোক হলেই ভাল। অনেককাল অন্য আপিসে কাজ করেন নি, কেউ বলতে পারবে না আপনি এ পোস্টে ছিলেন না।

রাখাল মৃদু হেসে বলে, পাঁচশো টাকাই পাব তো আমি?

দীননাথও মুচকে হেসে বলে, দু'একমাস পাবেন বৈ কি। তবে কি জানেন, এ বাজারে পাঁচশো টাকা মাইনের লোক রেখে কি ব্যবসা চলে। পরে ওটা মিউচুয়ালি ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। আপনারও যাতে সংসারটা চলে, কোম্পানীরও যাতে—বুঝলেন না।

: বুঝলাম বৈকি। পুরনো পে-বিলে আমাকে সই করতে হবে তো? পোস্টে যে নামে লোক আছে সে নামটাও নিতে হবে নিশ্চয়?

দীননাথ নীরবে সায় দিয়ে চোখ পিট পিট করতে করতে বলে, আপনার কোন রিস্ক নেই। রাজীবের বন্ধু-মানুষ আপনি, আপনাকে করে দিতে পারি কাজটা। গোড়ায় দু'তিন মাস ওই পাঁচশো টাকাই পাবেন, তারপর এ পোস্টটা তুলে দিয়ে অন্য একটা কাজ দেয়া হবে আপনাকে। ভেবে চিন্তে বলুন, লাগবেন না কি? আরও ক'জন ক্যাণ্ডিডেট আছে, আজকেই একজনকে লাগিয়ে দেয়া হবে। বুঝলেন না?

রাখাল লক্ষ্য করে যে, রাজীবের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেছে, রীতিমত শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে তার দিকে চেয়ে আছে। তার মনোভাব রাখাল অনুমান করতে

পারে। চাকরিটার মধ্যে যে এত প্যাঁচ আছে এটা তার জানা ছিল না। এখন সে পড়ে গেছে মহা দুর্ভাবনায়। রাখালের ভালমন্দের জন্য তার ভাবনা নয়, ভাবনা বাড়ির সেই মানুষটির জন্য, যার কথায় রাখালকে সে এই চাকরির খোঁজ দিয়েছে। রাখাল যদি মরিয়া হয়ে রাজী হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ফ্যাসাদে পড়ে, বাসন্তীর কাছে সহজে সে রেহাই পাবে না।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, না মশাই, এ কাজ আমার পোষাবে না।

রাজীব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

দীননাথ বলে, সে তো আপনার ইচ্ছা। তবে, আপনি হলেন আমাদের রাজীবের বন্ধু, ভেতরের কথা সব খুলে বলেছি আপনাকে। দেখবেন যেন—

রাখাল বলে, সে জন্যে ভাববেন না। তাছাড়া, সত্যি সত্যি আসল কথা কিছুই বলেন নি আমায়। কার ব্যবসা, কোন্ আপিস আমি কিছুই জানি না। ইচ্ছা থাকলেও আমি কোন ক্ষতি করতে পারব না।

দীননাথ গম্ভীর হয়ে বলে, দাদা, ইচ্ছা থাকলে সবাই ক্ষতি করতে পারে।

: কে জানে। তবে আমার যখন ইচ্ছাই নেই তখন আর কথা কি!

রাজীব বলে, ওসব ভেবো না দীনু, রাখালবাবু খাঁটি মানুষ। আমি জানি তো ওঁকে।

রাখাল বিদায় নিলে তার সঙ্গে রাস্তায় নেমে গিয়ে রাজীব অপরাধীর মত বলে, কিছু মনে করলেন না তো রাখালবাবু।

চাকরি যেন গাছের ফল। পচে নষ্ট হয়ে যাবে বলে মানুষ যেন প্রতিবেশীদের যেচে যেচে চাকরি বিতরণ করে!

একথা বলায় সাধনা চটে গিয়েছিল। কারো কোন মতলব না থাকলে, ভিতরে কোন প্যাঁচ না থাকলে চাকরি যেন এভাবে হাওয়ায় উড়ে এসে হাজির হয় বেকারের কাছে, ছাঁটাই বেকারি দুর্ভিক্ষের অভিশাপে কান্নায় কান্নায় ভরা এই দেশে।

রাজীবের মতলব ছিল শুধু বৌয়ের একটু মন যোগানো। তাতেই যেন রীতিনীতি উল্টে গিয়েছে সংসারের! এ ভাবে যে চাকরি হয় না বেকারের এ সত্যটা মিথ্যে হয়ে গেছে। সাধনা চায়, তাই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে বাধ্য। তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খাতির করার জন্যই অঘটন ঘটতে হবে সংসারে।

সাধনার প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যবহার আজ নতুন হতাশা এনে দিয়েছে রাখালকে। সাধনা তার সাধারণ বাস্তব বুদ্ধি হারাতে বসেছে ভেবে তার ভয় হয়েছিল, আসলে এ বুদ্ধি কোনদিনই ছিল না তার।

তার স্বভাবে একটা ধৈর্য আর সংযম ছিল, সাধারণ সহজ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার একটা ভাসাভাসা বাস্তব-বোধ ছিল। তার বেশী কিছু নয়। সাধারণ হিসাবে বুদ্ধিমতী মেয়ে, সেই সঙ্গে খানিকটা ধৈর্য আর সংযমের সমাবেশ,—এটাকেই সে মনে করেছিল সচেতন বাস্তববোধ। দুঃখের দিন শুরু হবার পর এটাকেই সে ধরে নিয়েছিল পরম আশীর্বাদ বলে।

ভেবেছিল, যেমন বিপাকেই পড়ুক আর যত মারাত্মক হোক অবস্থা, শেষ পর্যন্ত দুর্দিন সে পার হয়ে যাবে। সাধনা আরও শোচনীয় করে তুলবে না অবস্থা, পদে পদে ব্যাহত করবে না তার লড়াই, সবটকু জীবনীশক্তি সে কাজে লাগাতে পারবে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে।

বরং নানাভাবে তাকে সাহায্যই করবে সাধনা। শুধু সেবা করে ভালবেসে নয়, সব কষ্ট আর জ্বালা লুকিয়ে সব সময় হাসিমুখ দেখিয়ে নয়—ওসব অতটা দরকারী মনে করে নি রাখাল। বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সাধনা বাস্তব অবস্থা বুঝে তার সঙ্গে চলতে পারবে—এটাই ছিল তার সব চেয়ে বড় ভরসা। কদিন ধরে ভাঙতে ভাঙতে আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সে ভরসা। সে রকম বাস্তব বুদ্ধিই নেই সাধনার, সে করবে স্রোতে গা ভাসিয়ে ধ্বংসের দিকে চলার বদলে অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে রেখে বাঁচার চেষ্টায় তাকে সাহায্য!

একটা গোড়ার হিসাবেই তার ভুল হয়ে গেছে। বড় মারাত্মক ভুল।

গোড়া থেকে খেয়াল রাখলে ধৈর্য আর সংযমের সীমা পার হয়ে সাধনাকে সে নতুন এক বিপদ হয়ে উঠতে দিত না, অন্যভাবে সামলে চলতে পারত একদিকটা। গোড়া থেকে জানা থাকলে আজ সাধনার উপর সব আস্থা হারিয়ে নিজেকে এত বেশী নিরুপায় অসহায় মনে হত না।

দিনের পর দিন কি শক্তিটাই তাকে ক্ষয় করে আসতে হয়েছে দেহ আর মনের। প্রথম থেকে না জেনে আজ এই অসময়ে জানা গেল সাধনা তার সাথী নয়, বোঝা।

চায়ের কাপ সামনে রেখে রাখাল ভাবে। নতুন করে আবার হিসাব মেলাবার চেষ্টা করে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কোন লাভ নেই, তার চেয়ে এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে চায়ের দোকানে আধঘণ্টা বসা ভাল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা রাখাল জেনেছে।

দেয়ালে গত বছরের ক্যালেণ্ডারের একটা ছবি ঝুলানো। অতি সুন্দর ছবি বলে ক্যালেণ্ডার শেষ হয়ে গেলেও ছবিটা টাঙানো আছে। বড়ই জনপ্রিয় হয়েছে

ছবিটি। বনবাসিনী স্বামীসোহাগিনী সীতা ধনুকধারী সন্ন্যাসী রামের অঙ্গলগ্না হয়ে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অদূরে সোনার হরিণকে। ছবির দিকে তাকানো মাত্র বোঝা যায় সীতার কী আবদার—জগৎ সংসার চুলোয় যাক, সোনার হরিণ তার চাই!

রাজার মেয়ে আর রাজার যে ছেলে রাজা হবে তার বৌ; কত সোনার কত গয়নাই না জানি সীতার ছিল! সব গয়না ফেলে, গায়ের গয়নাগুলি পর্যন্ত খুলে রেখে বনে যেতে মায়া হয় নি সীতার। কিন্তু বনের মধ্যে সোনার হরিণ দেখেই মেয়েদের চিরন্তন সোনার লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার অবুঝ আবদারের কাছে হার মানতে হয়েছে রামের।

গয়না ফেলে আসতে মায়া হয় নি, সে কি এইজন্য যে চৌদ্দ বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে? চৌদ্দ বছর পরে রাম আবার রাজা হলে ওই রেখে-যাওয়া সোনার গয়নার সঙ্গে আরও কত গয়না যোগ হবে সীতার।

নয় তো নতুন প্যাটার্নের নতুন একটা গয়নার মত সোনার একটা হরিণ দেখে এমন মোহ কি জাগতে পারে সীতার, গায়ের গয়নাগুলি পর্যন্ত যার তুচ্ছ করে ফেলে আসতে একবার ভাবতে হয় নি?

চা জুড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে মাথাটা বেঞ্চের উপর নেমে আসে রাখালের। চায়ের জন্য পয়সা দিতে হবে। চায়ের কাপে একটা চুমুক না দিয়েই বেচারি গভীর ঘুমের কবলে গিয়ে পড়েছে।

তাকে যে চা দিয়েছিল সেই ছোকরাই একটু ইতস্তত: করে আস্তে ডাকে, বাবু—

দোকানের মালিক গিরীন সামনে ছোট্ট টেবিলটিতে ক্যাশবাক্স রেখে নিজের সাত বছরের পুরনো মোটা কাঠের টুলে বসে চারিদিকে শ্যেন দৃষ্টি পেতে রাখে। সে চাপা গলায় ধমকে ওঠে, এই চোপ, ডাকিসনে। খবর্দার বলে দিলাম।

ঘণ্টু কাছে সরে এসে বলে, মোটে এক কাপ চা নিয়েছে—

: হল বা এক কাপ চা, নিয়েছে তো!

ঘণ্টু চোখ বুজে একটা অদ্ভুত মেয়েলি ভঙ্গি করে। ছেলেটার মেটে মেটে ফর্সা রঙ্, মুখে বসন্তের দাগ, গোলগাল চেহারা। ঘণ্টুর চালচলনে খানিকটা মেয়েলি ভাব আছে, বৌ-বৌ ভাব। গলায় তার একটি সোনার চেন-হার।

গিরীন বলে, আরে শালা, খদ্দের হল খদ্দের। খাতির পেলে আরাম পেলে তবে তো একদিনের খদ্দের দশ দিন আসবে। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক না বাবু, ঘুম ভেঙে খুশী হবে। ভাববে যে, না, এ দোকানটা ভাল।

বলে গিরীন ঘণ্টুর গালটা টিপে দেয়

বেঞ্চ থেকে যখন সে মাথা তোলে বেলা পড়ে এসেছে।

ঘণ্টু বলে, রাতে ঘুমোন নি বাবু?

রাখাল নীরবে চায়ের দামটা তার হাতে দেয়। অপরাধীর মতই তাড়াতাড়ি চায়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে এতক্ষণ দোকানে আশ্রয় নিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ার মত নিরাপদ আশ্রয়।

পথে অসংখ্য মানুষ। দোকানে লোক কম, কাপড়ের দোকানেও—যত ভিড় গিয়ে যেন জমেছে রেশনের কাপড়ের দোকানে। সাধনাকে এমাসে একখানা কাপড় দিতেই হবে। আগেকার ক'খানা ভাল কাপড় ছিল বলে এ পর্যন্ত কোন মতে চলেছে, আর চালানো অসম্ভব। সেলাই করে চালিয়ে দেবারও একটা সীমা আছে, যার পরে আর চলে না, নিজে থেকে কাপড় ফেঁসে যায়।

তার নিজের? তাকে তো বেরোতে হবে টুইসনি করতে, চাকরি খুঁজতে। তার নিজেরও একেবারে অচল অবস্থা। কি দিয়ে কিভাবে কি করবে ভেবেও কূল পাওয়া যায় না।

কিন্তু সাধনা এদিকে যাবেই তার ভাগ্নীর বিয়েতে, নতুন হার গলায় পরে যাবে! নিজের কানপাশা রেবাকে উপহার দিয়ে সম্মান বজায় রাখবে!

তীব্র জ্বালাভরা হাসি ফোটে রাখালের মুখে!

প্রভাকে পড়াতে যেতে আরও প্রায় দু'ঘণ্টা দেরী। রাস্তায় রাস্তায় কাটাতে হবে এ সময়টা। আরও একটা টুইসনিও যদি জোটাতে পারত!

পথেই সময় কাটায়। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় ছোট পার্কটার বেঞ্চে বসবার জায়গার খোঁজে—বেঞ্চ খালি নেই। মানুষ বেড়াতে বেরিয়ে বেঞ্চ ক'টা দখল করে নি। যারা বসেছে তারই মত তাদেরও দরকার হয়েছে কোথাও একটু বসবার। এটা বোঝা যায়!

এক বাড়ির রোয়াকে বসতে পায়। তাও নির্বিবাদে নয়!

: কি চান?

: কিছু না। একটু বসছি।

জানালায়-উঁকি-দেওয়া প্রৌঢ় মুখটি খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আড়ালে সরে যায়।

কয়েক হাত তফাতে ফুটপাতে ঘোমটা টেনে একটি বৌ বসে আছে। তার সামনে বিছানো ন্যাকড়ায় পড়ে আছে একটি ঘুমন্ত কঙ্কাল শিশু। বৌটির সর্বাঙ্গ

ঢাকা, সেলাই-করা শতজীর্ণ ময়লা কাপড়েই ঢাকা, শুধু ডান হাতটি বার করে পেতে রেখেছে নিঃশব্দ প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তার সামনে পথ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মিছিল পার হয়ে যায়। তিনটিই চলেছে একদিকে। মেয়েপুরুষ ছেলেমেয়ের দুটি মিছিল, একটি মজুরের। উদ্বাস্তুদের মিছিল, ছাত্রছাত্রীর মিছিল, ধর্মঘটী মজুরের মিছিল। হাতে হাতে প্লাকার্ডে লেখা দাবিগুলি উঁচু করে তুলে ধরে একসঙ্গে মুখে দাবি ঘোষণা করতে করতে চলেছে মিছিলগুলি। রাখাল ভাবে, প্ল্যাকার্ড লিখে আর মুখে ধ্বনি তুলে ঘোষণার বোধ হয় দরকার হয় না আর। সব মানুষের আজ কিসের অভাব আর কি কি চেয়ে মানুষ মিছিল করে কারো কি অজানা আছে।

ঘোমটা তুলে দিয়ে তিনবারই বৌটি যতক্ষণ দেখা যায় মিছিল ছাখে, তারপর আবার ঘোমটা টেনে ডান হাতটি তেমনিভাবে একটু বাড়িয়ে ধরে বসে থাকে। মুখ দেখে বোঝা যায় বয়স তার সাধনার চেয়েও কম হবে।

এই বৌটিকে যদি সাধনা একবার দেখত!

কিন্তু সত্যাই কিছু লাভ হত কি দেখে? এই বৌটিকেই না দেখুক, এরই মত অভাগিনী বৌ তো আজ পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে দেশের, তাদের দু'চার জনকে কি আর ছাখে নি সাধনা?

সাধনা কি জানে না, দেশের বেশীর ভাগ লোকের আজ কি অবস্থা এবং সেজন্য নিজেরা কেউ তারা দায়ী নয়?

কিন্তু দেখেও সাধনা দেখবে না, জেনেও সে জানবে না। তাকেই সে দায়ী করে রাখবে সব দুর্ভাগ্যের জন্য! সে বুঝবে না যে ঘরের চাপে বাইরের চাপে রাখাল যদি পঙ্গু হয়ে যায়, তারপর হয় তো তারও একদিন এই বৌটির দশাই হবে

প্রভা বলে, জ্বর নিয়ে পড়াতে এলেন নাকি?

: জ্বরের মত হয়েছে একটু।

: তবে এলেন কেন?

রাখাল মনে মনে বলে, এলাম কেন? না এলে তোমরা যে রাগ করবে।

মুখে বলে, খানিকক্ষণ পড়িয়ে যাই। একেবারে ফাঁকি দিলে চলবে কেন?

প্রভা মুখ ভার করে বলে, ভাগ্যে আমি আপনাকে মাইনে দিই না—টাকাটা বাবার। নইলে সত্যি একবার চটতে হত। মুখের ওপর এমন করে কাউকে ধিক্কার দিতে আছে?

: ধিক্কার কিসের?

প্রভা একটু হেসে বলে, আমরা জন্ম জন্ম দাসীর জাত, মেয়েমানুষ। ধিক্কার দেবার এ কৌশল আমরা জানি। জর গায়ে রাঁধতে গিয়ে আমরা যখন বলি, না রেঁধে উপায় কি, সবাই খাবে কি—তখন সেটা পুরুষদের ধিক্কার দিয়েই বলি।

: তোমাকে রাঁধতে হয় নাকি ?

বলেই রাখাল গুম খেয়ে যায়। আগের বার ধিক্কার না দিয়ে থাকলেও এ কথাটা রীতিমত খোঁচা দেওয়া হয়ে গেছে। বড়লোকের মেয়েকে এ প্রশ্ন করার একটাই মানে হয়।

মুখখানা সত্যিই ম্লান হয়ে যায় প্রভার। এত উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ যে মুখে একটু মেঘ ঘনালেই মনে হয় দুর্যোগ ঘনিয়েছে।

রাখাল আবার বলে, কিছু মনে করো না প্রভা।

প্রভা বলে, কেন মনে করব না ? আমার বাবা কি খুব বেশী বড়লোক ? বারো শো টাকা মাইনে পান। আজকের দিনে বারো শো টাকা পেলে কেউ বড়লোক হয় ? টাকার ভাবনায় রাত্রে বাবার ঘুম হয় না তা জানেন ?

রাখাল বিব্রত হয়ে বলে, আমি এমনি বলেছি কথাটা। একটা রাঁধুনী তো আছে, তোমরা না রাঁধলেও চলে, এর বেশী কিছুই বলতে চাই নি।

প্রভা কিন্তু এত সহজে তাকে রেহাই দিতে রাজী নয়। সে ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, তা না চাইলেও এটা সত্যি যে আমাদের সম্পর্কে আপনাদের অনেক ভুল ধারণা আছে। রাঁধতে হয় না বলেই কি আমি স্বাধীন ? যাদের রাঁধতে হয়, আমিও তাদের দলের। খানিকটা আরামে থাকি, এইটুকু তফাত।

রাখাল আর কথা কয় না। এবার কিছু বলা মানেই ছাত্রীর সঙ্গে তর্কে নামা। প্রভা নতুন থিয়োরি শিখেছে, সবটাই অতি রোমাঞ্চকর। তফাত থাকলেও যে রাঁধুনী রাখে পয়সা দিয়ে সে সমান হয়ে গিয়েছে দুবেলা যাকে পয়সার জন্য পরের বাড়ি হাঁড়ি ঠেলতে হয় তার সঙ্গে—এই অতি মনোরম সিদ্ধান্ত সে আবিষ্কার করেছে একেবারে অন্য স্তরের অন্য এক সত্য থেকে। বড় ধনী ছাড়া বড় ধনিকের শাসনে সবাই এদেশে নিপীড়িত। দুর্মূল্য খোলা বাজার আর চোরা-বাজার শুধু তার বাবার মত বারো শো টাকা আয়ের মানুষকে কেন, আয় যাদের আরও অনেক বেশী তাদেরও জোরে আঘাত করেছে—মাঝারী ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত আজ বেসামাল হবার উপক্রম। ধনিক শাসনের অবসান শুধু গরীবের নয়, এদেরও স্বার্থ।

এ পর্যন্ত অবশ্যই সত্য কথাটা। কিন্তু এই সূত্র ধরেই প্রভা যখন তাদের সঙ্গে সাধনাদের তফাতটা, অগ্নিমূল্যেও যারা আরাম বিলাস কিনতে পারে তাদের সঙ্গে

যাদের স্রেফ ভাত কাপড়ের টানাটানি তাদের তফাতটা নিছক আরামে থাকা না থাকায় দাঁড় করায় তখন গা জ্বালা করারই কথা।

আরামের অভাব আর আসল অভাব প্রভার কাছে এক।

প্রভা টেবিলের বইগুলি ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে, এ পড়া আজ পড়ব না। চুপ করে গেলেন কেন জানি। ভুল কথা কি বললাম আজ তাই পড়ান আমাকে। বেশ, আপনার কথাই ঠিক—

: আমি তো কিছুই বলি নি।

: চুপ করে থাকা মানেই বলেছেন। আপনি ভাবছেন, গরীবের মেয়ের সঙ্গে আমার তুলনা। তারা ভাল করে খেতে পরতে পায় না আর আমি দামী শাড়ি পরি, মাছ দুধ খেয়ে মোটা হই।

প্রভার গড়ন সত্যই একটু মোটাসোটা ধরনের। তাই নিজের কথায় নিজেই সে একটু মুচকে হাসে।

: কিন্তু ভাল খেতে পরতে পাই বলেই কি আমি পুরুষের অধীন নই, পুরুষের সম্পত্তি নই? আমার বেলা ভিন্ন নিয়ম। গরীব ঘরের মেয়েদের বেলা স্পষ্ট চোখে পড়ে, আমাদের বেলা আড়ালে থাকে এইমাত্র।

এবার তার মনের গতি ধরতে পেরে রাখাল হেসে বলে, তুমি ঠিক উল্টোটা বলছ। ওটা বরং গরীবের ঘরেই খানিক আড়াল থাকে। মেয়েরা যে পুরুষের সম্পত্তি বড়লোকের ঘরেই এটা সব দিক থেকে চোখে পড়ে। সাজিয়ে গুজিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে আদরে আহ্লাদে যে রাখে, তার মানেই তো তাই। নিজের সম্পত্তি তাই এত আদর, এত যত্ন। গরীবের ঘরেই হঠাৎ ধরা যায় না। মেয়েরা যরকম খাটে আর কষ্ট করে তাতে মনে করা চলে তারা কারো সম্পত্তিই নয়, বেওয়ারিস জিনিস। নিজের সম্পত্তিকে কেউ এত খারাপ ভাবে রাখে?

প্রভা দমে গিয়ে বলে, তাই তো! এটা তো ভাবি নি? আমি ভাবতাম মালিক মানেই যে কষ্ট দেয়, অত্যাচার করে।

: যেমন মিলের মালিক?—রাখাল হাসে, মালিক কি মিলের ওপর অত্যাচার করে? মিলটার জন্য তার যত দরদ। অত্যাচার করে মিলে যারা খাটে তাদের ওপর—কত কম পয়সায় যত খাটুনি আদায় করতে পারে।

রাখালের চা আর খাবার আসে। ভাল দামী খাবার, ডিমের মামলেট।

: জ্বরের উপর খাবেন?

রাখাল খেতে আরম্ভ করে বলে, জ্বর নয়, জ্বর-ভাব। খেতে না পেলেই সেটা হয়।

প্রভা নীরবে তার খাওয়া ছাখে। মনের মধ্যে তার পাক দিয়ে বেড়ায় একটা প্রশ্ন—বেকার জীবনের দারিদ্র্য কি পরিবর্তন এনেছে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের? যদি এনে থাকে, সে পরিবর্তনের মর্মকথা কি? সে জানে যে দারিদ্র্য রসকস শুষে নেয় জীবনের, জ্বালা আর অশান্তি রুক্ষতা এনে দেয় মাধুর্য কোমলতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে। কিন্তু ঠিক কিরকম হয় তার ভিতরের রূপটা? পরস্পরের সম্পর্কে মিষ্টতার অভাব ঘটে, কারণে-অকারণে তিক্ততার সৃষ্টি হয়—কিন্তু এসব সত্ত্বেও পরস্পরকে গ্রহণ তো তাদের করতে হয়। মানিয়ে চলতে হয় দুজনকে, মেনে নিতে হয় পরস্পরকে। কেমন হয় তাদের এই আত্মীয়তা? সব কিছু সত্ত্বেও আপন হওয়া?

নিস্তরঙ্গ ভোঁতা হয়ে যায়? যান্ত্রিক হয়ে যায়? বাস্তব বাঁধনে বাঁধা নিরুপায় দুটি নরনারীর স্থূল সম্পর্ক দাঁড়ায়?

অথবা দুঃখকষ্ট হতাশার প্রতিক্রিয়ায়, সংঘর্ষের জ্বালায় স্থূল বাস্তব আত্মীয়তা টুকু হয় উগ্র, অস্বাভাবিক, রোমাঞ্চকর?

কথাটা এমন জানতে ইচ্ছা করে প্রভার!

কিন্তু একথা তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না রাখালকে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে বোধ হয় জানাও যায় না এসব কথা।

অন্য আর একটা প্রশ্ন ছিল প্রভার। যে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সে প্রস্তুত করছে তারই সম্পর্কে।

ভেবেচিন্তে এ বিষয়েই সে প্রশ্ন করে। বলে, আচ্ছা, স্বাধীনভাবে যে মেয়েরা রোজগার করে তারা কি সত্যিকারের স্বাধীন?

এ প্রশ্নের মানে রাখাল জানত। এটা প্রভার ব্যক্তিগত প্রশ্নও বটে।

: স্বাধীনভাবে রোজগার করে? কোন্ দেশের মেয়ের কথা বলছ? এদেশে পুরুষেরা স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পায় না, মেয়েরা কোথা থেকে সুযোগ পাবে? রোজগার করে এই পর্যন্ত। এ ধারণাই বা তুমি কোথায় পেলে নিজে রোজগার করলেই মানুষ স্বাধীন হয়? পুরুষরা অন্ততঃ তাহলে স্বাধীন হয়ে যেত। সত্যিকারের স্বাধীনতা অনেক বড় জিনিস।

: মেয়েদের চাকরি-বাকরি করার তা হলে কোন মানে নেই?

: মানে আছে বৈকি। মস্ত মানে আছে। এদেশে বেশ কিছু মেয়ে ঘরের কোণ ছেড়ে রোজগার করতে বেরিয়েছে, এ একটা কত বড় পরিবর্তনের লক্ষণ আমাদের চেতনার। এটা কি সোজা কথা হল? সব চেয়ে বড় কথা কি জানো? যারা রোজগার করতে ঘর ছেড়ে বেরোয় নি তারাও এটা মেনে নিয়েছে। মেয়েমানুষ

আপিস করে শুনে ঘরের কোণার ঘোমটা-টানা বৌও চোখ বড় বড় করে গালে হাত দেয় না। সেকেলে গোঁড়া পুরুষ এটা পছন্দ না করলেও সায় দিয়েছে—আমার ঘরে ওসব চলবে না, তবে সমাজে চলছে, চলুক। পুরুষের অ্যাপ্রুভড্ উপায়ে মেয়েরা রোজগার করুক এটা চালু হয়ে গেছে সমাজে -কিছু মেয়ের চাকরি করার চেয়ে এটাই বড় কথা।

: পুরুষের অ্যাপ্রুভড্ উপায়ে ?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রাখাল স্থির দৃষ্টিতে প্রভার মুখের দিকে চেয়ে বলে, তাছাড়া কি উপায় আছে ? সামাজিক অনুমোদন মানেই পুরুষের অনুমোদন। এটা হল চাকরি-বাকরির বেলায়। অন্যভাবেও মেয়েরা রোজগার করে সমাজ সে নোংরা উপায়টাতে সায় দেয় না, সয়ে যায়। কিন্তু ওসব কারবারও পুরুষরাই চালায়, তারাই কর্তা।

প্রভা কাতরভাবে বলে, এতকাল নারী-আন্দোলন করে আমরা তবে করলাম কি ?

রাখাল আশ্বাস দিয়ে বলে, অনেক কিছু করেছো। সারা দেশের মুক্তি-আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছো। মেয়েপুরুষের আসল স্বাধীনতার লড়াইকে জোরালো করেছো। তবে শুধু মেয়েদের জন্য মেয়েদেরই পৃথক নিজস্ব নারী-আন্দোলন তো নিছক সস্তা শখের ব্যাপার—মেয়েরাও প্রাণের জ্বালায় যাতে আসল বড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে না বসে সেজন্য তাদের স্বার্থ ভিন্ন করে নিয়ে একটা বেশ ঝালঝাল টকটক মিষ্টিমধুর আন্দোলনে তাদের মাতিয়ে দেওয়া। পুরুষেরা মেয়েদের দাসী করে রেখেছে, এই বলে মেয়েদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার মানেই হচ্ছে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মত পুরুষ রাষ্ট্র, নারী-রাষ্ট্র চাওয়া।

রাখাল একটা সিগারেট ধরায়। এই একটা সিগারেটই তার সম্বল ছিল।

বলে, পুরুষের বিরুদ্ধে মেয়েদের কোন লড়াই নেই। সব লড়াই অবস্থা আর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কোন দেশে যদি একজন বেকার থাকে, সে দেশে একটি মেয়ের সাধ্য নেই স্বাধীন হয়। সকলের ভাতকাপড় পাওয়া আর মেয়েদের স্বাধীন হওয়া—হলে দুটোই একসাথে হবে, নইলে কোনটাই হবে না।

প্রভা সংশয়ের সঙ্গে বলে, আপনি ধাঁধায় ফেললেন। মেয়েরা এরকম পদানত হয়েই থাকবে, তার মানে আন্দোলন করবে শুধু পুরুষেরা ?

রাখাল খুশী হয়ে বলে, ভাগ্যে আজ পড়তে না চেয়ে তর্ক জুড়েছ প্রভা। নইলে

একটা ভুল ধারণা থেকে যেত তোমার সম্পর্কে, ভাবতাম তুমি বুঝি শুধু মুখস্থ আর পরীক্ষা পাস কর।

প্রভা খুশী হয়ে মাথা নত করে টেবিলে আঙুল দিয়ে লাইন টানে।

রাখাল বলে, কিন্তু এত মেয়ে লড়াই করছে, গুলির সামনে পর্যন্ত বুক পেতে দিচ্ছে, তবু তোমার এ ধাঁধা কেন?

: সে তো শুধু কিছু অগ্রণী মেয়ে।

: অগ্রণী হয় কারা? যারা পিছিয়ে আছে তাদের যারা এমনভাবে ছাড়িয়ে গেছে যে, কোন মিল নেই, সম্পর্ক নেই? একজনও যখন এগিয়ে যায় তখন বুঝতে হবে পিছিয়ে থাকলেও দশজনের মধ্যে সাড়া এসেছে, সমর্থন এসেছে –সে তারই প্রতীক। নইলে সে কি নিয়ে কিসের জোরে এগোল? পুরুষেরা এগিয়ে গেলে মেয়েরাও এগিয়ে যাবে। মেয়েদের দমিয়ে রেখে বাদ দিয়ে কি পুরুষের লড়াই চলে।

প্রভা তবু ছাড়বে না। মৃদু হেসে বলে, লড়াই পুরুষের, তবে মেয়েদেরও দরকার বলে দয়া করে সঙ্গে নেয়। আমিও এই কথাই বলছিলাম।

রাখালের মুখেও হাসি ফোটে। দয়া মায়া সমাজ শ্রেণী মেয়ে পুরুষ সব জড়িয়ে দিচ্ছ কিনা, তাই এই ধাঁধাও কাটছে না। দয়া? দয়া আবার কিসের? অবস্থা পাল্টে দিতে যে পুরুষ লড়াই করছে, অবস্থাটা কি আর কেন না জেনেই কি সে লড়াই করছে? মেয়ে পুরুষের বর্তমান সম্পর্কটাও যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আরেকটা অভিশাপ,—পুরুষের পক্ষেও অভিশাপ, সে তা জানে। এ অভিশাপ, দূর করাও তার কাজ।

একটু থেমে রাখাল আবার বলে, স্বাধীনতার লড়াইয়ের চেতনা যে স্তরেই থাক, এ চেতনাটাও থাকে। না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না—কবে লেখা হয়েছিল মনে আছে?

প্রভা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কোন একটা প্রশ্ন করবে কি করবে না ভেবে সে ইতস্তত: করছে বুঝে রাখালও চুপ করে অপেক্ষা করে।

: একটা কথা বললে রাগ করবেন?

: কথাটা না শুনে কি করে বলি?

: যে কথাই হোক, আগে বলুন রাগ হলেও রাগ করবেন না। একটিবার নয় রাগ না করার চুক্তিতে একটা কথা আমায় বলতেই দিলেন!

: বেশ তাই হবে, বলো।

প্রভা গম্ভীর হয়ে মুখের ভাবে গুরুত্ব আনে। জোর করে সোজা তাকিয়ে থাকে রাখালের চোখের দিকে।

আপনি এত বোঝেন। সাধনাদি কেন ঘর ছেড়ে বেরোন না? শুধু সংসারটুকু নিয়ে থাকেন?

এ রকম প্রশ্ন রাখাল কল্পনাও করে নি। মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সাধারণ আলোচনা থেকে প্রভা একেবারে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসবে, এটা ভাবা সত্যই সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। রাগ হয় প্রচণ্ড, মুখ তার লাল হয়ে যায়। দেখে মুখখানা ম্লান হয়ে আসে প্রভার।

রাগটা সামলে যায় রাখাল। রাগ করবে না কথা দিয়েছে বলেই শুধু নয়, প্রভা যে তাকে খোঁচা দিতে বা অপমান করতে কথাটা জিজ্ঞাসা করে নি এটা খেয়াল করে। মনের মধ্যে এ ধাঁধাটাও পাক খাচ্ছিল তার। সরলভাবে তাকেই জিজ্ঞাসা করে বসেছে এর সমাধান কি।

: সাধনাদিকেই জিজ্ঞাসা করলে পারতে প্রভা।

: তিনি তো বুঝিয়ে দিতে পারবেন না।

: তুমি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে। তোমার সাধনাদি বুঝিয়ে দিতে পারবে না সে কেন ঘরের কোণায় দিন কাটায়। তার মানেই সে এসব বোঝে না।

: আপনি বুঝিয়ে দেন না?

রাখাল ম্লান হেসে বলে, বুঝবে কেন? এসব বুঝিয়ে দেবার চুক্তিতে তো তাকে বিয়ে করি নি।

এটা রাগের কথা রাখালের।

বাড়ি ফেরার পথে রাখালের মনে হয়, তার কথায় মস্ত একটা ফাঁকি আছে।

সত্যই সে কি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে সাধনাকে যে তাকে আর তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আর তার একার নেই? এজন্য নেই যে এটা তার অসাধ্য হয়ে গেছে, এমনি আজ দুরবস্থা দেশের?

না, আন্তরিকভাবে বাস্তব উপায়ে এ চেষ্টা সে কোনদিন করে নি।

কথাই শুধু বলেছে নানারকম। দেশ-বিদেশের কথা শুনিয়েছে সাধনাকে, দেশের আজ কেন এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা সেটা ব্যাখ্যা করেছে অনেকটা নিজের বেকারত্বের সাফাই হিসাবে। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে, নিজের দোষে সে বেকার নয়, সাধনা যে কষ্ট পাচ্ছে সেটা তার অপরাধ নয়, দেশের মানুষ যাদের বিশ্বাস

করেছিল, যারা সত্যিকারের মুক্তি এনে দেবে ভেবেছিল, এটা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল।

বেঁচে থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সে ভাগাভাগি করতে চায় নি সাধনার সঙ্গে। যেভাবে পারে একা সে ভরণ-পোষণ করবে তাকে আর তার আগামী সন্তানদের, নীড় বেঁধে দিয়ে রক্ষা করবে সেই নীড়, বিয়ের এই যুক্তিটা নিজেই সে পালন করতে চেয়েছে প্রাণপণে। অক্ষমতার জন্য তাই অবস্থার অজুহাত দিয়ে, নিজের নির্দোষিতার কৈফিয়ত দিয়ে শুধু মান বাঁচাতে চেয়েছে সাধনার কাছে।

আসলে আজও তার মন মজে রয়েছে আগের দিনের ফুরিয়ে-আসা জীবনধারার রসে। চাকরি করে দুটো পয়সা এনে ছোট একটা ঘর বেঁধে সীমাবদ্ধ জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখ নিয়ে দিন কাটাবার অভ্যাস আজও নেশার মত তাকে টেনেছে আজও সে জের টেনে চলতে চায় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সেই অভ্যাসের!

জানে সে জগৎ পাল্টে যাচ্ছে, তাদের ঘর-সংসার ভেঙে পড়ছে সেই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে, শেষ হয়ে আসছে তাদের মত মানুষের পুরনো ধাঁচের জীবনযাত্রা। আর ফিরে আসবে না তাদের আগেকার জীবন।

তবু, জেনেও এখনো সে আঁকড়ে থাকতে চায় সেই জীবনকেই, যেটুকু আজও বজায় রাখা যায় সেইটুকু দিয়েই আজও মন ভুলাতে চায় নিজের যে এখনো টিকে আছি, টিকিয়ে রেখেছি পারিবারিক জীবন।

নিজে একা একটু অংশ নিয়েছে সকলের দুরবস্থার প্রতিকারের চেষ্টায়, নতুন করে সব গড়ার লড়ায়ে। এটুকু করেই সন্তুষ্ট থেকেছে।

বাসে উঠে দেখা হল বেলার স্বামী ধীরেনের সঙ্গে।

বেলা সাধনার ছেলেবেলার বন্ধু। সেই সূত্রে রাখাল ও ধীরেনের পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হলেও দুজনের সম্পর্ক বন্ধুত্বের পর্যায়ে উঠতে পারে নি।

বোঝাই বাসে কথা হয় না। প্রভা আজ না পড়ায় রাখাল সকাল সকাল ছুটি পেয়েছে, বাসে এখন যাত্রীদের গাদাগাদি। পুরো টাইম পড়িয়ে রাখাল যেদিন বাসে ওঠে সেদিনও অবশ্য কিছুটা পথ তাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।

শহরতলীর কাছাকাছি গিয়ে ধীরেনের পাশেই সে বসতে পায়।

বলে, খবর কি?

: সেই এক খবর।

: কিছু হল না?

: কি করে হয়। রামরাজ্যে কিছু হয় না।

চাকরি দানের সরকারী আপিস সম্পর্কে ধীরেন তার নতুন অভিজ্ঞতার কাহিনী আরম্ভ করে, কাহিনী শেষ না হতেই বাস দাঁড়ায় তার নামবার স্টপেজে। সে বলে, নামুন না? খানিক বসে গল্প করে যাবেন?

এখান থেকে রাখালের বাড়িও মোটে কয়েক মিনিটের পথ। সে ধীরেনের সঙ্গে নেমে যায়।

সরু গলির মধ্যে চারকোণা উঠানের চারিদিকে ঘর তোলা সেকেলে ধরনের পুরনো একটি দোতলা বাড়িতে ধীরেনের আস্তানা—একতলায় একখানা ঘর, আলো-বাতাস খেলে না। সমস্ত বাড়িটাতে এমনিভাবে একখানা দু'খানা ঘর নিয়ে মোট ন'ঘর ভাড়াটে বাস করে। সকালে বিকালে ন টি ছোট বড় পরিবারের উনানে যখন প্রায় একসঙ্গে আঁচ পড়ে, অনেককে ঘড় ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় রাস্তায়।

বেলা বলে, আসুন।

সে হাতকল চালিয়ে ফ্রক সেলাই করছিল। তার নিজের মেয়েটির বয়স মোটে দু'বছর, ফ্রকটা দশ-এগার বছরের মেয়ের। আরও দু'তিনটি সেলাই-করা সায়া ব্লাউজ পাশে পড়ে আছে, কিছু আলগা ছিটের কাপড়ও আছে।

: এত কি সেলাই করছেন?

বেলা শুধু একটু হাসে।

জামা কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরতে পরতে ধীরেন গম্ভীর শুকনো গলায় বলে, পাড়ার লোকের ফরমাশ সব। উনি বাড়িতে দর্জির দোকান খুলেছেন।

বলে সে গামছাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বেলা বলে, গয়না বেচে খাচ্ছি। বিয়েতে কলটা পেয়েছিলাম, শখের জিনিস ঘর সাজিয়ে রেখে লাভ কি? এমনি কত জামা সেলাই করে দিয়েছি কতজনকে, আজ দরকারের সময় দুটো পয়সা যদি রোজগার হয়, দোষের কি আছে বলুন?

: কে বলে দোষ?

: উনি খুঁত খুঁত করেন। পাড়ার চেনা লোকের কাছে পয়সা নিয়ে জামা সেলাই করব, ওনার সেটা পছন্দ হয় না।

: পছন্দ না হয়ে উপায় কি?

: উপায় নেই। তবু পছন্দ হয় না।

রাখাল ভাবে, সাধনার কল নেই। কিন্তু কল থাকলেও সে কি নিজে উদ্যোগী হয়ে এভাবে কিছু রোজগারের উপায় খুঁজে নিতে পারত? এদিকটা খেয়াল কত

না সাধনার, সে হয়তো বলতো যে নগদ যা পাওয়া যায় তাতেই কলটা বেচে দাও, সেই টাকায় কিছুদিন চলুক!

৬

কি দোলটাই যে খায় সাধনার মন!

এক সিদ্ধান্ত থেকে একেবারে বিপরীত আরেক সিদ্ধান্তে।

বাসন্তী একরাশ নোট দিয়েছে তাকে—কারণ, হারের দামটা সে যা দিয়েছে তার মধ্যে দু'চারখানা পাঁচ টাকার ছাড়া বাকী সব দু'টাকা একটাকার নোট।

সংসারের খরচ থেকে একটি দুটি করে বাসন্তী টাকাগুলি জমিয়েছে।

বাসন্তী নিজে এসে গুণে দিয়ে গিয়েছিল নোটগুলি। সাধনা আরেকবার গুণে বাক্সে তুলে রেখেছিল—ট্রাঙ্কের মধ্যে তার গয়না রাখার ছোট বাক্সে। বাক্সে যেন আঁটে না এত নোট।

ক'ভরি সোনার বদলে একরাশি টুকরা কাগজ!

প্রথমে তার মনে জেগেছিল একটা দ্বিধা। রাখালের ভরসা না করে কাল আবার বাসন্তীর সঙ্গে দোকানে গিয়ে নিজেই কিনে আনবে নতুন হারটা? অথবা রাখালকে টাকা দেবে কিনে আনতে?

রাখালকে জানানো হয় নি, সে নিজেই হার বিক্রির ব্যবস্থা করেছে।

হার কেনার ব্যবস্থাটাও যদি রাখালকে না জানিয়ে করে? যে ব্যবহারটা রাখাল জুড়েছে তার সঙ্গে তার একটা উচিতমত জবাব দেওয়া হবে যে সে অত তুচ্ছ নয়, পরাধীন দাসী নয়।

বাড়াবাড়ি হবে? হোক বাড়াবাড়ি। তাকে নিয়ে রাজীবের মিথ্যা মতলব আন্দাজ করে বাড়াবাড়ির চরম করে নি রাখাল? সে কেন অত সমীহ করে চলবে তাকে?

তবু নানা সংশয় জাগে। একটা অজানা আতঙ্ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় প্রাণটা। জোর করে সে রেবার বিয়েতে যাবে, রাখাল না গেলেও একা যাবে—এই ঝগড়াটাই কোথা থেকে কিসে গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক নেই। রাখাল এখনও তার

হুকুম ফিরিয়ে নেয় নি, সেও ছাড়ে নি তার জিদ। এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তাদের এই বিরোধ যে, এ বিষয়ে তারপর একটি কথাও হয় নি তাদের মধ্যে!

রাখাল অপেক্ষা করছে সে কি বলে, কি করে দেখবার জন্য। হয় তো রাখাল আশাও করছে যে, সে তার জিদ ছেড়ে দিয়েছে তাই আর হারের কথা তুলছে না! আর এদিকে সে অপেক্ষা করছে রাখাল নিজে থেকে তার হুকুম ফিরিয়ে নেবে, নতুন হার এনে দেবার জন্য ভাঙা হারটা চেয়ে নেবে, আরেকবার তাকে বিবেচনা করার সুযোগ দেবে যে বিয়েতে সত্যি সে যাবে কিনা।

এ ব্যাপারেই কি ঘটে না ঘটে, আরও গোলমাল সৃষ্টি করা কি ঠিক হবে?

তার ভয় করে। মনে হয় নিজের দোষেই হয় তো সে নিজের সর্বনাশ করে বসবে। সবদিক দিয়ে দারুণ দুঃসময়, আর কাজ নেই অশান্তি বাড়িয়ে।

এই ভয়টাই আবার যেন তাকে ঘা মেরে কঠিন করে দেয়। এই ভয় যেন তাকে বলে দেয়, তোমার মত নিরুপায় অসহায় কেউ নেই, রাখাল ছাড়া তোমার আর গতি নেই, তোমার সাধ্য নেই রাখালের বিরুদ্ধে যাবার। রাখালের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুশী-অখুশীই তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুশী-অখুশী। রাখাল যদি রাখে তবেই তোমার মান থাকে। রাখাল খেতে পরতে না দিলে তুমি খেতে পাবে না, ন্যাংটো হয়ে থাকবে, খেয়াল নেই তোমার?

আগে খেয়াল ছিল না সত্যই, নিজের জিদ বজায় রাখতে গেলে রাখাল শেষ পর্যন্ত কি করবে এই ভয় এবার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়েছে।

একবারে যেন ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে নিজের সম্পর্কে তার মর্যাদাবোধ, এ সংসারে তার অধিকারবোধ মনুষ্যত্ববোধ!

এই তবে তার আসল সম্পর্ক রাখালের সঙ্গে, সংসারের এইখানে তার আসল স্থান?

ও বাড়ির সুধা নিয়মিত ভাবে মারধোর লাথিঝাঁটা পায় স্বামীর কাছে। সুধার সঙ্গে তার আসলে কোন পার্থক্য নেই। রাখাল যে তাকে মারধোর করে না সেটা নিছক রাখালের রুচি। এর মধ্যে তার কোন বাহাদুরী নেই।

তখন আবার বিগড়ে যায় সাধনার মন। এক উগ্র প্রচণ্ড বিদ্রোহ জাগে তার মধ্যে। হোক তার সর্বনাশ, ভেঙে চুরমার হয়ে যাক তার সংসার, ঘুচে যাক স্বামীর কাছে তার সব আশাভরসা—নত সে হবে না কিছুতেই।

খেতে পরতে দেয় বলে, চিরকালের জন্য তার স্বামীত্বের পদটা দখল করেছে বলে, রাখাল যদি এই জোর খাটিয়ে তাকে দমিয়ে রাখতে চায়—একবার সে

চেষ্টা করে দেখুক। দেখুক যে ঠিক মাটি দিয়ে গড়া তার সাধনা নয়, সেও রক্ত-মাংসের মানুষ, নিজের মান বাঁচাতে সেও শক্ত হতে জানে।

ছেলেকোলে সে রাস্তায় নেমে যাবে। ঝিগিরি রাঁধুনীগিরি করবে। দরকার হলে বেশ্যাবৃত্তি নেবে। তবু —

আবার দোল খেয়ে মন চলে যায় অন্য দিকে। আবার মনে পড়তে থাকে যে রাখাল এ পর্যন্ত তাকে অপমান বিশেষ কিছুই করে নি। সেই যে হর্তাকর্তা বিধাতার মত সোজাসুজি তাকে নিষেধ করে দিয়েছিল যে রেবার বিয়েতে তার যাওয়া হবে না, তারপর থেকে একরকম গুম খেয়েই আছে মানুষটা! রাগ করে একজন গুম খেয়ে থাকলে তাতে তার অপমান কিসের ?

তাকে ভাই-এর কাছে পাঠাতে চেয়েছে কিছুদিনের জন্য। দুরবস্থায় পড়লে এমন কি কেউ পাঠায় না ? এতে তার প্রাণে আঘাত দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মানে ঘা লাগবে কেন ?

যেচে চাকরি দিতে চায় বলে রাজীবের মতলব সম্পর্কে যে ইঙ্গিত সে করেছে, সেটা রাজীবের সম্পর্কেই। রাজীবের মনের মধ্যে কি আছে না আছে সে-কথা বলায় তার অপমান কিসের ? সে রাজীবকে প্রশ্রয় দেয় এরকম ইঙ্গিত তো রাখাল করে নি।

নিজেই সে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে ব্যাপারটা নিজের মনের মধ্যে। যা শুধু মনোমালিন্য স্বামী স্ত্রীর, সেটাকে দাঁড় করিয়েছে তার মনুষ্যত্ব বজায় থাকা না-থাকার প্রশ্নে।

তাছাড়া,—সাধনা এ কথাটাও ভাবে,—সংসারে সে তো এক নয় স্বামী যাকে খেতে পরতে দেয়, স্বামীই যার একমাত্র গতি। সব স্ত্রীরই এক দশা। এজন্য বিশেষভাবে নিজেকে ধিক্কার দেবার কি আছে!

স্বামীত্বের অধিকার যদি রাখাল একটু খাটাতেই চায়, আর দশজনের মত সেটুকু মেনে নিলেই বা দোষ কি? সুধার মত লাথি আর চাবুক সয়ে যাবার প্রশ্ন তো নয়!

কিন্তু বেশীক্ষণ একভাবে থাকে না তার মন। পালা করে নরম আর গরম হয়, আপোস থেকে বিদ্রোহে গতায়াত চলে।

ভোলার মা বলেছিল বিকালে আসবে।

বেলা পড়ে আসে, তার দেখা নাই। এই আবার আরেকটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সাধনার। হার বিক্রির টাকা থেকে সে নিজেই মাকড়ি জুটো বাঁধা রেখে ভোলার মাকে পঁচিশ টাকা দেবে ভেবেছে।

ভরি থানেক কম সোনার একটা নতুন হার সে কিনবে। দোকানে দেখে এসেছে, ওরকম সোনাতেও সর্বদা ব্যবহারের হার মন্দ হয় না।

কিছু টাকা তার বাঁচবে।

কিন্তু টাকা রাখলে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়ে যাবে। তার তো বাসন্তীর মত অবস্থা নয় যে, সংসারের খরচ থেকে বাড়তি দু'পাঁচ টাকা সরিয়ে সরিয়ে রেখে জমাতে থাকবে, খরচ করার দরকার হবে না।

তার চেয়ে মাকড়ি বাঁধা রাখলে হার-বেচা পঁচিশটা টাকাও যদি টিকে যায়।

কিন্তু ভোলার মা আসে না কেন? টাকার দরকার বলে সোনা ফেলে রেখে গেছে, তার কি তাগিদ নেই এসে খবর নেবার? সাধনা নিজেই এমন অধৈর্য হয়ে ওঠে যে, নিজেই সে আশ্চর্য হয়ে যায়।

গিয়ে দিয়ে এলে কেমন হয় টাকাটা ভোলার মাকে?

ওই তো চোখের সামনে দেখা যায় কুঁড়ে ঘরগুলি। এই তফাত থেকেই ঘরগুলিকে একে একে সে গড়ে উঠতে দেখেছে, এখান থেকেই এতদিন তাকিয়ে দেখেছে ঘরগুলিকে। ভোলার মা ছাড়া আর কারা এখানে থাকে, কিভাবে অতটুকু ঘরে থাকে, কিছুই সে জানে না।

গেলে দোষ কি?

পাঁচটার পর আর ধৈর্য থাকে না সাধনার। ব্লাউজের ভিতরে টাকা নিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে হাঁটতে হাঁটতে বেড়াতে বেড়াতে পুকুর পাড় ঘুরে সে ছোটখাট কালোনিটিতে যায়। কাছাকাছি গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে সমান দূরে দূরে সাজিয়ে বসানো ছাঁচে ঢালা ছোট ছোট ঘর, টুকরো টুকরো বাগান, সরু সরু পথ--চারিদিক পরিষ্কার ঝকঝকে। ঠিক যেন ছবির মত। ঘর-হারানো মানুষগুলি সব গড়েছে নিজের হাতে। এখনো কোন ঘরের টুকিটাকি কাজ চলেছে, কাজ করছে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে। কয়েক হাত বাগানটুকুতে পুরুষ লাগাচ্ছে সব্জি-চারা পুকুর থেকে জল এনে দিচ্ছে তার বৌ। রাস্তার কল থেকে কেউ কলসী করে জল আনছে, কেউ ধরাচ্ছে উনান, কেউ বেঁধে দিচ্ছে আরেকজনের চুল।

ভোলার মা'র ঘরটি পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। কলোনির একজন ঘরটা সাধনাকে দেখিয়ে দেয়।

সতের আঠার বছরের একটি মেয়ে বলে, কি চান?

: ভোলার মা ঘরে নাই?

: মা? মা ডিম বেচতে গেছে।

ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সাধনা বলে, তুমি দুর্গা, না?

মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে দুর্গা বলে, আসেন, বসেন।

একটা চওড়া বেঞ্চের মত মাটির দাওয়া, তাতে একটা তালপাতার চাটাই-এর আসন দুর্গা বিছিয়ে দেয়। বসতে বসতে সাধনা বলে, বসব কি, আমি তোমার মা'র খোঁজে এলাম, তোমার মা হয়তো ওদিকে আমার বাড়ি গেছে।

ভিতর থেকে পুরুষের গলা শোনা যায়, দুগ্গা জিগা তো ওইটার ব্যবস্থা করছেন নাকি?

দুর্গা বলে, মা আপনাকে মাকড়ি দুইটা দিছে না? কিছু করছেন?

এরা সবাই তবে জানে? ভোলার মা চুপি চুপি লুকিয়ে মাকড়ি দুটি বাঁধা রাখতে তার শরণাপন্ন হয় নি। এই একটা খটকা ছিল সাধনার মনে।

সে বলে, হ্যাঁ ব্যবস্থা করেছি। সেইজন্যই খুঁজতে এসেছিলাম তোমার মাকে।

গায়ে কাঁথা জড়িয়ে রাধেশ ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। চুলের পাকধরা লম্বা চওড়া মস্ত একটা মানুষ, ঠিকমত খেতে পেলে বোধ হয় দৈত্যের মত দেখাত। কতকাল ধরে উপবাসী দেহে স্বাস্থ্যের জোয়ার নেই, শুধু ভাঁটা। হাড় আর চামড়া শুধু বজায় আছে।

: জ্বর নিয়া উইঠ্যা আইলা ক্যান?

মেয়ের প্রতিবাদ কানেও তোলে না রাধেশ। ক'হাত তফাতে উবু হয়ে বসে ধীরে ধীরে বলে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। ভোলার মারে কইয়া দিছিলাম, মাকড়ি তুমি বেচবা না, কিছুতেই বেচবা না। ভাল মাইন্সের কাছে বাঁধা দিয়া টাকা পাইলে আনবা, না পাইলে আনবা না। দুই মাসে পারি ছয় মাসে পারি মাকড়ি আমি খালাস কইরা আনুম। মাকড়ি বেইচা বিয়া দিমু না মাইয়ার।

রাধেশ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কয়েকবার কাশে।

: মেয়ের বিয়ে নাকি?

: হ। তের তারিখে লগ্ন আছে, পার কইরা দিমু।

: ভোলার মা তো বিয়ের কথা কিছু বলে নি?

: কি কইব কন? নামেই বিয়া, নম নম কইরা সারুম। তবু কয়টা টাকা লাগব।

পঁচিশ টাকায় মেয়ের বিয়ে। দুর্গাকে ভাল করে দেখতে দেখতে সাধনা আশ্চর্য হয়ে বিবরণ শোনে। এখানকারই আরেকটি কুঁড়ে ঘরে থাকে ছেলেটি, নাম তার বিষ্ণুচরণ। মা আর বিবাহিতা এক বোনকে সাথে করে এখানে মাথা গুঁজেছিল। দূরে আরেক পাড়ায় ঘর বেঁধে বোনকে তার স্বামী নিয়ে গেছে। হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মা মরে গেছে বিষ্ণুর। কী অসুখ হয়েছিল কে জানে। হাস-

পাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, প্রথমে জায়গা মেলেনি, মরবার আধঘণ্টা আগে ঠাঁই পেয়েছিল সমিতির বাবুদের চেষ্টায়।

তা ওদিকে বিষ্টুকে থাকতে হয় একা, এদিকে এতবড় মেয়ে নিয়ে তাদেরও ঝন-ঝাটের অন্ত নেই। শকুন হারামজাদাগুলির নজর যেন খালি খুঁজে বেড়ায় কোথায় কোন গরীব অসহায়ের ঘরে অল্পবয়সী মেয়ে আছে। দু'পক্ষে তারা তাই পরামর্শ করে বিয়েটা ঠিক করেছে। দেনা পাওনা কিছু নেই, কাপড়গয়না থালাবাসন কিছুই লাগবে না, যেমন আছে মেয়ে আর ছেলে ঠিক তেমনি ভাবেই শুধু বিয়েটা হবে কলোনির দশজনের সামনে।

তবু শাঁখা-সিঁদুর তো চাই, পুরুত তো চাই, টুকিটাকি এটা ওটা তো চাই যা না হলে বিয়েই হবে না। একটি করে মিষ্টি দেওয়া হবে কলোনির সকলকে, সকলের মিলিত হুকুমেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে একটির বেশী মিষ্টি দেওয়া।

পেট ভরে খাবে শুধু বিষ্টুর বোন আর ভগ্নিপতি।

তবু, পঁচিশ টাকায় বিয়ে! সাধনার বিশ্বাস হতে চায় না কিছুতেই। হাতে আরও কিছু টাকা আছে, তার সঙ্গে এই পঁচিশ টাকা যোগ হবে নিশ্চয়।

: পঁচিশ টাকায় কুলিয়ে যাবে? সাধনা জিজ্ঞাসা করে।

: না কুলাইয়া উপায় কি? কুলান লাগব।

পঁচিশ টাকায় কুলিয়ে না নিলে বিয়ে হয় না, প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে হয় কবে আরও বেশী খরচ করার ক্ষমতা হবে সেই অজানা অনাগত দিনের আশায়। সবাই এটা বোঝে। তাই পঁচিশ টাকাতেই বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। সকলে মিলে পরামর্শ করে স্বীকৃত ব্যবস্থা।

দুর্গা চুপ করে দাঁড়িয়ে শোনে। মেটে রং, রোগা গড়ন, আধ-রুক্ষ একরাশি চুল! এত চুল বলেই বোধ হয় বিয়ের কটা দিন আগেও যথেষ্ট তেল দিয়ে চুলের রুক্ষতা সম্পূর্ণ ঘোচানো যায়নি।

হাতে দুগাছা করে নকল সোনার চুড়ি, কানে ওই নকল সোনারই দুল।

কথা কইতে কইতে ভোলার মা এসে পড়ে। সাধনার কাছেই সে গিয়েছিল, আশার কাছে খবর পায় যে তাকে এদিকে আসতে দেখা গিয়েছে। ভোলার মা'র অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় নি যে তার খোঁজে তাদের কুঁড়ের দিকেই গিয়েছে সাধনা।

ভোলার মা কৃতজ্ঞতা জানায় অপরূপ ভাবে।

শুধু বলে, ভাল মন্দ মানুষ চিনতে আমাগো ভুল হয় না।

অনেক দেখে অনেক ঠেকে সে নির্ভুল যাচাই করতে শিখেছে সৎ মানুষ আর অসৎ মানুষকে। সাধনার কাছেই সে গিয়েছিল মাকড়ি নিয়ে। সাধনা মানুষটা ভাল। সন্দেহাতীতভাবে ভাল!

ভোলার মাকে টাকা দিয়ে সাধনা একটু খুশী মনেই ঘরে ফেরে। উপর উপর কতটুকুই বা দেখেছে, আর কতটুকুই বা জেনেছে এখানকার মানুষের দিবারাত্রির জীবন, তবু তার মনে হয় সে যেন কিছুক্ষণের জন্য নতুন একটা জগৎ থেকে ঘুরে এল। ঘরের এত কাছে জীবনের একটা অতি সহজ প্রাথমিক সত্য এমনভাবে বাস্তব রূপ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে এটা যেন এখনো তার বিশ্বাস হতে চায় না, চোখে দেখে কানে শুনে আসার পরেও। তার ধারণাতীত ছিল এই সহজ সত্যটা। এত অসহায় এত নিরুপায় হয়ে পড়েও মানুষ হাল ছাড়ে না, এমনভাবে আবার আশ্রয় গড়ে নেয়, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনের নতুন ভিত গাঁথে!

পঁচিশ টাকায় আয়োজন করে ছেলেমেয়ের বিয়ের।

এতদিন সাধনার কাছে বিয়ের মানেটাই ছিল রোমাঞ্চকর স্বপ্নকে বাস্তব করা উপলক্ষে হৈ চৈ আনন্দ উৎসব। সমস্ত কিছু ছাঁটাই করে এরা বজায় রেখেছে শুধু বিয়ের প্রয়োজনটুকুকেই। খরচপত্রের আনন্দ উৎসব করার সাধ্য নেই বলে দমে গিয়ে বাতিল করে দেয় নি ছেলেমেয়ের বিয়ে হওয়া।

ওখানে যেতে হবে মাঝে মাঝে। কি দিয়ে কিভাবে ওরা সংসার চালায় ভাল করে জানতে হবে।

এইটুকু সময় নিজের চিন্তা ভুলে ছিল। ঘরের তালা খুলতে খুলতে ক্ষণিকের জন্য পিছু-হটা সমুদ্রের মতই তার চিন্তাভাবনা দ্বিধা সংশয় জ্বালা ভয় ছুটে এসে তার মনকে দখল করে।

এত জটিল এত বেখাপ্পা তার জীবন! অভাবের শেষ নেই একদিকে, অন্য দিকে সীমা নেই অশান্তির।

কেন এমন হয়? কেন তারা এই বিরোধ আর অশান্তি দূরে সরিয়ে দিয়ে অন্ততঃ মিলেমিশে শান্তিতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে পারে না? তাদের চেয়েও কি মনের জোর বেশী ভোলার মায়েদের? বিদ্যাবুদ্ধি বেশী?

শুধু রাখাল নয়, সকলের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে একটা আকণ্ঠ সাধ জাগে সাধনার। সবাই তারা কথা বলে পরামর্শ করে বিদ্বেষ আর ভুল বোঝা মিটিয়ে নেবে, তার মনেও কেউ আঘাত দেবে না, সেও এমন কিছুই করবে না যাতে কারো রাগ হতে পারে, দুঃখ হতে পারে।

ঝোঁকটা চাপতে পারে না সাধনা। তখনি উঠে আশার ঘরে যায়— সরলভাবে প্রাণখুলে আশার সঙ্গে আলাপ করবে! একরকম পাশাপাশি ঘর, অথচ তারা ভুলেও একজন আরেক জনের ঘরে যায় না, এ কী অর্থহীন অকারণ বিরোধ!

উনানে আঁচ দিয়ে দেয়ালে টাঙানো বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আশা চুল বাঁধছিল। আয়নায় সাধনাকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায় না, সেই ভাবেই যেন আয়নায় সাধনার প্রতিচ্ছবিকে জিজ্ঞাসা করে, কি বলছ?

: এমনি এসেছিলাম, গল্প করতে।

: ও! বেশ তো।

মুখ ফেরায় না আশা, চুল বাঁধা স্থগিতও করে না এক মুহূর্তের জন্য। সাধনা দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে বসতেও বলে না।

সাধনা ঠিক করেই এসেছিল যে আশা কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না, নিজের মান-অপমান নিয়ে মিথো কাতর হবে না, অন্য সমস্ত হিসাব বাদ দিয়ে সরল সহজ প্রীতিকর কথা আর ব্যবহার দিয়ে আশাকে সে জয় করে ছাড়বে।

বড় দমে যায় সাধনা। তার কান দুটি ঝাঁঝা করে। কিন্তু যেচে গল্প করতে এসে আচমকা ফিরেই বা যাওয়া যায় কি করে?

সেদিন আশাকে উপেক্ষা করে ওদের রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে গায়ের জোরে সঞ্জীবের সঙ্গে আলাপ চালিয়েছিল। সেটা ছিল আলাদা ব্যাপার। সেটা ছিল ওদের সংকীর্ণতাকে তুচ্ছ করে গায়ের জোরে নিজের মহৎ ও উদার হওয়া।

আজ নত হয়েই এসেছে আশার কাছে। এসেছে একটা অবাস্তব মিথ্যা উদারতার ঝোঁকে।

মরিয়া হয়ে সে আব্দারের সুরে বলে, আমার চুলটা বেঁধে দাও না।

: আমি পারি নে।

কাল বেড়াতে এসেছিল ঘোষালদের মেজ বৌ, আশা গল্প করতে করতে সযত্নে তার চুল বেঁধে দিয়েছিল।

অগত্যা কি আর করে, সাধনাকে বলতে হয়, আচ্ছা যাই, উনুন ধরাবো।

: আচ্ছা।

প্রাণটা জ্বলে পুড়ে যায় সাধনার। আজকেই ওবেলা কড়াইসুদ্ধ মাছের ঝোল উনানে ঢেলে দেবার সময় তাপ লেগে কিছুক্ষণ তার হাত যেমন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল।

না আপোসের ভরসা নেই, এ অশান্তির হাত থেকে তার রেহাই নেই নিজের মনটা ঝেড়ে মুছে সাফ করে সে যদি যেচে নত হয়ে আপোস করতে যায়, তার অপমানটাই তাতে বেশী হবে, আরও সে ছোটই হয়ে যাবে শুধু, তাছাড় কোন লাভ হবে না।

তাকে ভুল বুঝবে মানুষ, ভাববে যে তার বুঝি কোন মতলব আছে!

এ জগতে বোঝাপড়া নেই। যে যেমন বোঝে সেটাই সে আঁকড়ে থাকবে।

গভীর হতাশা বোধ করে সাধনা। জীবন নয়, এ যেন একটা যন্ত্র। নিজের ধরা-বাঁধা নিয়মে একভাবে পাক খেয়ে চলবে, কারো সাধ্য নেই এতটুকু এদিক ওদিক করে।

হৃদয়মনের কোন মূল্য নেই এই যান্ত্রিক জীবনে।

নইলে হাসিমুখে ছাড়া কথা ছিল না যে রাখাল আর তার মধ্যে, একটু মুখ ভার করলে পাঁচ মিনিটে যে রাখাল তার মুখে হাসি ফুটিয়ে ছাড়ত, সেই রাখাল নিজে আঘাত দিয়ে তাকে আহত করেও অনায়াসে তাকে উপেক্ষা করে চলেছে।

সকাল সকাল রাখালকে বাড়ি ফিরতে দেখে বুঝি আশা জাগে সাধনার।

: কিছু হল নাকি!

: না।

: চাকরিটা কিসের?

: জোচ্চুরি করে জেলে যাবার।

সাধনার মুখ ছোট হয়ে যায়।

: ব্যাপারটা কি হল বল না?

: বলব আবার কি? নিজেরা একটা ফাঁদে পড়েছে, আমায় জবাই করে বাঁচবার মতলব ছিল! নইলে যেচে কেউ চাকরি দিতে চায়?

তার সঙ্গে ভাল করে কথাও কি বলতে চায় না রাখাল? তার আগ্রহ টের পায় না? এমন ভাসা ভাসা জবাব দেবার নইলে আর কি মানে থাকতে পারে!

অনেক কথা বলার ছিল সাধনার। কিন্তু তার সঙ্গে যার কথা বলার সাধ নেই তাকে নিজের কথা গায়ের জোরে যেচে যেচে শুনিয়ে আর লাভ কি? যেচে তাকে চাকরি দিতে চাওয়ার মধ্যে মতলব ছিল রাজীবের, কিন্তু, সে যা ভেবেছিল সে রকম মতলব নয়, অন্য মতলব ছিল. এ প্রমাণ পেয়ে কি একটু নরম হওয়া উচিত ছিল না রাখালের? যে বিশ্রী মতলবের ইঙ্গিত সে আজকেই করেছিল চাকরিটার খোঁজে বেরোবার আগে, সে কথা মনে করে সাধনার কাছে একটু লজ্জা পাওয়াও কি উচিত ছিল না তার?

রেবার বিয়েতে যাওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়েছে বলে কি সম্পর্ক চুকে গিয়েছে তাদের!

এক বিছানায় শুয়ে পাশাপাশি রাত কাটাতে হয়।

কী বিড়ম্বনা জীবনে!

সাধনাকে অমানুষ মনে হয় রাখালের। গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে মনে হয় একটা সচল মাংসপিণ্ডে যেন ক্ষুদ্র স্বার্থপর একটুকরো প্রাণ বসিয়ে জীবন্ত মানুষটা তৈরি হয়েছে। হয় তো কোন দোষ নেই সাধনার। সংসার তাকে গড়ে তুলেছে এমনিভাবে, ছোট করে দিয়েছে তার মনটাকে। হয়তো প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করলে খানিকটা সংশোধন সে করেও নিতে পারত তাকে।

কিন্তু সেজন্য তো বাতিল হয়ে যায় না এ সত্যটা যে, সে অতি নীচুস্তরের ঘৃণ্য মানুষ।

সেই সাধনা, যার হাসি দেখে তার প্রাণ জুড়িয়ে যেত। যার সরল নির্ভর, শান্ত মধুর প্রকৃতি আর কেরানীর সংসারের স্বল্প আয়োজন নিয়েই সংসার করার আনন্দে মশগুল হয়ে থাকার ক্ষমতা দেখে মনে হত, কত সৌভাগ্য তার যে এমন বৌ পেয়েছে।

আজ কি স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়েছে তার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ হৃদয় আর অবুঝ একগুঁয়ে মনের পরিচয়। এ পরিচয় কি করে এতদিন তার কাছে গোপন ছিল ভাবলেও বিস্ময় বোধ হয়!

হয়তো তাই হবে। এ সব ছোট হৃদয় ছোট মনের মানুষ অল্প পেয়েই খুশীতে গদগদ হয়ে যায়, নিজেকে ধন্য মনে করে। তখন হয়ে থাকে একেবারে অন্য রকম মানুষ!

আবার সেটুকুর অভাব ঘটলেই একেবারে বিগড়ে যায় এ সব মানুষ। একেবারে বিপরীত রূপটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জীবন থালি হয়ে গেল, শরীরে খালি হয়ে এল জীবনীশক্তি, সোনার হারের অভাবে খালি গলার শোকেই সে আকুল। রেবার বিয়েতে যাওয়ার ছলে সে গড়িয়ে নিতে চায় নতুন হার। ক'দিন জগৎ সংসার তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে, ভাতের হাঁড়ির মত হয়ে আছে তার মুখ, অস্থির উন্মনা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে তার কথাবার্তা চালচলন।

তার নিজের বা তার ছেলের বা স্বামীর একটা অসুখ হলে চিকিৎসা হবে না জানে, অথচ নতুন হার গলায় দিয়ে সেজেগুজে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে কনেকে নিজের কানপাশা উপহার দিতে পারবে না বলে, দশজন আত্মীয়-

বন্ধুর কাছে মিথ্যা সম্মান মিথ্যা সমাদর পাবে না বলে, পাগল হয়ে যেতে বসেছে !

তাকে আর তার রকম সকম দেখে কে না বুঝবে যে এটা শুধু তার একটা জোরালো সাধ নয়, সাধটা না মিটলে সে শুধু গভীর মনোবেদনা পাবে না—তার জীবনের চরম কামনায় দাঁড়িয়ে গেছে, এ কামনা না মিটলে হয়তো সে সত্যই পাগল হয়ে যাবে।

ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয় রাখালের। নিরুপায় বিদ্বেষে নিশ্বাস তার আটকে আসতে চায়।

নতুন হার তাকে এনে দিতেই হবে। নিয়েও যেতে হবে রেবার বিয়েতে। তা ছাড়া উপায় নেই। এই সামান্য ব্যাপারে মাথা বিগড়ে দেওয়া যেতে পারে না সাধনার। যত প্রতিক্রিয়া হবে সব ভোগ করতে হবে তো তাকেই।

ছেলেটার কথাও তো ভাবতে হবে।

রাখালকে সাধনার পাষণ্ড মনে হয়। রক্তমাংসের মানুষ নয়, অস্বাভাবিক অমানুষিক কিছু দিয়ে গড়া। চোখ ফেটে তার জল আসতে চায়। যে রাখাল এত বড় বড় কথা বলত, এত ছোট তার মন? পাশাপাশি শুয়েও সে ভুলতে পারে না তাদের কলহ হয়েছে? পাশাপাশি শুয়ে নীরব উপেক্ষায় তাকে কাবু করে কলহে জয়ী হতে চায়? এত সে নীচ?

সাধনার সহ্য হয় না। সে উঠে গিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে।

রাখাল বলে, কি হল?

সাধনা বলে, কি আবার হবে।

রাখাল একটু চুপ করে থেকে বলে, কাল তোমার হারটা বদলে আনব। এতই যখন ইচ্ছা তোমার, রেবার বিয়েতে নিয়ে যাব।

উঠে বসে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে সাধনা বলে, দেখ, আমিও একটা মানুষ! ওরকম কোরো না তুমি আমার সঙ্গে। একদিন বাড়ি ফিরে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

রাখাল চুপ করে থাকে। সেটা আর আশ্চর্য কি! যে মতিগতি সাধনার, যে রকম অবুঝ সে অজ্ঞান মানুষ, তারই জন্য সারাদিন বাইরে প্রাণপাত করে ঘরে ফিরে তাকে দেখতে না পাওয়া আশ্চর্য কিছুই নয়।

রাখাল চুপ করে শুয়ে চোখ বুজে ভাবে।

কিন্তু এতদূর তো গড়াল গলায় একটা হার আর বিয়ে-বাড়ি যেতে চাওয়ার

উপলক্ষে, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে ? আর কি উপলক্ষ আসবে না ? দিন দিন আরও বিগড়ে যেতে থাকবে না সাধনার মন ?

আসল কথা, এ দারিদ্র্য সইবার শক্তি নেই সাধনার। আর কিছুদিন এভাবে চললে সে ভেঙে পড়বেই।

সাধনা ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু রাখালের ঘুম আসে না। জেগে থেকে চোখ বুজে সে ক্রমে ক্রমে সাধনার অপমৃত্যু ঘটতে দেখতে পায়।

শুধু সাধনা মরছে না, তাকেও ঘায়েল করে দিয়ে যাচ্ছে।

৭

ভাঙন ধরলে এমনি তির্যকগতি পায় মধ্যবিত্তের বুদ্ধি বিবেচনা। ধরাবাঁধা পথ ছেড়ে দিতে হলেই শুরু হয় তার এঁকেবেঁকে পাক দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে চলা। যতক্ষণ না নতুন পথ সুনিশ্চিত হয়ে যায়, সোজা চলার পথ সে খুঁজে পায় না। মধ্যবিত্তের বিপ্লব তাই আসে অতি-বিপ্লব আর প্রতি-বিপ্লবের মারফতে, যতক্ষণ না প্রকৃত বিপ্লব রূপ নেয়।

সকালে বিশুকে পড়াতে গিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেই রাখাল বিশুর মাকে দেখতে পায়। গরদের শাড়ি পরে সদ্য স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সর্বাঙ্গে তার ঠিক আগের মতই গয়নার অভাব।

: কখন ফিরলেন ?

বিশুর মা দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বলে, কাইল ফিরছি বাবা। ওইদিন ফিরুম ভাবছিলাম, কুটুম ছাড়ল না। শুকনা ক্যান্ দেখায় তোমারে, খারাপ নাকি শরীর ?

: না, শরীর ভালই আছে।

পড়াতে পড়াতে বার বার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, খেই হারিয়ে ফেলে। বিশুর মত ভোঁতা ছেলেও টের পায় আজ কিছু হয়েছে তার মাস্টারমশায়ের।

নির্মলা আজও তাকে প্রসাদ দিয়ে যায়। কালীঘাটে পূজা দেওয়ার প্রসাদ, বিশুর মা'র সঙ্গে এসেছে।

নির্মলা বলে, এই ঘরে তো পড়াইতে পারবেন না আইজ। ঠাকুরের পূজা শুরু হইবো। বড় ঘরে বসেন গিয়া।

আজ পূর্ণিমা খেয়াল ছিল না রাখালের। প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে সকাল সন্ধ্যায় বিশেষভাবে ঠাকুরের পূজা হয়।

বিশুর মা'র শোয়ার ঘরখানাই এ বাড়ির সেরা ঘর। নির্মলা সেই ঘরের মেঝেতে দামী চিকণ পাটি বিছিয়ে দেয়। এটি শীতল-পাটিও বটে। বেত অথবা অন্য কিসের ছাল দিয়ে এ পাটি তৈরি হয় রাখাল জানে না। ছাল বাকল দিয়ে যে এমন মসৃণ আর পাতলা জিনিস তৈরি হয় এটাও তার আগে জানা ছিল না। পাকিয়ে রাখলে বাঁশের চেয়ে মোটা হয় না, বিছিয়ে দিলে এতখানি ছড়িয়ে যায় যে, চার পাঁচজন অনায়াসে শুতে পারে।

একদিকের দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড ভারি খাট, একেবারে নতুন। দেশ থেকে খাট আনা যায় নি, কিন্তু খাটে না শুয়ে বোধ হয় ঘুম আসে না বিশুর মা আর সতীশের। তাই নতুন খাট কেনা হয়েছে। অন্যদিকের দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলি ছোট বড় ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেশ—সব রঙীন কাপড়ের বোরখায় ঢাকা। দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটে তোলা কাঁচা ছবি আর কাঁচা হরফের বাণী—রাধা কৃষ্ণের কোন অঙ্গ সরু কোন অঙ্গ মোটা, 'পতি পরম গুরু' আপন গুরুত্বে আপনি এলিয়ে পড়েছে। খানিক পরেই শঙ্খ ঘণ্টা বেজে ওঠে। পূজা শুরু হয়। বিশুর মা একবার ঘরে এসে বাক্স খুলে পুরনো দিনের দুটি রূপোর টাকা নিয়ে যায়।

পুরুতকে আজও সে পুরনো দিনের জমানো রূপার টাকা দিয়ে দক্ষিণা দেয়। এ টাকা ফুরিয়ে গেলে বাজে ধাতুর টাকা বা ছাপানো নোটে দক্ষিণা দিতে হবে না জানি কত মর্মাহত হবে বিশুর মা।

বিশুকেও যেতে হয় ঠাকুর-ঘরে। বিশুর মা নিজে এসে ছেলেকে ডেকে নিয়ে যায়।

আধ ঘণ্টা পরে বিশু ফিরে আসামাত্র রাখাল উঠে দাঁড়িয়ে বলে,: আজ আর সময় নেই। আটটা বেজে গেছে। আমি যাচ্ছি।

মনে হয় সে ভীষণ চটে গেছে ঠাকুর-পূজার নামে তার ছাত্রের পড়াশুনার গাফিলতিতে।

বিশু ভয়ে ভয়ে বলে, আমারে ডাইকা নিয়া গেলো—

: আচ্ছা, আচ্ছা।

তাড়াতাড়ি সে সিঁড়ি দিয়ে নামে। যেন একরকম পালিয়ে যাবার মত অতি ব্যস্ততার সঙ্গে সে চলে যেতে চায় এবাড়ি ছেড়ে।

নির্মলা তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বলে, শোনেন, শোনেন, প্রসাদ নিয়া যান।

সিঁড়ির নীচে একতলা এখন জনশূন্য। বুড়ী রাজু শুধু একমনে বাসন মেজে চলেছে কলতলায়।

নির্মলা বলে, পুরুষ মানুষের এত তাড়া? কই যাইবেন?

: আরেকটি ছেলে পড়াতে যাব।

: ইস্। একেবারে বিশ্রাম পান না। ক্যান এত খাইট্যা মরেন আপনে? কার লেইগা খাটেন? আমার সয় না আপনার কষ্ট।

এ মিথ্যা আবেগ নয়। নির্মলার চোখে মুখে ফুটে পড়ে তার দরদ। ব্যাকুল দুটি চোখ সে পেতে রাখে রাখালের মুখে। তবু, ভয়ঙ্কর এক বিপদের মতই তাকে মনে হয় রাখালের।

নির্মলা তার হাত ধরে। বলে, ঘরে আইসা দুইদণ্ড বসেন। আসেন দুইটা কথা কই।

: আজ নয়, আরেকদিন।

কিন্তু এ সুযোগ তো আসবে আবার একমাস পরে, আরেকটা পূর্ণিমা এলে।

: ডরান নাকি?

রাখাল মাথা নাড়ে।—দরকার আছে।

: তবে ওই বেলা আইবেন? সন্ধ্যাকালে? দুই ঘণ্টা পূজা হইব।

: যদি পারি আসব।

রাখাল আর দাঁড়ায় না। বাইরে গিয়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডেলে পা ঢুকিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে।

ক্ষুব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে নির্মলা তার পালিয়ে যাওয়া চেয়ে দেখে।

সোনা যে ওজনে এত ভারি রাখালের জানা ছিল না। বিশুর মা'র সেকেলে ধরনের গয়নাগুলিও বেশ পরিপুষ্ট। কোঁচায় বাঁধা ক'খানা মাত্র গয়নার ওজনটা রাখাল প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করে।

ভোলার মা আজও ডিম বেচতে বেরিয়েছে, প্যাসেজে ডিমের টুকরি সামনে রেখে সে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল আশার জন্য। আশা হাত ধুয়ে এসে দর করে পছন্দ করে ডিম কিনবে।

ভোলার মা'ই রাখালকে সাবধান করে দেয়, ব্যাগটা পইড়া যাইবো, ঠিক-ভাবে থোন।

টাকা নেই, কিন্তু পুরনো শখের মনিব্যাগটা আছে। পড়ি পড়ি অবস্থা থেকে ব্যাগটা পকেটের ভিতর ঠেলে দিয়ে রাখাল ঘরে চলে যায়।

আজও সোজা দু'নম্বর ছাত্রটিকে পড়াতে চলে যাবার বদলে তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে নানা কথা মনে হয় সাধনার। আজও কি রাখাল প্রত্যাশা করেছে যে সাধনা নিজে থেকে মুখ ফুটে তাকে হারের কথা বলবে?

সামনা সামনি এ টালবাহনা অসহ্য মনে হওয়ায় সাধনা ঘর থেকে বেরিয়ে তার উনানের পাশে চলে যায়। তাতে সুবিধাই হয় রাখালের। কোঁচা থেকে খুলে গয়না ক'টা একটুকরো ন্যাকড়ায় বেঁধে একখানা আস্ত খবরের কাগজে পুঁটলি করে নেবার সুযোগ পায়।

চাকরির খবরের আশায় আজও সে প্রতি রবিবার দুখানা কাগজ কেনে, মাঝে মাঝে দরখাস্তও পাঠায়।

বিছানায় স্থির হয়ে বসে মিনিটখানেক সে ভাবে। নিজের ভিতরটা তার এত বেশী ধীর শান্ত মনে হয় যে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজের মুখ দেখে প্রায় চমকে ওঠে।

গামছায় মুখ মুছে সে মৃদুস্বরে সাধনাকে ডাকে। সাধনা ঘরে এলে বলে, তোমার হারটা দাও।

: কেন?

: আজ একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।

: তোমার কিছু করতে হবে না।

: করতে হবে না?

: না, যা করবার আমিই করব।

একটু যদি ভাববার সময় পেত সাধনা। আচমকা ডেকে বিনাভূমিকায় হারের কথা না তুলে তার প্রস্তাবের জবাব দেবার জন্য কয়েক মিনিট প্রস্তুত হবার সময় যদি রাখাল তাকে দিত! এমন অস্পষ্টভাবে সোজাসুজি রাখালকে বাতিল করে দেওয়ার বদলে এই সুযোগে সে নিশ্চয় রাখালকে জানিয়ে দিত যে হারের ব্যবস্থা সে ইতিমধ্যেই অর্ধেকটা করে ফেলেছে।

রাখাল চলে যাবার পর সাধনা এই কথাই ভাবে আর আপসোস করে। রাখাল নিজে থেকে নরম হয়ে তার কাছে হার মানতে চাইল আর সে কিনা সংঘাতের জের টেনে আরও উগ্র, আরও কঠিন হয়ে উঠল।

রাস্তায় নেমে রাখাল ভাবে, এই তো স্পষ্ট লক্ষণ বিকারের। হিসাব তার ভুল হয় নি, মাথা সাধনার বিগড়ে যেতে বসেছে। কঠিন রোগের চিকিৎসার মতই এই কঠিন দারিদ্র্যের চাপ থেকে সাধনাকে একটু মুক্তি দেওয়া আজ একান্ত ভাবে জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে দুর্দশা হয়ত তার একদিন ঘুচবে, সাধনাকে সুখে

রাখার ক্ষমতা হবে, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হবে না তখন। আজকের বিকৃতিকে সারাজীবনের বিকারের বোঝা করে নিয়ে একটা অসহ্য বোঝার মতই হয়ে থাকবে সাধনা।

হাতের কাগজে মোড়া পুঁটুলিটার ওজন থেকে এতক্ষণে যেন বুকে বল পায় রাখাল। যাই সে করে থাক, সাধনাকে বাঁচাবার জন্য করেছে। জীবনের অনেকটাই এখনো বাকী, তার উপায় কি!

পোদ্দারের দোকানে গয়নাটা বিক্রি করে রাখাল একুশ শ' সাতাম টাকা পায়। কত হাজার টাকার গয়নাই যে আছে বিশুর মা'র! সমস্ত সোনার কত সামান্য একটু অংশ সে এনেছে। পোদ্দার কয়েক শ' টাকা ঠকিয়েছে ধরে নিলেও তারই দাম পাওয়া গেছে দু'হাজারের বেশী।

তাকে আরো বেশী ঠকাবার সাধ ছিল পোদ্দারের।

বুক-ভরা লোম আর মুখ-ভরা মেছেতার দাগ পোদ্দারটির। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে কষ্টি পাথরে ঘষে যাচাই করতে করতে সে যখন মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে তার দিকে তাকায়, বলতে থাকে যে অনেক ভেজাল আর ময়লা মেশানো আছে গয়নাগুলির সোনার অঙ্গে, গিনির চেয়েও বিশ টাকার মত কম হবে এ সোনার দর, ব্যাপারটা রাখাল বুঝতে পারে।

বুঝতে পারে যে তার ভাবসাব দেখেই পোদ্দার অনুমান করে নিয়েছে পিছনে গোলমাল আছে তার এই গয়না বেচতে আসার।

এক মুহূর্তের জন্য অবসন্ন বোধ করে রাখাল।

এক মুহূর্তের জন্যই। এক মুহূর্তে সে যেন নিজের সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র মনে মনে আউড়ে নেয়। না, সে চোর নয়। সে চুরি করে নি।

এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

মুখ গম্ভীর করে কড়া সুরে সে বলে, তবে থাক, অন্য জায়গা দেখি। বিশ টাকা কম! একি তামাসা পেয়েছ? আমার ঘরের জিনিস, আমি জানি না সোনা কেমন?

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়, রেগে বলে, থাক্ না মশায়, অত ঘষবেন না। আমার বাড়িতে বিপদ, নষ্ট করবার সময় আমার নেই।

পোদ্দার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে যায়।

সবিনয়ে বলে, বসেন না বাবু, বসেন। ভুল সবারি হয়। ওহে সুবল, তুমি একবার গ্যাখো দিকিন—

তারপর একেবারে বিশ টাকা নয়, গিনি সোনার বাজার দরের চেয়ে চার

টাকা কম ধরা হয় তার সোনার দাম। এ বাবদে ও-বাবদে অবশ্য আরও কিছু বাদ যায়।

তা যাক। গলা কাটার অধিকার নিয়ে সকলে সব ব্যবসা করবে এটাই প্রথা, এটাই প্রকাশ্য স্বীকৃত নিয়ম। একেও গলা কাটতে না দিলে চলবে কেন।

বাড়ি ফেরবার পথে সেই দোকানে বসে ঘন্টুর দেওয়া এক কাপ চা খায়। বুকের কাঁপুনি একটু সামলে নেবার জন্য নয়, বুকে তার এতটুকু কাঁপন ধরে নি। শক্ত পাথর হয়ে গেছে হৃদয়টা। বিবেকের দংশনে কাতর হবার বিলাসিতা কি পোষায় তার মত লোকের?

ভয়? না, এতটুকু ভয়ও তার নেই। ভয় পাবার কোন প্রয়োজনও সে অনুভব করে না। আবার কোন বিশেষ উপলক্ষে গায় গয়না চাপাবার দরকার হলে তবেই হয়তো বিশুর মা টের পাবে তার গয়না কয়েকখানা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোন কারণে আজকেই যদি টের পায়, যদি তাকে সন্দেহও করা হয়, কিছুই তার করতে পারবে না ওরা।

ঘরেই তাদের অনেক লোক, অনেক বাজে লোক। তাদের সকলকে বাদ দিয়ে তাকে জোর করে সন্দেহ করার সাহস পর্যন্ত ওদের হবে না।

ওসব চিন্তা নয়। শান্ত হয়ে বসে একটু তার ভাবা দরকার টাকাগুলি কিভাবে ব্যবহার করবে।

সব টাকাই কি কাজে লাগাবে এই অসহ্য দারিদ্র্য সাধনার পক্ষে একটু সহনীয় করে আনতে, যতদিন পারা যায়? অথবা খানিকটা এই কাজে লাগিয়ে বাকীটা লাগাবে কোন স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টায়?

সে চোর নয়। এ জগতে কারো কোন ক্ষতি না করে একজনের একস্তূপ অকেজো এবং অকারণ সোনার একটু অংশ না বলে নেবার সুযোগ আরও দু'-একবার পাওয়া যাবে, এ চিন্তাটাই হাস্যকর। এ টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার সে নিরুপায় হয়ে পড়বে একান্ত ভাবেই।

খুব সাবধানে চারিদিক হিসাব করে সব কিছু বিচার করে এ টাকা কাজে লাগাতে হবে।

শুধু সাময়িকভাবে নয়, সাধনাকে বাঁচাবার একটা স্থায়ী ব্যবস্থাও যাতে সম্ভব হয়।

টাকাগুলি রাখবে কোথায়? বাড়িতেই রাখবে। না, তার কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই। টাকাগুলি ধরা পড়লে অবশ্য সত্যই সেটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে যে

সে-ই গয়না নিয়েছে, বিপদেও সে পড়বে। কিন্তু সে চোর নয়, এ বিপদকে ভয় করলে তার চলবে না। টাকাটা সাবধানে লুকিয়ে রাখার ফন্দি ফিকির আঁটতে গেলেই সে মনে প্রাণে এবং কার্যতঃ চোর হয়ে যাবে।

সে চোর নয়। সে চুরি করে নি! কেউ তার কিছু করবে না, করতে পারবে না। এই বিশ্বাস তার একমাত্র অবলম্বন। ভয়ের তাড়নায়, বিপদের কল্পনায় আত্মরক্ষার অস্বাভাবিক উপায় খুঁজে এই বিশ্বাসের গোড়া আলগা করে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তার।

শেষ পর্যন্ত জগৎ যদি তাকে চোর বলে জানে, তাকে চোরের শাস্তি দেয়, এই বিশ্বাসের জোরেই মাথা উঁচু করে পরম অবজ্ঞার সঙ্গে সেই শাস্তি সে গ্রহণ করতে পারবে।

ঘন্টু বলে, একটা চপ খাবেন বাবু? কাটলেট?

একুশ শ' সাতান্ন টাকা সাড়ে এগার আনা পয়সা সঙ্গে আছে, তবু রাখাল মাথা নেড়ে বলে, না কিছু খাব না।

চপ কাটলেট খাবার পয়সা কোথায়? তার নিজের সাড়ে এগার আনা থেকে এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে, চপ কাটলেট খেলে তার চলবে কেন?

তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এ টাকা সেজন্য নয়।

বাড়ি ফিরতেই সামনে পড়ে সঞ্জীব।

এই নিরীহ গোবেচারী মানুষটা বাড়িতে তাকে এড়িয়ে চলে বলে কিছু মনে করে না রাখাল। কেন এড়িয়ে চলে জেনে বরং তার একটু অনুকম্পা-মেশানো করুণাই জাগে। আশার ভয়ে সে বাড়িতে তার সঙ্গে মেশে না, সেজন্যে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে বলে রাস্তায় বা দোকানে দেখা হলে যেচে নানা কথা আলাপ করে!

: আপিস যান নি?

মুখ কাঁচুমাচু করে সঞ্জীব বলে, না, আজকে যাই নি। শরীরটা ভাল নেই—

মরার মত একটু সে হাসবার চেষ্টা করে। ভয়ে ভয়ে ঠিক চোরের মতই এদিক ওদিক চেয়ে ঘরে চলে যায়।

বোধ হয় নিষিদ্ধ মানুষ তার সঙ্গে কথা বলার জন্য—

আশাকে তার এই পিটানি-খাওয়া শিশুর মত ভয় করে চলা উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া মনে হয়। মনে হয় এ বুঝি শুধু নিরীহ মানুষের বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্ন নয়, আরও

কিছু আছে এর পিছনে, আশার কাছে সে বোধ হয় গুরুতর কোন অপরাধে অপরাধী।

ঘরে গিয়ে কাগজে-মোড়া নোটের বাণ্ডিলটা তার সুটকেশে কাপড়ের তলায় রেখে রাখাল সাধনার কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে আসে। তাকে বুকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে চিন্তাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, বাইরে গোলমাল শুনে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায়।

এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে মনকে শক্ত করে দৃঢ়পদে সে বাইরে আসে।

না, তার খোঁজে তার কাছে কেউ আসে নি।

আদালত থেকে লোক এসেছে ডিগ্রি জারি করে সঞ্জীবের অস্থাবর মালপত্র ক্রোক করতে।

আদালতের লোকের সঙ্গে পাঞ্জাবি গায়ে মোটাসোটা মাঝবয়সী যে লোকটি এসেছিল, সে সঞ্জীবকে বলে, বেশ লোক তো তুমি, বাঃ? হাতে পায়ে ধরে এক ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে লুকিয়ে আছো? সেই থেকে আমরা গাছতলায় ঠায় বসে আছি তোমার জন্য!

সঞ্জীব কথা কয় না।

লোকটি আবার বলে, ভেবেছিলে আমরা মতলব বুঝি নি তোমার? এক ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়ে মালপত্র সরিয়ে ফেলবে। গাছতলায় বসে নজর রাখব ভাবতে পার নি, না?

মাঝে মাঝে সকালের দিকে লোকটিকে আসতে দেখা গেছে সঞ্জীবের কাছে। এসে কড়া নাড়াতেই সঞ্জীব তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে যেত। আজ বোঝা যায়, সে আসত পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দিতে।

রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আশা হাঁ করে বড় বড় চোখে চেয়ে ছিল, সঞ্জীব হঠাৎ ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলতে সে ছুটে আসে।

: কি হয়েছে? কি হয়েছে? এসব কি ব্যাপার?

রাখাল এগিয়ে এসে সোজাসুজি ধমক দেয়ে সঞ্জীবকে, বলে, কাঁদছেন কেন কচি ছেলের মত? ঘরে যান, ঘরে গিয়ে দুজনে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলুন, পরামর্শ করুন।

অন্য অবস্থায় তার স্বামীকে রাখাল এভাবে ধমকালে আশা বোধ হয় তার গালে একটা চাপড় বসিয়ে দিত! আজ সে নীরবে তার কথাই মেনে নেয়।

সোজা ঘরে চলে যায়। গিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ে তার হালকা খাটের পরিষ্কার ধবধবে বিছানায়। সঞ্জীবও ঘরে যায় ধীরে ধীরে।

রাখাল বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

পাওনাদার লোকটিকে বলে, দশ মিনিট সময় দিন বেচারাদের। বুঝতে পারছেন তো, ভদ্রলোক বাড়িতে কিছু জানান নি? এবার হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সাধনা এসে দাঁড়িয়েছিল রোয়াকে। তার মুখ দেখে মনে হয় সে যেন এইমাত্র আকাশ থেকে তার অজানা অচেনা এই অদ্ভুত পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে।

আশাদের ঘরের ভিতর থেকে প্রথমে কোন কথাই শোনা যায় না বাইরে। একটু পরেই গলা চড়ে যায় আশার। তার প্রতি কথা স্পষ্ট কানে আসে।

: আমায় না জানিয়ে তুমি এত টাকা দেনা করেছ! দেনা করে রেডিও কিনেছ, কাপড় গয়না কিনেছ আমার জন্য। এ দুর্বুদ্ধি কে দিল তোমাকে?

: কি করব? মাইনেতে কুলোয় না—

: সে কথা বলতে পারতে না আমায়?

: বলি নি? কতবার বলেছি, টাকায় কুলোচ্ছে না, খরচা না কমালে চলবে না—

: ওভাবে তো সবাই বলে। এদিকে বলেছ খরচ কুলোয় না, ওদিকে শখ করে রেডিও কিনে আনছ। কি করে আমি বুঝব তোমার সত্যি কুলোয় না?

: আমি—

: চুপ কর। চুপ কর তুমি। এখন কি উপায় করা যায় ভাবতে দাও আমায়।

তার রান্নাঘর থেকে পোড়া গন্ধ বার হয়। সাধনা তাড়াতাড়ি গিয়ে কড়াইটা উনান থেকে নামিয়ে রেখে আসে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর অন্ধকার থমথমে মুখ নিয়ে আশা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। পাড়ার যে দু'চারজন লোক ব্যাপার জানতে এসেছিল এবং এতক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকে একবার চেয়ে রাখালকে সে জিজ্ঞাসা করে, কাছাকাছি দোকান আছে রাখালবাবু, গয়না কেনে?

: বাজারের দিকে আছে।

: আপনি একটু সঙ্গে যাবেন ওনার? আমার কটা গয়না বেচে টাকা নিয়ে আসবেন?

রাখাল বলে, ব্যাঙ্কে একাউন্ট নেই আপনাদের?

সঞ্জীব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, মৃদু স্বরে সে বলে, আছে, টাকা নেই।

রাখাল বলে, আমি বলি কি, গয়না না বেচে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে লোনের ব্যবস্থা করুন। গয়না বেচলেই লোকসান।

আশা দারুণ হতাশার সুরে বলে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তো পাব কম? ইনি যে আরও কয়েক জায়গায় দেনা করে বসেছেন। একেবারে বেচে না দিলে কি সব শোধ করা যাবে?

: তাদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নেবেন। একেবারে কিছু দিয়ে তারপর মাসে মাসে কিছু কিছু শোধ দেবেন।

আশা নিশ্বাস ফেলে বলে, তাই ভাল। আপনি একটু সঙ্গে যাবেন তো? ওঁকে দিয়ে আমার ভরসা হয় না।

আশা অনায়াসে একথা বলে এবং কথাটা কারো কানে বাজে না,—সাধনারও নয়। কে না জানে যে আশার ভয়েই সঞ্জীব রাখালকে বাড়িতে এড়িয়ে চলে কিন্তু মানুষকে এড়িয়ে চলার মত শক্ত নয় বলে পথে ঘাটে দোকানে দেখা হলে রাখালের সঙ্গেই সে গায়ে পড়ে যেচে আলাপ করে। সেই আশা এখন বুদ্ধি-পরামর্শ চাইছে রাখালের কাছে, ঘোষণা করেছে যে, রাখাল ছাড়া সঞ্জীবকে দিয়ে তার ভরসা নেই। এসব কথা মনে পড়ে কিন্তু তুচ্ছ হয়ে যায়। এখন সে বিপদে পড়েছে, এখন তো বিচারের সময় নয় আশার।

আশার এই আকস্মিক বিপদ সামলে দেবার দায়িত্ব রাখাল আগেই নিয়েছে —যখন সে সঞ্জীবকে ধমক দিয়ে আশার সঙ্গে ঘরের মধ্যে পরামর্শ করতে পাঠিয়েছিল।

সে ছাড়া কার ভরসা করবে আশা?

সঞ্জীব পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে। রাখাল কথা বলে পাওনাদার লোকটির সঙ্গে। গায়ের গহনা বাক্সের গহনা পুটলি করে এনে আশা হাতে তুলে দেয় রাখালের।

হাঙ্গামা সেরে রাখাল ফেরা মাত্র ঘরে গিয়ে সাধনা বলে, এটা কি রকম ব্যাপার হল? এমন ছেলেমানুষ ভদ্রলোক।

: ছেলেমানুষ, তবে খুব বেশী আর কি এমন ছেলেমানুষ? শখের জন্য খেয়ালের জন্য যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেয় না লোকে? এ তো শুধু স্ত্রীকে খুশী রাখার জন্ত কিছু দেনা করেছে। ভেবেছিল সামলে নেবে, জের টেনে চলতে চলতে বেসামাল হয়ে পড়েছে।

: সব গোপন রেখেছিল স্ত্রীর কাছে।

: গোপন না রাখলে কি খুশী রাখা যেত স্ত্রীকে ? স্বামী দেনা করে তাকে আরামে রেখেছে জানলে কোন স্ত্রী খুশী হয় ? এতটা গড়াবে এটা তো ভাবে নি সঞ্জীব। তারপর বেকায়দায় পড়ে দিবারাত্রি দুশ্চিন্তা করতে করতে একটু দিশেহারা হয়ে গেছে। নইলে মাল ক্রোক করতে এসেছে, গাছতলায় তাদের বসিয়ে রেখে এসেও মুখ ফুটে স্ত্রীকে বলতে পারে না ব্যাপারটা, চুপ করে বসে থাকে ?

: তাই বটে। পুরুষ মানুষ কি ভাবে কেঁদে ফেলল।

: পুরুষ মানুষের কি কাঁদা বারণ ?—রাখাল হাসে, মাঝে মাঝে আমিও ভাবতাম, চাকরির পয়সায় মানুষটা এমন চাল বজায় রেখেছে কি করে। আজকালকার দিনে দেড়শো দুশো টাকায় দুটি মানুষেরও ভালমত খাওয়া পরা থাকা চলে না।

রাখালের ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল সাধনা, লক্ষ্য করে অশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কোন বোঝাপড়া হয় নি তাদের, কোন কথাই হয় নি। এমন সহজ-ভাবে রাখাল কথা বলছে, হাসছে, যেন তাদের মধ্যে কোন বিবাদ বা বিভেদ কোনদিন ছিল না, এখনও নেই।

আশাদের এই খাপছাড়া ব্যাপারটা ঘটায় রাখাল কি এখনকার মত একে-বারে ভুলে গেছে সব ?

সে নিজেও যে সহজভাবেই কথা বলছে রাখালের সঙ্গে এটা খেয়াল হয় না সাধনার।

খেয়ে উঠে রাখাল বলে, কই তোমার হারটা দাও।

সাধনা খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে।

: তামাসা করছ না তো ? এত কাণ্ডের পর তুমি যেচে—

এত কাণ্ডের পর মানে ? আমি কি কখনো বলেছি তোমার ভাঙা হারটা বদলে দেব না ?

: মুখে না বললেও—

: তুমি তাই ভেবে নিয়েছ ?

সাধনা একটু চুপ করে থেকে বলে, হার আমি বেচে দিয়েছি।

কিভাবে কার কাছে বেচে দিয়েছে তাও সে খুলে বলে। একটু বে-পরোয়া বেশ-করেছি'র ভঙ্গিতেই বলে।

: আমায় একবার জিজ্ঞাসাও করলে না ?

: কেন করব ? তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে হারের কোন ব্যবস্থা করবে না—

: কবে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ?

: নইলে চেয়ে তো নিতে হারটা ?

: তাই তো চাইলাম আজ। আজ আমার সময় আছে, সুবিধা আছে।

সাধনা ঠোঁট কামড়ায়। এই কি মানে তবে হঠাৎ তার সঙ্গে রাখালের সহজভাবে হাসিমুখে কথা বলার ? সমস্ত মনোমালিন্যের সমস্ত ভুল বোঝার দায়িত্ব সে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় ?

রাখাল বলে, যাকগে। টাকাটা আছে তো ? না, খরচ করে ফেলেছ ?

: টাকা আছে। আমি ভাবছিলাম নিজে গিয়ে কিনে আনব।

: সে তো আমার ওপর রাগ করে ভাবছিলে।

: রাগ হবার কারণ থাকলেই মানুষ রাগ করে।

রাখাল একথা এড়িয়ে গিয়ে বলে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে শুনে পছন্দ করে আনলে কিন্তু মন্দ হয় না।

সাধনা বলে, যেমন হোক, তুমি আনলেই হবে। মিছিমিছি দুজনের ট্রামবাসের পয়সা খরচ।

রাখাল আশ্চর্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে দোকানে গয়না কিনতে গেলে মিছিমিছি একজনের ট্রামবাসের পয়সা বেশী লাগবে, এই হিসাব করছে সাধনা!

সাধনা তাকে টাকা বার করে দেয়। বলে, বলে দিচ্ছি শোন। ওটা ছিল তিন ভরি সাত আনি—যেমন প্যাটার্ন হোক তুমি আড়াই ভরির মত আনবে। বাকী টাকা আমায় ফিরিয়ে দেবে।

: কি করবে টাকা দিয়ে ?

: বিপদ আপদের জন্য তুলে রাখব ?

রাখাল বেরিয়ে যাবার পর বহুদিন পরে আশা আজ তার ঘরে আসে।

তাকে দেখে বোঝা যায় না এই মাত্র তার গয়নাগুলি সে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়েছে। গায়ে তার সামান্য গয়নাই থাকত, গা থেকে তাও সে খুলে দিয়েছে।

আশার দুঃখ হয়েছে না রাগ হয়েছে বুঝবার উপায় নেই। আচমকা সে যেন পড়ে গেছে এক বিষম ধাঁধায়। ব্যাপারটা ভালমত বুঝে উঠতে পারছে না।

বসে হঠাৎ-ঘুমভাঙা মানুষের মত মুখ করে বলে, এমন অদ্ভুত মানুষও দেখেছো ভাই ?

: তোমাকে যেমন ভালবাসেন তেমনি ভয় করেন কিনা।

: বাব্বা, জন্মে জন্মে আমার এমন ভালবাসায় কাজ নেই। ভালবাসার চোটে আমার গয়নাগুলি যেতে বসেছে।

একটু থেমে আশা বলে, তোমাদের দেখে মনে হত, বাঃ, আমি তো বেশ সুখেই আছি। বাসরে, এই নাকি সেই সুখ। চাদ্দিকে দেনা করে করে আমায় একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। রেডিও-ফ্রেডিও সব বেচে দিয়ে একেবারে আদ্দেক করে ফেলতে হবে খরচ। মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে আমার। প্রথম থেকে বললেই হত চাল কমিয়ে দিতে হবে। গরীব মানুষ, গরীবের মতই থাকতাম।

সাধনার গলার দিকে চেয়ে সহজ সহানুভূতির সঙ্গে আশা জিজ্ঞাসা করে, গলারটাও বেচতে হয়েছে নাকি ?

: না। ভেঙে গেছে, বদলাতে দিয়েছি।

বলে সে হাসে।

: বেচতে হয় তো হবে দু'দিন বাদে।

রাখালের এনে দেওয়া নতুন হার পরে সাধনা রেবার বিয়েতে যাবে। যাবে কি যাবে না দোলায় মন তার দোল খায়। একবার ভাবে, কেন যাব না ? আবার ভাবে, কি লাভ হবে গিয়ে ?

রাখাল বলেছে, দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে রওনা হবার কথা। তাকে বিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সে নিজের কাজে যাবে, সন্ধ্যার পর ফিরে আসবে বিয়ে বাড়িতে।

রেবাকে কানপাশা দিতে হবে না সাধনার। কোথা থেকে নাকি কিছু বাড়তি টাকা পাবে রাখাল, রেবার জন্য একটা দুল সে কিনে নিয়ে যাবে।

বাসন্তীকে নতুন হারটা একবার দেখানো উচিত ভেবে সাধনা সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার বদলে গলায় লটকে দেয়। ও-বাড়িতে গিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে চোখে পলক পড়ে না সাধনার। গায়ে তার গয়নার চিহ্নও যেন নেই। এত গয়না সে সর্বদা গায়ে চাপিয়ে রাখত যে গলার একটা হার আর হাতে শুধু দুগাছা করে চুড়ি থাকায় তাকে যেন উলঙ্গিনী মনে হচ্ছে।

সাধনা বলে, এ কি ব্যাপার ?

বাসন্তী বলে, আর বলো কেন ভাই। আমার যথাসর্বস্ব গেছে।

: চুরি হয়ে গেছে ? কখন চুরি গেল ?

: চুরি নয়। ওনার সেই যে বজ্জাত পার্টনারটা মিথ্যে চাকরির খবর জানিয়ে তোমাদের কাছে আমার গালে চুনকালি মাখিয়েছে, সেই ব্যাটার কাজ। ফন্দি করে ওনাকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে বসেছিল।

সাধনা বলে, কিন্তু তোমার গয়না—?

বাসন্তী বলে, ওনাকে বাঁচাবার জন্য সব দিতে হয়েছে। শুধু গয়না নয় ভাই, পয়সা কড়ি সোনাটোনা যা জমিয়েছিলাম, সব ঢেলে দিতে হয়েছে। কি করি, গয়না গেলে পয়সা গেলে আবার আসবে, সোয়ামী গেলে আর তো পাব না।

নিজের হারের কথা না তুলেই সাধনা ঘরে ফেরে।

রাখাল বলে, ট্যাক্সি আনব ?

সাধনা বলে, না, ট্যাক্সি লাগবে না।

: কেন ?

: আমরা ও বিয়েতে যাব না। বেলা পড়ে এলে তুমি আমি দুজনে ভোলার মা'র মেয়ের বিয়ে দেখতে যাব।

হারটার জন্য অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। নতুন হার বাক্সে তুলে রেখে সাধনা গলাটা আবার খালি করে ফেলে।

আপোস

১

সোনা ওজনে খুব ভারী।

সোনা নামক ধাতুর এই বিশেষ গুণের খবর কলেজে পড়বার সময়েই রাখাল জেনেছিল। জেনেছিল বই পড়ে। সোনার চেয়ে ভারী সোনার চেয়ে দামী ধাতু আছে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। যেমন অ্যাটম বোমা তৈরির ধাতু আবিষ্কার করতে হয়েছে বিজ্ঞানকেই এগিয়ে গিয়ে। বিজ্ঞান শুধু নতুন খোঁজে—নতুন পথ, নতুন বিকাশ, বস্তু ও জীবনের নতুন দাম।

দামের হিসাবে সোনাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান।

কিন্তু তবু সোনার চেয়ে দামী হতে পারে নি সেই ধাতু, যে ধাতু দিয়ে মানুষ আজকাল অ্যাটম বোমা বানায়।

এখনও সোনাই মানুষের সবচেয়ে জানাচেনা আপন পদার্থ, সোনাকেই মানুষ আরও বেশী বেশী আপন করতে চায়, সোনা দিয়ে মুড়ে রাখতে ব্যাকুল হয়ে থাকে চিন্তাভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষা।

সোনার রঙেই সবচেয়ে রঙীন হয় জীবন!

কি ওজনে আর কি দামে সোনার সাথে পাল্লা দিতে পারে যে অসাধারণ ধাতু, সে ধাতুর সঙ্গে পরিচয় নেই সাধারণ মানুষের।

প্রয়োজনও নেই। সোনাই মানুষের আদরের সোনামানিক।

জানা কথাটা রাখালের অভিজ্ঞতায় যাচাই হয়েছিল সেদিন, বিশুকে পড়াতে গিয়ে ঘর খালি পেয়ে বিশুর মা'র একরাশি গয়নার সামান্য একটা অংশ যেদিন না বলে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। গয়না ক'টার ওজন তাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল।

রাখাল জেনেছে, সোনার আরেকটা ওজন আছে।

অন্যরকম ওজন।

অবস্থার ফেরে সোনা যখন চাপ দেবার সুযোগ পায় মানুষের বিবেকে, তখন বিবেকে চাপানো সেই সোনার চেয়ে ভারী আর কিছুই থাকে না এ জগতে।

ফাঁক পেলেই সোনা বিবেকে চেপে বসে।

যুক্তি অযুক্তি খাটে না, মনের জোরে তুচ্ছ করা যায় না, বেপরোয়া বেশ করেছি মনোভাব দিয়ে দেওয়া যায় না উড়িয়ে।

না বলে একজনের গয়না ধার হিসাবে নিলেও বিবেককে সে গয়না কামড়াবেই কামড়াবে। চোর হয়ে চুরি করলেই বরং এত বেশী কামড়ায় না। চোর-ছ্যাচোরের কাছে সোনার চেয়ে দামী কিছুই নেই।

বড় বড় রাজা মন্ত্রী চোরের বিবেকে একেবারেই কামড়ায় না। প্রত্যক্ষ প্রকাশ্যভাবে কামড়ায় না। বিশেষভাবে চুরি করার বিশেষত্বকে দেশসেবার নীতি হিসাবে প্রচার করার প্রচণ্ড নেশায় মশগুল হয়ে থাকে।

জেনে বুঝে চোর হলে তো ফুরিয়েই গেল বিবেকের বালাই, বিবেক বিসর্জন দিয়ে চুরি করলাম! চোর আমি হব না কিছুতেই—এ সংস্কারকেও খাতির করব, আবার চোর যা করে ঠিক সেই কাজটাই করব কতকগুলি যুক্তি খাড়া করে, এতে কি আর রেহাই মেলে!

নিজেকে রাখাল চোর ভাবে। তবু বিবেক কামড়ায়।

কারণ নিজের কাছে সে অস্বীকার করে না যে নিজের হিসাব তার যাই হোক, দশজনের হিসাবে সে চোর ছাড়া আর কিছুই নয়।

দশজনের হিসাবে চোর হলেও নিজের হিসাবে চোর নয়! এ কি নীতি ভাঙবার জন্য নৈতিক সমর্থন সৃষ্টির সেই চির পুরাতন ধাপ্পাবাজি নয়? বড় বড় অনেক নীতিজ্ঞ মহাপুরুষ যে নৈতিক ধাপ্পাবাজির জোরে মানুষের সুখ সম্পদ স্বাধীনতা চুরি করে? ধরতে গেলে আসলে যাদের কল্যাণে রাখালকে নিরুপায় হয়ে উদ্বাস্তু এক জমিদারের বৌয়ের সেকেলে ধরনের শ্রদ্ধা মেশানো স্নেহে তাকে আপন কথার সুযোগ নিয়ে তারই অনেক গয়নার ক্ষুদ্র অংশ গয়না ক'টা না বলে নিতে হয়েছে?

এসব জানে রাখাল। এসব প্যাঁচ কষে, এসব ফাঁকি দিয়ে নিজেকে ভোলাতে পারলে তো কথাই ছিল না। তার কাজ করার এবং উপার্জনের অধিকার অন্যে চুরি করেছে বলেই তার চুরিটা চুরি নয়, এটা শুধু হাস্যকর অজুহাত কেন, নৈতিক যুক্তিই নয় রাখালের কাছে। যে স্বার্থ চুরি-চামারিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়েছে শতগুণ, সেটাই যে আবার সংগ্রামের পথে সাধারণ মানুষের বীর মানুষ হওয়ার রেট লক্ষগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এ দিকটা ভুললে চলবে কেন তার?

ছাঁটাই হয়ে বেকার হয়ে বছর দেড়েক সেও কি যোগ দেয় নি এই সংগ্রামে?

অন্যায়কে নিজের অন্যায়ের কৈফিয়ত দাঁড় করাবার ফাঁকি রাখাল জানে।

কোন নৈতিক সমর্থনই সে সৃষ্টি করে নি নিজের কাজের। সমস্ত কাহিনী শুনে কেউ যদি তাকে চোর বলে, সে প্রতিবাদ করতে যাবে না। এইটাই তার দশজনের হিসাবে নিজেকে চোর মনে করার মানে।

তার নিজের হিসাবের মানেটা খুব সোজা। বিশুর মা'র গয়না সে চুরি করে নি, শুধু সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে নিয়েছে। ঋণ হিসেবে নিয়েছে।

প্রচুর গয়না আছে বিশুর মা'র। একেবারে অকেজো অনাবশ্যক মাটির ঢেলার মতই রাশিকৃত সোনা তোরঙ্গে পড়ে আছে। এই সামান্য কখানা গয়নার অভাব টেরও পাবে না বিশুর মা।

না জানিয়ে চুপি চুপি নিয়েছে। কিন্তু আর কি উপায় ছিল? বলে-কয়ে নিতে চাইলে এ জগতে কে তাকে দিচ্ছে ঋণ? কে স্বীকার করছে যে বেকার নিরুপায় তারও যোগ্যতা আছে দাবি আছে ঋণ পাবার?

সরকারের পর্যন্ত ঋণ দরকার হয়, সকলের ধন কেড়ে নিয়ে যে কজন হয়েছে কুবেরের মত ধনী, তাদের বশম্বদ যে সরকার। সরকার কোটি টাকা ঋণ চাইলে কয়েক ঘণ্টায় সে টাকা উঠে যায়। ঋণ দিতে উৎসুক অনেকের টাকা বাতিল করতে হয়।

তাকে কে ঋণ দিচ্ছে পাঁচটা টাকা?

কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রাশি রাশি সোনা অকেজো করে যদি ফেলে রাখতে পারে মানুষ, সেও তার চরম প্রয়োজনের সময় না বলে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ ধার নিতে পারে।

সাধনা যখন ভেঙে পড়েছে, সেই সঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার উপক্রম করেছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন, আর কোন উপায় না থাকলে এ ভাবে ঋণ গ্রহণের অধিকার তার নিশ্চয় জন্মায়।

সাধারণ সুখের লোভে, সাধারণ অভাব-অনটনের হাত থেকে রেহাই পেতে সে বিশুর মা'র গয়নাগুলি নেয় নি। এদিক দিয়ে সে খাঁটি থেকেছে নিজের কাছে। গয়না কটা বেচে দু হাজারেরও বেশী টাকা পকেটে নিয়ে খিদেয় যখন ঝিম্ ঝিম্ করছিল জগৎ তখনও সে প্রশ্রয় দেয় নি একটি চপ খাবার ইচ্ছাকে। ওই দু হাজার টাকা নয়, পকেটে হাত দিয়ে হিসাব করেছিল নিজের এগারো আনা পয়সার।

সাধনাই ছিল তার সবার সেরা যুক্তি।

আকস্মিক বেকারির অসহ্য চাপে সাধনার সাময়িক উন্মত্ততা সামলাতে

হবেই, যেভাবে হোক ঠেকাতে হবেই তার নিজেকে ধ্বংস করার সঙ্গে স্বামীপুত্র-সংসারটা ধ্বংস করে দেওয়া। বিশুর মা'র গয়না নেওয়া উচিত কি অনুচিত সে বিবেচনার সুযোগ পাবে অনেক, সাধনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে না করলে সারা জীবনটাই তাদের যাবে ভেস্তে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এই হিসাবটাই সাধনা দিয়েছে ভেস্তে।

সাধনা একরকম তার চোখে আঙুলি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে অতটা বিগড়ে সে যায় নি, এত বেশী অসহ্য তার হয় নি স্বামীর বেকারত্বের দুর্দশা যে আত্মহারা হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে সে ভেঙে পড়বে। তার জন্য বিশুর মা'র গয়না নেবার কোনই দরকার ছিল না রাখালের।

শুধু তাই নয়।

যেদিক দিয়ে যেভাবে তার উচিত ছিল অবস্থাটা সহনীয় করতে সাধনাকে সাহায্য করা, সেদিক দিয়ে সেভাবে কোন সাহায্যই সে করে নি তাকে। তাকে নরম জেনে দুর্বল জেনে তেমনি রেখে দিতে চেয়েছে। চরম দুর্দিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে এতটুকু ভাগাভাগি করতে চায় নি বাঁচার ও বাঁচবার দায়িত্ব, স্বামিত্বের অহংকারে আগের মতই সাধনাকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে জীবন-সংগ্রামের সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে। একাই সে দিবারাত্রি ভেবেছে কিসে কী হবে আর কিভাবে কী করা যাবে, অথচ বিশেষ কিছু করতে না পেরেও দাবি ঠিক খাড়া রেখেছে যে যতটুকু সে করতে পারে তাই মানতে হবে সাধনাকে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শান্তভাবে সমস্ত নতুন দুঃখ কষ্ট সয়ে যেতে হবে।

সে-ই একমাত্র রক্ষাকর্তা সাধনার। তাকে রক্ষা করার জন্য যে অমানুষিক চেষ্টা আর পরিশ্রম করে চলেছে তাতেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সাধনার।

আর কিছুই তার করার দরকার নেই। কৃতজ্ঞ থাকবে আর নীরবে অবিচলিত ভাবে সব সয়ে যাবে। তার না জানলেও চলবে সমস্যাটা কী এবং তার ভারটা লাঘব করতে কিছু না করলেও চলবে।

সাধনার যে প্রয়োজন আছে নতুন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করার, এটা সে খেয়ালও করে নি।

এই ঘরের কোণে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন যাপন করতে করতে আশেপাশের জীবনের বাস্তবতা থেকে সাধনা নিজেই ধরতে পেরেছে এবার তারও একটু বদলানো দরকার, শুধু আগের দিনের শোকে কাতর হয়ে থাকলে চলবে না।

নিজের প্রয়োজনে নিজের তাগিদেই সাধনা হতাশাকে ঠেকিয়েছে, খানিকটা বদলে দিয়েছে নিজেকে।

সে তাই কৃতজ্ঞতা পায় নি সাধনার। তাকে শুধু ক্ষমা করে মেনে নিয়েছে।

বিশুর মা'র গয়না-বেচা টাকা রোজগারের উপায়ে লাগিয়ে ক্রমে ক্রমে অবস্থার খানিকটা উন্নতি করেও সে সাধনার কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে না। সে তাকে শেখায় নি মিলে-মিশে চরম দুর্গতিকে গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাদের সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য সচেতনভাবে জবরদস্ত শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে তার পাশে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন।

অতি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাধনাকে এটা বুঝতে হয়েছিল —একা একা।

সে শুধু আপোস করেছিল। রাখালের সঙ্গে নয়, বাস্তবতার সঙ্গে।

রাখাল কিভাবে প্রাণপাত করে নিজের বিবেককে পর্যন্ত বাঁধা রেখে সর্বনাশের মোড় ঘুরিয়েছে, দুরবস্থাকে আয়ত্ত করেছে, সেজন্য মাথাব্যথা নেই সাধনার।

কর্তব্য করছে রাখাল। যা সে নিজে করতে চায়, একলা করতে চায়, যা করে সে স্বামী হয়ে থাকতে চায় সাধনার, সেটুকু শুধু করেছে রাখাল।

আগে অপিসে চাকরি করে করত। এখন অন্যভাবে সেই কাজ করছে?

তার বিবেক বাঁধা রাখার আসল ব্যাপারটা অবশ্য সাধনা জানে না। তাকে সে জানায় নি। বিশুর মা'র গয়নার কথা খুলে জানিয়ে অনর্থক তার মনের শান্তি নষ্ট করার কোন মানেই রাখাল খুঁজে পায় না।

হঠাৎ এতগুলি টাকা সে কোথায় পেল তার কৈফিয়ত হিসাবে জানিয়েছে যে হীনতা স্বীকার করে চেনা একজন ধনীর কাছে টাকাটা সে ঋণ নিয়েছে, শোধ দিতে না পারলে দায়ে ঠেকবে।

নিজের কাছে দায়ে ঠেকবে, নিজের বিবেকের কাছে!

: দেখো, যেন বিপদে পোড়ো না!

আজও রাত নটা-দশটায় ফিরতে হয়! তবে বাসেই ফিরতে পারে। পুরো প্যাকেট সিগারেট পকেটে নিয়ে।

খাওয়ার আগে বিশ্রামের ছলেও একটা সিগারেট টানা যায়। বিয়েতে-পাওয়া খাটের বিছানায় পা তুলে বসে সিগারেট টান দিয়ে হাসবার চেষ্টা করে রাখাল, বলে, উঃ, কী ভীষণ দিনগুলিই গেল!

সাধনা যন্ত্রের মতো সায় দিয়ে বলে, সত্যি।

: তুমি পেট ভরে ভাত পেতে না, একফোঁটা দুধ পর্যন্ত পেতে না।

: সত্যি। দুধ খেতে আমার ঘেন্না করে।

: খোকনকে তিনপোয়া দুধ খাওয়াও তো ?

: কি করে খাওয়াব ? পেট ছেড়েছে যে। আজ সারাদিন শুধু বার্লি খাইয়েছি।

এমন কিছু বড়লোক হয়ে যায় নি রাখাল। একটু সামলে উঠতে পেরেই দু-একটা দিকে বাড়াবাড়ি করার তার ঝোঁক চেপেছে। ছেলেটা মোটে এক-পোয়া দুধ খেত আর টেনে টেনে টনটনিয়ে দিত সাধনার মাই, তাই সে একজন বাঙালী গোয়ালিনী আর একজন পশ্চিমা গোয়ালার কাছে দুধ রোজ করেছে দু-সের।

নামেই অবশ্য দু-সের দুধ। খাঁটি দুধের জলীয় সংস্করণ। মানবী মা হোক আর গোমাতাই হোক, কারো দুধ জমাট বস্তু নয়। খাঁটি দুধও জলের দ্বারাই তরল হয়ে থাকে। কিন্তু রাখাল যে দু-সের দুধ রোজ করেছে তার মধ্যে সের-খানেক বাড়তি জল।

কলের আর পুকুরের জল।

শুধুই কি কলের জল আর পুকুরের জল ?

দেশসেবা, ত্যাগ আর গণতন্ত্রের নামে সর্বাঙ্গীণ চোরামির যুগে দুধ-বেচুনেরাও কি আয়ত্ত করবে না সামনে দাঁড়িয়ে গোরুর বাঁট থেকে জলহীন বালতিতে দুধ ঝরে পড়াটা শ্যেন দৃষ্টিতে দেখে যে দুধ কিনবে, তাকেও ঠকাতে ?

গোমাতার মুখের খাদ্য কণ্ট্রোল করে বাঁট-থেকে-ঝরা খাঁটি দুধকে কলের বা পুকুরের (কখনো নর্দমার) জল-মেশানো দুধের মতই পরিমাণে বাড়িয়ে তরল করার কৌশল তারা জানে।

রাখাল তাই বলে, কেন মিছে মাথা গরম করছ ? এক টাকা সের চাল যে হিসাবে কিনি, জল-মেশানো দুধও কিনি সেই হিসাবে। চোরাবাজারী চালের দাম দুধের দাম অনুপাতে ঠিক আছে।

মানেটা এই যে চাল আছে কণ্ট্রোলে তাই তার চোরাবাজার। দুধ কণ্ট্রোলে নেই তাই তাতে ভাঁওতা।

ভগীরথের গঙ্গা আনার মত সে যেন দুধের বন্যা এনে দেবে না খেয়ে শুকিয়ে আমসি-বনা তার বৌ আর ছেলের পেটে।

রাখাল চিন্তিত হয়ে বলে, খোকনের দুধ হজম হয় না ? তোমার দুধ খেতে ঘেন্না হয় ? কে জানে বাবা এসব কি ব্যাপার !

খেতে বসে আশা করে, সাধনা মাছের কথা তুলবে। নিজে থেকে ভাল মাছ

এনেছে, বেশী করে এনেছে—দুজন মানুষের জন্য তিনপোয়া মাছ। কিন্তু সাধনা সাধারণ কথাই বলে, মাছ সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করে না।

: একদিন মাছের কড়াই উনানে উলটে দিয়েছিলে, মনে আছে ?

মনে থাকবে না ? ভাপ লেগে সারাদিন মুখটা জ্বালা করেছিল। যেমন বোকার মত রেগেছিলাম, তার শাস্তি।

সাধনা হাসে, সহজ শান্তভাবে। জিজ্ঞাসাও করে মাছটা রান্না কেমন হয়েছে, আরেক টুকরো খাবে নাকি রাখাল। কিন্তু মাছ ভালবাসে বলে তার জন্য বেশী করে মাছ আনায় সে বিশেষভাবে খুশী হয়েছে কি না টেরও পাওয়া যায় না।

একটু আনমনা উদাসীন ভাব সাধনার। বছরখানেক দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তেও যে তার প্রাণশক্তি, ছোটো সংসারটি নিয়ে মেতে থাকার যে আবেগ উদ্দীপনা বজায় ছিল, একটু সচ্ছলতা ফিরে আসতেই যেন তা শেষ হয়ে গিয়েছে। তার আনন্দ ছিল যেমন উচ্ছল, রাগ ও অভিমানও ছিল তেমনি প্রচণ্ড।

খুশীর কারণ ঘটলে আগের মতো ডগমগ হয়ে না উঠুক, তেজের সঙ্গে একবার যদি সে রাগও করত!

কোমর বেঁধে প্রাণ খুলে একবার ঝগড়া করত রাখালের সঙ্গে ?

সম্পর্ক তাদের বজায় আছে আগের মতই, আগের মতই তার বৌ হয়ে আছে সাধনা, মা হয়ে আছে তার ছেলের, সংসার করছে—কিন্তু কেমন একটু শান্ত সংযতভাবে, একটু আবেগহীনভাবে।

আগের মতো সাধনা আর নেই।

আজকাল সে খুব পাড়া বেড়ায়।

উদ্বাস্তু কলোনিটাতে রোজই একবার ঘুরে আসে। সাধনার কাছ থেকেই রাখাল শুনতে পায় এই সঙ্কীর্ণ এলাকার বাইরের জগৎটুকুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার নানা বিবরণ।

রাখালের মনে হয়, সাধনা কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে পাড়ার ঘরে ঘরে আর উদ্বাস্তুদের ওই ছোটো বসতিটুকুতে।

আগেও সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরাখবর রাখত আশেপাশের ঘরে ঘরে কী ঘটছে না ঘটছে। তিন-চারটি বাড়ির সাত-আটটি পরিবারের জীবনযাত্রা তার প্রায় নখদর্পণে ছিল, কার ঘরে কি রান্না হয়েছে আর কার একটু সর্দি হয়েছে সে খবর থেকে কার দূর দেশের আত্মীয়স্বজন কী বিষয়ে চিঠি লিখেছে

সে খবর পর্যন্ত। কেবল সাধনা বলে নয়, সব বাড়ির মেয়েরাই এরকম খবরাখবর রেখে থাকে। শহরতলী পাড়ায় এটা আজও বজায় আছে, মেয়েদের মৌখিক গেজেটে প্রত্যেক পরিবারের খবরাখবর অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের জানাজানি হয়।

সাধনা হয়তো ন মাসে ছ মাসে কদাচিৎ পাঁচ দশ মিনিটের জন্য যায় মল্লিকদের বাড়ি, কিন্তু বীরেন দত্তের বৌটির সঙ্গে তার খুব ভাব।

তার নাম প্রতিভা।

প্রতিভার আবার গলায় গলায় ভাব মল্লিকদের বাড়ির শোভার সঙ্গে।

প্রতিভার কাছে সাধনা হাঁড়ির খবর পায় মল্লিকদের, তারই মারফতে আবার সাধনার হাঁড়ির খবর পৌঁছে যায় মল্লিকদের বাড়ি। যা শোনে এবং যা জানে সাধনা আবার তা শোনায় আরও দু-একজনকে যাদের সঙ্গে তার ভাব আছে। তাদের কাছে খবর শোনে অন্য বাড়ির।

তারা আবার শোনায় অন্যদের।

এমনিভাবে জানাজানি হয়।

একজনকে যে পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে হয় তা নয় সব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয় তাও নয়। দু-চারজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেই যথেষ্ট। পাড়ার কোনো বাড়ির মানুষের চালচলন স্বভাবচরিত্র, সংসারের অবস্থা আর গতিপ্রকৃতি কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না।

কিন্তু সে ছিল আলাদা ব্যাপার। সে ছিল শুধু তথ্য জেনে কৌতূহল মেটানো। আজকাল সাধনার শুধু খবর শুনে সাধ মেটে না নিজে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা করে আসে মানুষগুলির সঙ্গে। যে বাড়িতে তার ছিল ন মাসে ছ মাসে একদিন বেড়াতে যাওয়া, নিতান্তই নিয়ম রক্ষার জন্য, সে বাড়িতে আজকাল সে ঘন ঘন যাতায়াত করে। যাদের সে পছন্দ করত না, যাদের সঙ্গ ছিল বিরক্তিকর, যেচে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করে।

ছোটো বড়ো নীড়গুলিতে ছড়ানো জীবনে সে যেন সন্ধান করছে গভীরতর কোন তাৎপর্য, নতুন কোন মানে বুঝবার চেষ্টা করছে চেনা মানুষগুলির জানা জীবনের।

জানা জীবন ভেঙে পড়ছে, গতি নিয়েছে অজানা অনিবার্য পরিণতির দিকে। তা, জীবন তো আর ধ্বংস হয় না। ধ্বংস হচ্ছে অবস্থাটা। ধ্বংসের পথে কোন নতুন অবস্থায় জীবন আবার নতুন রূপ নিতে চলেছে, জানবার বুঝবার জন্য কৌতূহলের সীমা নেই সাধনার।

তারও কিনা সেই একই পথে গতি।

রাখালের কাছে আজকাল শুধু সে পাড়ার গল্পই করে না, অনেক জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়ে যায় তার বর্ণনায়। রাখালকেই সে প্রশ্ন করে তা নয়। তার নিজের মনেই জেগেছে প্রশ্নগুলি এবং সর্বত্রই সে খুঁজছে জবাব, সেগুলির যেটুকু ক্ষেত্র তার অধিগম্য, যে কজন মানুষ তার জানা চেনা। শকুন্তলাকে যে দেখতে এসেছিল আধবুড়ো বিপত্নীক এক ব্যবসায়ী সে গল্প শোনানোর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে এই জিজ্ঞাসা তুলে ধরা যে বিয়ে ছাড়া গতি নেই মেয়েটার, আর কোন যোগ্যতার ব্যবস্থা করা হয় নি. তবু মেয়েটার বিয়ে দিতে এত উদাসীন কেন ওর বাপ-ভাই? এমন খারাপ অবস্থা তো নয় যে বিয়ে দিতে পারছে না? মানুষও তো ওরা খারাপ নয়, বজ্জাত নয়? মেয়েরও তো এমন কোন খুঁত নেই, বাপ ভাই যাকে ঠিক করুক তাকেই বিয়ে করতে সে রাজী? এমন ভাবে বয়স বেড়ে চলেছে, আগে হলে বাড়ির লোক কবে পাগল হয়ে উঠত মেয়েটাকে পার করার জন্য, আজ কোথা থেকে কি ভাবে এই অদ্ভুত গা-ছাড়া নিশ্চেষ্ট ভাব এল? এর আসল মানেটা কী?

এটা বিশেষ ভাবে শকুন্তলা সম্পর্কে প্রশ্ন। অবিকল না হলেও মোটামুটি একই রকম প্রশ্ন জাগে লতিকা আর অমিয়ার সম্পর্কে।

বিয়ে তাদের হচ্ছে না কেন?

কয়েক বছর আগে এরকম পরিবারের এই বয়সের এরকম মেয়েদের কুমারী দেখা যেত না। স্কুল-কলেজে পড়ে, টাইপরাইটিং শেখে, ভুখা মানুষদের ওপর গুলি চললে এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দেয়, সেরকম মেয়ে এরা নয়।

আগের মতই ঘরে ক-খ-শেখা শেলাই-শেখা রান্না-শেখা অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করা সব মেয়ে।

নীচের ভাড়াটের সঙ্গে দত্তদের যে আরেকবার মারামারি বাধবার উপক্রম হয়েছিল তাতে সাধনা আশ্চর্য হয় নি। সে ভেবে পায় না দুটি শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও কি করে নামল এই ঝগড়ায়, গলা চড়িয়ে কুৎসিত ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দিল? সে তো নিজে গিয়ে দেখে এসেছে যে এ দুটি বাড়ির মেয়েরা ছোটলোক হয়ে যায় নি, তবু?

নীরেন দত্তের স্ত্রী বিভাবতী নিজে শিক্ষিতা, লেখাপড়ায় নাচে-গানে তার মেয়ে দুটি এ পাড়ায় অতুলনীয়া, ভাড়াটে সুধীর মুখার্জির স্ত্রীর এমন মিশুক স্বভাব, তার ছেলের বৌ অঞ্জলী এমন লাজুক প্রকৃতির, তার মেয়ে নমিতার এমন সরল হাসি মিষ্টি কথা—তবু?

সেনদের নতুন রাঁধুনীটাও আবার পালিয়ে গেছে জানিয়ে সাধনা আগের মত বিনয় সেনের বৌ সুহাসিনীর মন্দ স্বভাবের কথা বলে ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে দেয় না, ওদের বাড়ি ঝি রাঁধুনী টেঁকে না কেন এ রহস্যকে নতুন করে তুলে ধরে মাথা ঘামায়।

সুহাসিনীর স্বভাবের জন্য হতেই পারে না, অন্য কারণ আছে।

বারোমাস রোগে ভুগে সত্যি ভারী খিটখিটে স্বভাব হয়েছিল, কিন্তু পর পর দুটি ছেলে মরে গিয়ে সে তো শোকে কাবু হয়ে বিছানা নিয়েছে, ভালমন্দ কোন কথাই কাউকে বলে না? চাকর ঠাকুর ঝি রাঁধুনীর উপর বরাবর সে সংসারের সব ভার ছেড়ে দেয়। আগে তবু দেখাশোনা করত তারা কী করছে না করছে, আজকাল তো জিজ্ঞাসাও করে না? রাঁধুনীটার হাতেই সে তো সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল, সে যা করে তাই সই, তবু কেন তিনদিন কাজ করেই এ লোকটাও পালিয়ে গেল?

কেন বার বার এ ব্যাপার ঘটবে, কারণ কি?

ঘোষালদের বাড়িতে লোক বেশী, খাটুনি বেশী, মাইনে কম; ঘোষাল-গিন্নির যেমন ছুঁচিবাই তেমনি চব্বিশ ঘণ্টা খেঁচাখেঁচি বলে ওদের কাজ ছেড়ে এসেছিল রাঁধুনীটা এ বাড়িতে। এখানে ছোটো সংসারে বেশী বেতনে নিজের খুশিমতো নির্বিবাদে কাজ করার সুযোগ পেয়েও আবার কেন ফিরে গেল ঘোষালদের বাড়িতে?

আশী টাকা উপার্জনে একখানা ঘরে পরেশের সংসার, তিনটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, এক ফোঁটা দুধ রাখে না। দুধ ছাড়া যদি না চলে ছেলেপিলের, ওরা বেঁচে আছে কী করে? খেলাধুলো করার জোর কোথায় পায়? আবার যে ছেলেপিলে হবে পরেশের বৌ অমলার, সেজন্য ওদের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই কেন?

ওরা অবশ্য বলে যে মরতে বসেছি। কিন্তু মুখে বললেই তো হয় না। দুশ্চিন্তায় ওরা পাগল হয়ে গেল কই?

কাছেই ওই উদ্বাস্তু কলোনি, ওদের একই দেশ থেকে যারা এসে বাড়ি কিনেছে এখানে, তারা কেন ভুলেও দেশের লোকের কলোনিতে পা দেয় না? রাখালের ছাত্র বিশুর বাড়ির লোকেরা কেন এড়িয়ে চলে কলোনির হোগলার ঘরের বাসিন্দা দেশের লোককে?

এমনি কত ভাবের কত যে জিজ্ঞাসা সাধনার।

শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় রাখাল। সাধনাকে তার মনে হয় আনমনা

উদাসীন—তাকেও যে সাধনার অবিকল সেইরকম মনে হয় এটা এখনো খেয়াল হয় নি রাখালের।

: দিনরাত অত কী ভাব?

: দিনরাত ভাবি? দিন তো কাটে বাইরে, রাত নটা পর্যন্ত।

: তুমি দিনরাত ভাব। ঘরেও ভাব, বাইরেও ভাব!

: দিনরাত ভাবি জানলে কী করে?

: ও বোঝা যায়।

: কী করে?

এসব তার আসল প্রশ্নটা চাপা দেবার কৌশল। সাধনা কিন্তু রাগ করে না।

বলে, বাড়িতে যতক্ষণ থাক, আগেও থাকতে, এখনো থাক। আগে এরকম ভাবতে না। একদিন দুদিন নয়, রোজ ভাবতে দেখছি। শুধু বাড়িতে একটু ভেবে এরকম চিন্তা কেউ তাকে তুলে রাখতে পারে? আমার কাছে লুকিও না। কিছু হয়ে থাকলে আমায় না বলে লাভ নেই জান তো?

বলতে বলতে সাধনা আরও কাছে সরে এসে বসে। গরমে ঘামাচিতে ছেয়ে গেছে রাখালের গা, আদর করে ঘামাচি মেরে দেয়।

কয়েক মুহূর্ত কেমন বিকল হয়ে যায় রাখাল!

: বিশেষ কিছু ভাবছি না! কী করব না করব এই নানা চিন্তা!

বলে রাখাল তাকে বুকে টেনে নেয়।

: দোকান ভালো চলছে না?

: দোকান ঠিক চলছে। রাজীব পাকা লোক।

: তবে? ধারের টাকার কথা ভাবছ? কত বলছি, খরচ বাড়িও না—

রাখাল শুনতে পায় না তার কথা!

সে তখন ভাবছে, সব কথা খুলে বলবে কি সাধনাকে? খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে বলবে সে কী করেছে এবং কেন সে তা করেছে?

কিন্তু সাধনা কি বুঝবে তার কথা? বিশুর মা'র গয়না লুকিয়ে নিয়েও কেন সে চোর হয়ে যায় নি, তার মানেও বুঝবে? রাখাল নিজেই মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের জবাব দেয়—না, সাধনা বুঝবে না। তার কাছে এটা আশা করাই অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা!

সাধনাও সেই দশজনের একজন তার কাজকে যারা চুরিই বলবে এবং তাকে ভাববে চোর।

চুরি সে করেছে একা। তাই নিজের বৌয়ের কাছেও চোর হয়ে গেছে।

চোরেরও বৌ থাকে, স্বামীকে চোর হিসাবেই সে নেয়। সাধনা চোরের বৌ হিসাবে তাকে চোর বলে নেবে না, দশজনের একজন হয়ে তাকে চোর ভাববে।

শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে আসে রাখালের অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ। সেটা টের পেয়েই মুখ ম্লান হয়ে যায় সাধনার, তার বুক থেকে মুক্তি নিয়ে তফাতে সরে বসে হাই তুলে সে একটা নিশ্বাস ফেলে।

এই ভাবনার মানেই সে জানতে চেয়েছিল রাখালের কাছে, সে ভাবনা আদরের আলিঙ্গনকেও এভাবে শিথিল করে দিতে পারে, আজ পর্যন্ত কখনো যা ঘটে নি!

দুশ্চিন্তায় ডুবে থেকে রাখাল তাকে আদর করে নি, তার দিকে ফিরে তাকায় নি—সে ছিল ভিন্ন কথা। তাকে বুকে নিয়ে আদর করতে করতে রাখাল অন্যমনস্ক হয়ে ঝিমিয়ে যায়, এ অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন, একেবারেই দুর্বোধ্য।

২

রাজীবের সঙ্গে বিড়ির পাতা সুখার তামাক আর সিগারেটের কারবারে নেমে রাখাল দুটো পয়সার মুখ দেখতে শুরু করছে।

পাতা সুখা আর সিগারেটের নতুন ছোটোখাটো দোকান, পাইকারি মাল কিনে খুচরো বেচার লাভ, তাও আবার রাজীবের সঙ্গে বখরায়। তবু, সেই আগেকার কেরানীগিরির চেয়ে ভাল রোজগার হচ্ছে বৈকি তার। বেকার হয়ে তিনটে টুইশনি করেও যে শোচনীয় অচল অবস্থায় পড়েছিল, সেটার অবসান হয়েছে।

টুইশনির টাকা পেলে তবে রেশন আসবে, বাজার আসবে এবং উনানে হাঁড়ি চড়বে, এই অসহ্য দুর্দশা আর নেই। এখন সে চোরাবাজার থেকে দু-পাঁচ সের চাল যখন খুশি কিনতে পারে, দু-বেলা মাছ খাওয়াতে পারে সাধনাকে, ছেলের জন্য রোজের দুধ দরকার হলে আরও আধসের বাড়িয়ে দিতে পারে।

এই সেদিনও আধপোয়া দুধ বাড়াতে পারে নি বলে ছেলেকে মাই ছাড়াতে

পায়ে নি সাধনা। ছেলে দস্যুর মতো শুয়েছে আর বাথায় টনটন করেছে তার আধ-শুকনো মাইগুলি।

ব্যাঙ্কে কয়েক শ টাকাও জমেছে রাখালের।

কিন্তু টুইশনি একেবারে ছাড়ে নি রাখাল, সকালে বিশুকে আর সন্ধ্যায় প্রভাকে নিয়মিত পড়ায়। দু-নম্বর ছেলেটিকে পড়াবার সময় পায় না। আগে ভোরে উঠে বিশুকে পড়িয়ে সটান চলে যেত এই ছাত্রটির বাড়ি, এখন যায় দোকানে। রাজীব অবশ্য তার আগেই দোকান খুলে বসে।

লাভে তো ভাগ বসাবেই, ব্যবসাটাকে কোনদিকে কোন পথে টেনে নিয়ে যাবার ঝোঁক চাপবে তাও ঠিক নেই, তবু নগদ দুটি হাজার টাকা দিয়ে রাখাল যে ব্যবসাটা তার শুরু করতে সাহায্য করেছে তাতেই রাজীব কৃতজ্ঞতায় গলে গেছে।

রাজীব বলে, আপনি ভাই যখন খুশি আসবেন, যতক্ষণ খুশি থাকবেন, কোন হাঙ্গামা করতে হবে না আপনার। আপনি টাকা দিয়েছেন তাই ঢের।

রাখাল কিন্তু আপিসের ডিউটি করার মতো ঘড়ি ধরে নিয়মমত দোকানে যায়, রাজীবের সঙ্গে খাটে। রাজীবের সসঙ্কোচ প্রতিবাদ কানে তোলে না।

বলে, না ভাই, হাত-পা গুটিয়ে বাবু সেজে বসে থাকতে পারব না। টাকা আপনিও দিয়েছেন আমিও দিয়েছি, আপনি সব ঝনঝাট পোয়াবেন আর আমি লাভের ভাগটুকু নেব, তা হয় না।

: ঝনঝাট কি? এই কাজ করে এসেছি চিরকাল, আমাদের কি গায়ে লাগে? আপনি শিক্ষিত মানুষ, বিদ্যাচর্চা হল আপনার কাজ। এসব নোংরামি কি আপনাদের সয়? আপনার টাকাটা না পেলে দোকান স্টার্ট হত না আমার। আপনার কাছে কেনা হয়ে আছি দাদা।

: ও-কথা বলবেন না। আমার টাকা না পেলেও আপনি ঠিক দোকান দিতেন, অন্য একজন ঠিক ভিড়ে যেত আপনার সঙ্গে। আমার মতো আনাড়িকে পার্টনার করেছেন, আমারি সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আপনার কাছে।

রাজীব সবিনয়ে বাতিল করে দেয় তার কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন, কিন্তু খুশী আর তৃপ্তি যেন চোখে-মুখে তার ধরে না। সেই যে যেচে একদিন সে রাখালের চাকরি করে দিতে চেয়েছিল তার আগেকার কারবারের বজ্জাত পাষণ্ড পার্টনারটির মারফতে, চাকরির নামে মারাত্মক এক চোরামির ফন্দিতে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম ঘটেছিল রাখালের, সেজন্য লজ্জার সীমা ছিল না রাজীবের। বেকার রাখাল সোজাসুজি পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরি প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বাঁচিয়েছিল বলে রাজীবও যেন বেঁচে গিয়েছিল। শ্রদ্ধার যেমন তার সীমা থাকে নি মানুষটার উপর, না

জেনে না বুঝে ভাল করার নামে তাকে বিপদে ফেলতে গিয়েছিল বলে মরমে মরে থাকাও সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি বহুদিন।

চাকরি করে না দিতে পেরে থাক সাথে নিয়ে ব্যবসায়ে নামিয়ে ছ-পয়সা আয়ের ব্যবস্থা সে যে তার করে দিতে পেরেছে, এজন্য তাই আনন্দের সীমা নেই রাজীবের। রাখাল কৃতজ্ঞভাবে কথা বললে তার খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা গোল-গাল মুখে দাঁতন-ঘষা ঝকঝকে দাঁতের হাসি ফোটে, ছোট ছোট ধীর শান্ত চোখে ঘন ঘন খুশীর পলক-ফেলা চাঞ্চল্য আসে।

খাঁটি শহর এলাকায় ট্রাম-চলা বাস-চলা রাস্তার ধারে ছিল রাজীবের আগের দোকান—আগের সেই বজ্জাত পার্টনার দীননাথের সঙ্গে। সে দোকান গেছে যাক, রাজীবের এখন আর আপসোস নেই। কি বোকাই তাকে বানিয়েছিল হারামজাদা। সাধারণ দোকানদার সে, পাইকারি কিনে খুচরো বেচার সাধারণ ব্যবসায়ী, তাকে উঁচুদরের ব্যবসায়ী করার লোভ দেখিয়ে, বড়বাজার থেকে মাল কেনার বদলে বড়বাজার যেখান থেকে যেভাবে মাল কিনে আনে সেখান থেকে সেইভাবে মাল আনিয়ে ব্যবসা ফাঁপানোর ভাঁওতা দিয়ে, ঘুষ দিয়ে যোগাড়-করা কয়েকটা ওয়াগনের সরকারী পারমিট দেখিয়ে, একজন মন্ত্রিমশায়ের একজন ভাগ্নেকে দোকানে মহা সমাদরে চা-বিস্কুট খাইয়ে, কি ভাবেই না মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছিল তার।

তারপরেই সর্বনাশ হয়ে যেত, একেবারে শ্রীঘরে গিয়ে বাস করতে হত, যদি না বাসন্তী গায়ের সব গয়না খুলে দিত, ট্রাঙ্কে তার বিয়ের বেনারসীর নাচে লুকানো নোট, কাঁচা টাকা আর ভাঙা গয়নার সোনায় হাজার পাচেক টাকা বের করে দিত।

কত জন্ম তপস্যা করে না জানি সে এমন বৌ পেয়েছে, এমনি চরম বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য যে পাঁচ-ছ বছর ধরে কেঁদে-কেটে ঝগড়া করে নতুন গয়না আদায় করেছে, খুঁটে খুঁটে নোট আর কাঁচা টাকা জমিয়েছে, অচল গয়নার সোনা কিনে রেখেছে।

লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলে। ভাগ্যে সে স্ত্রৈণ হয়েছিল।

এবার থেকে আরও সে পোষ মানবে বাসন্তীর।

নতুন পার্টনার নিয়ে শুধু বাস-চলা রাস্তায় তিন হাত চওড়া দশ হাত গভীর একটা খোপরে সে নতুন দোকান খুলেছে। মস্ত বড় এলাকার বাজারটার কাছাকাছি।

বাড়ি কাছে হয়েছে দুজনের।

চার পয়সা বাস ভাড়া লাগে।

রাখাল মাঝে মাঝে ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয়ও দেয়। সেটা আসলে অবশ্য তার বাস্তব-বুদ্ধি।

পাঁচশো সিগারেটের মোড়ক কিনতে আসে একজন খদ্দের। দেখেই বোঝা যায় সে পান-বিড়ির দোকানী নয়, খুচরো বেচার জন্য পাইকিরি সিগারেট কিনছে না। তার বেশভূষা আর চেহারাটাই সাংস্কৃতিক। বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, দাঁতে ভাঙন ধরেছে, মুখের চামড়ায় ছাইবর্ণ নেমে এসেছে—কালো মেয়ের মুখে একগাদা সস্তা পাউডার মেখে তেলচিটে গামছা দিয়ে ঘষে তুলে দেবার মতো, তবু চোখে যেন জ্বলছে অতৃপ্ত যৌবনের অগ্নিশিখা, যে ভুখা কোনদিন মেটে না তাকেই বাড়িয়ে যাওয়ার তপস্যার জ্বালা।

আসুন বামাচরণবাবু, আসুন। ভালো আছেন তো? অনেকদিন বাদে এলেন। এ নতুন দোকানেও আপনি আসবেন—

রাজীব যেন ভাষা খুঁজে পায় না বিনয় জানাবার, নিজে উঠে দাঁড়িয়ে তার আসনে বসায় বামাচরণকে, দোকানের খেরো-বাধানো হিসাবের খাতাপত্রের তলায় আড়াল-করা বহু ব্যবহারে জীর্ণ পুরাতন একটি ছাপা বই টেনে বার করে সামনে ধরে বলে, আজও মাঝে মাঝে আপনার কবিতার বইটা পড়ি আজ্ঞে! কবিতা লিখেছেন বটে সত্যি! রামায়ণ পড়ি, মহাভারত পড়ি, প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে না পড়ে, তখন আপনার বইটা পড়ি।

বামাচরণ মৃদু মৃদু হাসে। রাজীবের দেওয়া সিগারেটটা ধরায়।

রাজীব বলে, আর লিখলেন না? বারো-চোদ্দ বছর আগে লিখেছিলেন এ বইটা, আর লিখলেন না?

: লিখেছি! এবার ছাপব ভাবছি।

: নিজে ছাপবেন?

: নিজে ছাপব কি মশায়? আমার গরজ পড়েছে। সবাই ছাপাতে চায় আমার নতুন বইটা। সবাই বলে আপনি অনেকদিন কবিতার বই ছাপান নি, আমায় ছাপাতে দিন আপনার নতুন বইটা। কাকে দেব তাই ভাবছি।

: ছাপানো হলে একটা বই দেবেন কিন্তু আমায়।

বলে দামী সিগারেট প্যাকেটের পাঁচশো সিগারেটের একটা মোড়ক তার সামনে ধরে দিয়ে রাজীব ক্যাশমেমো কাটতে যায়।

বামাচরণ বলে, ইস, আমি টাকা আনতে ভুলে গিয়েছি একদম!

: দিয়ে যাবেন একসময়ে।

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গুরু-কবি এবং তার ভক্ত-শিষ্যের আলাপ শুনছিল। এবার সে জোর দিয়ে বলে, ধারে তো দেওয়া যাবে না মাল।

রাজীব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা বিড়ি ধরায়। বামাচরণকে বলে, ইনি আমার নতুন পার্টনার।

বামাচরণ বলে, ওবেলাই টাকা দিয়ে মালটা নিয়ে যাব।

রাখাল হাত জোড় করে, মাপ করবেন, নতুন দোকান, শ্রীজহরলাল স্বয়ং এক পয়সা ধার চাইলে দেবার সাধ্য নেই।

বামাচরণ রাজীবের দিকে তাকায়। রাজীবও একবার তার দিকে তাকিয়ে তার পুরনো ছেঁড়া কবিতার বইটার পাতা উলটে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকে।

বামাচরণ বলে, আচ্ছা ওবেলায় আসব। এক প্যাকেট সিগারেট দাও আমাকে।

রাখাল বলে, কি সিগারেট চান?

নাম শুনে বলে, এক প্যাকেট সাড়ে আট আনা।

সাড়ে আট আনা দামের একটা সিগারেট প্যাকেট সে মোড়ক খুলে বার করে সামনে ধরে দেয়। আরেকবার বলে, সাড়ে আট আনা।

বামাচরণ বেরিয়ে যায়।

রাজীব হাসিমুখে তাকায়। তারিফ করে বলে, আপনি সত্যি অলরাউণ্ড মানুষ দাদা। এক কথা এক কাজ, ইদিক উদিক নেই। তা, শক্ত মানুষ না হলে কি পারতেন? অমন অবস্থা গেল, জমানো টাকাটি ঠিক রেখে দিয়েছেন। কী করে যে পারলেন ভাই, ভেবে পাই নে। দু হাজার টাকা জমা রয়েছে, ইদিকে দিন চলে না - আমি হলে কবে উড়িয়ে দিতাম।

প্রশংসা শুনে একটু যেন ম্লান গম্ভীর হয়ে আসে রাখালের মুখ। রাজীব ভাবে -না জেনে কিছু অন্যায় কথা বলে ফেললাম না কি রে বাবা। তারপর ভাবে—দুঃখদুর্দশার দিনগুলির কথা ভেবে হয়তো এই ভাবান্তর ঘটেছে রাখালের।

রাজীবের এখন চলছে নিজের দুর্দিন।

ছোটোখাটো এই দোকানটি আবার দিয়েছে বটে রাখালের সঙ্গে, কিন্তু আগের ব্যবসায়ের তুলনায় এ কিছুই নয়।

শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অবস্থা।

নিজের সমস্ত শখ, বাসন্তীর সমস্ত আব্দার, জীবনকে সরস করার নানা উপায় আর উপকরণ, হঠাৎ সব বাতিল করে ছেঁটে ফেলে দিতে হয়েছে। অভ্যস্ত সবিপূর্ণ জীবনটা যেন পরিণত হয়ে গেছে অনভ্যস্ত শূন্য জীবনে।

সর্বাঙ্গে গয়না আঁটা থাকত বাসন্তীর, দামী দামী রঙীন শাড়িই শুধু সে পরত। চেয়ে দেখেই সুখে আনন্দে থই থই করত রাজীবের মন। উঠতে বসতে বাসন্তীর ছিল ঝগড়া আর নালিশ, কথা যেন বলত শুধুই মুখঝামটা দিয়ে। কিন্তু ওটাই ছিল বাসন্তীর আদর সোহাগ আহ্লাদ আব্দারের বিশেষ ধরন, ঝগড়াটে হয়ে থেকেই সে একেবারে জমিয়ে দিত বসিয়ে দিত জীবনটাকে।

পাড়ার মানুষ বলে কুঁদুলে বৌ—তারা কি জানবে সে কেমন কোঁদল, তারা কি বুঝবে রাজীব কেন নিরীহ গোবেচারী সেজে থাকত।

তারা তো হিসাব রাখত না বাসন্তী কখন ঝগড়া করে, কখন করে না। দরকারী কথা বলার সময়, রাজীবের শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে থাকার সময়, নিরালায় আদর সোহাগের সময় ওই ঝগড়াটে মানুষটাই আবার কেমন অন্যরকম মানুষ হয়ে যেত রাজীব ছাড়া কে তা জানবে।

সেই বাসন্তীর গায়ে আজ গয়না নেই—গলায় একটি হার আর হাতে গোনাগাছা কলে চুড়ি। সেই বাসন্তী আজ ঝগড়া করতে ভুলে গেছে!

জীবন যাত্রার আকস্মিক বিপর্যয়ে কেমন থতমত খেয়ে গেছে, শান্ত নির্জীব হয়ে গেছে। রাজীবের জন্য গভীর সহানুভূতিতে যেন চব্বিশ ঘণ্টা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কলহ করা নেই, মান অভিমান নেই, চাপল্য নেই।

দামী শাড়িগুলি আজও পরে। অনেক শাড়ি ব্লাউজ জমানো আছে, কতদিন চলবে। একই জামা-কাপড় জড়ানো সেই একই মানুষ, তার সেই একই রূপ-যৌবন, তবু রাজীব তার দিকে তাকিয়ে আগেকার পুলক অনুভব করতে পারে না। মনে হয়, তার সে বাসন্তী আর নেই

বাসন্তী বদলে গেছে।

বদলে গেছে, কিন্তু তিতোও হয় নি, টকেও যায় নি। মুখ গোমড়া করে থাকে না বাসন্তী, হা-হুতাশ করে না, কখনো তাকে বিরূপ দেখা যায় না রাজীবের উপর। কোঁদল-করা লীলাখেলার উন্মাদনাটুকু বাদ দিয়ে সে ধীর শান্ত হয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, সেজন্য আকর্ষণ যে তার কমেছে রাজীবের কাছে মোটেই তা নয়। আজকাল বরং নতুন ভাবে বেশি করে টানছে বাসন্তী—দাসী রাঁধুনীর মতো তাকে খাটতে দেখে দিনরাত তাকে সোহাগে আদরে ডুবিয়ে রাখবার সাধটা অদম্য হয়ে উঠছে।

এত ভাল লাগছে, নতুন রকম ভাল লাগছে, তাকে আদর করতে!

কিন্তু তবু রাজীব আগের বাসন্তীকেই ফিরে চায়।

নাঃ, উঠে-পড়ে লাগতে হবে আবার, ব্যবসাটা গড়ে তুলতে হবে। লাখপতি হতে চায় না রাজীব, প্রাসাদ চায় না মোটর গাড়ি চায় না—শুধু আগের দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে চায়। বাসন্তীর গায়ে গয়না উঠবে, সতেজ জীবন্ত হয়ে উঠে আবার নানা বায়না ধরবে বাসন্তী, ঝঙ্কার দিয়ে ঝগড়ার ঢঙে আবার সে প্রেমালাপ করবে তার সঙ্গে!

রাখাল তার মনের কথা জানলে নিশ্চয় মনে মনে বলত, এই নাকি প্রেম তোমার কাছে? টাকায় যা খাড়া ছিল, টাকার অভাবে যা ফুরিয়ে গেছে, আবার টাকা হলেই যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে?

রাজীব এসব বোঝে না। রাখালের কাছে টাকা শুধু টাকাই, রাজীবের কাছে তা নয়। টাকা ছাড়া যদি মানুষ বাঁচে না আর সেটা যদি সস্তা না করে দেয় বাঁচাকে, টাকা ছাড়া ভালবাসা না জমলে সেটা খাপছাড়া হয় কিসে, প্রেমকে সেটা ছোট করে দেয় কোন যুক্তিতে?

সব দিকে যার টানাটানি তার জীবনে আনন্দ আসবে কোথা থেকে? দরকার মত যার টাকা নেই তার আবার প্রেম-ভালবাসা, তার আবার বেঁচে থাকার সুখ!

বিড়ির পাতা সুখা তামাকের বস্তায় ভরা ছোট লম্বাটে ঘরখানায় বসে কেনাবেচার অবসরে দুজনের মধ্যে যে এরকম দার্শনিক কথা একেবারেই হয় না তা নয়।

সব মানুষেরই দর্শন আছে, দার্শনিক আলোচনা ছাড়া কোনও মানুষের চলে না। জীবনদর্শন ছাড়া মানুষের জীবন নেই কোন স্তরের। হয়তো সেটা পণ্ডিতদের দর্শন নয় ছাঁকা তত্ত্বের জটিল দর্শন নয়। নিজেরই জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা শিক্ষাদীক্ষা সংস্কারের দর্শন নিজের জীবন আর জগৎটার একটা নিজের বোধগম্য মানে খাড়া করার দর্শন।

রাজীব হয়তো ওই কথাই বলে, টাকা ছাড়া সত্যি সুখ নেই দাদা!

রাখাল হেসে বলে, টাকার সুখ কি আসল সুখ?

: সুখের আবার আসল নকল আছে নাকি? সুখ হল সুখ, অসুখ হল অসুখ!

: ওভাবে ধরলে কথাটা তাই বটে, আমি বলছিলাম মানুষের মনে করার কথা। আসলে যেটা সুখ নয় সেটাকেও মানুষ সুখ ভেবে নেয়। ওটাকেই

বলছিলাম নকল সুখ। আপনি বলছেন টাকার কথা। টাকা থাকলেই কি সুখ হয়?

: তাই কি হয়? একর্কাড়ি টাকা হলে কি একর্কাড়ি সুখ হয়? টাকা হলেও সুখ একদম নাও হতে পারে। তবে কিনা টাকা নইলেও আবার সুখ কিছুতে হবার নয়, সুখের জন্যও টাকাটি চাই। টাকা বাদ দিয়ে উপোস-দেয়া সুখ, সে হল মশাই সাধুসন্নেসীর সুখ।

: আর আপনার আমার সুখ?

: এই ভাত-কাপড় আরাম-বিরাম শান্তি—

: তবেই দেখুন, আপনি সব জড়িয়ে দিচ্ছেন। বাঁচার জন্য ভাত-কাপড় চাই, আরও কতকগুলি ব্যবস্থা চাই। তার মানেই টাকা চাই, টাকা দিয়ে এসব ব্যবস্থা হয়। সুখ-শান্তি এসব তার পরের কথা। আগে বাঁচা চাই ঠিক, নইলে সুখ-শান্তি কিসের? কিন্তু বাঁচবার ব্যবস্থা হলেও কি সুখ-শান্তির ব্যবস্থা হয়? সে হল আলাদা ব্যবস্থা। টাকা চাই স্রেফ বাঁচার জন্য, টাকায় সুখ হয় না।

রাজীব দমে গিয়ে দাড়িতে হাত বুলোয়, তার চোখ মিটমিট করে। এবার সে ধাঁধায় পড়ে গেছে।

রাখাল আবার বলে, সুখ মানেই হল আনন্দ। আনন্দ মানুষকে সৃষ্টি করতে হয়? টাকা দিয়ে কেনার জিনিস নয় ওটা। টাকার অভাবে কি হয়? বাঁচার কষ্ট--জীবনে ওই আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় মানুষের। এই হিসেবে যদি বলেন টাকা ছাড়া সুখ হয় না, তাহলে অবশ্য কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই হিসেবটুকু ভুললে চলবে না, সুখ আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে।

রাজীব বলে, কিন্তু রাখালবাবু, আসলেই যে খটকা বাধছে। কোন অভাব নেই, অশান্তি নেই, রোগ-বালাই নেই,—পাঁচজনকে নিয়ে এরকম বাঁচাটাই তো সুখের, তাতেই তো আনন্দ মানুষের। আনন্দ আবার ভিন্ন করে সৃষ্টি করতে হয়, তার মানে তো বুঝলাম না মশাই। বিশেষ আনন্দ হয়, বড় দরের আনন্দ হয়, সে আলাদা কথা। তার জন্য সাধন ভজন যোগটোগ দরকার হয়। কিন্তু সাধারণ সংসারী মানুষের সাধারণ আনন্দ, দুঃখ কষ্ট রোগ ব্যারাম না থাকলে সে তো আপনা থেকেই জুটবে।

: জুটবে? হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন, তবু সুখ-শান্তি আনন্দ জুটবে? অভাব নেই আপনার একার, যে পাঁচজনকে নিয়ে সংসার, বাইরে যে দশজনের সঙ্গে কারবার, তাদের তো আছে। বাইরের মানুষ কেন, ঘরের মানুষের

সঙ্গে কত বিষয়ে আপনার স্বার্থের মিল নেই। স্বামী-স্ত্রীর পর্যন্ত সব স্বার্থ এক নয়। পাঁচজনের সঙ্গে সামলে-সুমলে সামঞ্জস্য করে আপনাকে চলতে হবে, পাঁচজনকে সুখী করতে হবে, হাসি-খেলার আয়োজন করতে হবে, স্নেহ করতে ভালবাসতে হবে, শত্রুর সাথে লড়তে হবে--আরও কত কি করে তবে না খানিকটা আনন্দ জুটবে আপনার।

এবার রাজীব খুশী হয়ে উঠে।

—হাঁ হাঁ, এটা ঠিক বলছেন ভাই। একেই বলছেন সৃষ্টি করা? তা হলে তো ঠিক আছে কথাটা! এটাকেই তো আমি বাঁচা বলছিলাম। নইলে কলের মত গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচাটা কি আর বাঁচা!

রাখাল অস্বস্তি বোধ করে।

এত সহজে আগাগোড়া বুঝে ফেলার মত সোজা কথা সে বলে নি। তার নিজের কাছেই সবটা স্পষ্ট নয় বলে অস্বস্তি আরও বেশী হয়। এত সহজে স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেল রাজীবের কাছে কথাটা? তার মনে কত সংশয় কত অস্পষ্টতা—রাজীব আঁচ করে ফেলল আসল কথাটা?

রাখাল ধরতে পারে না যে তার সঙ্গে রাজীবের এটাই তফাত—সে সংশয়ী আর রাজীব বিশ্বাসী। সংসারে ধনিত্ব আর দারিদ্র্য—এটাই তো আসলে তাদের কথা বলার মূল কথা! জীবনই তাদের আনন্দ, তার বাড়া আনন্দ আর নেই। বহু জীবনকে দান করে পঙ্গু করে কিছু জীবন এই পূর্ণতা এই সার্থকতা আত্মসাৎ করতে চায়,—মানুষের সুখ বল, আনন্দ বল তার মূল সমস্যা ওইখানেই। নইলে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে মানুষ, আজও এগিয়ে নিয়ে চলেছে -একে বলা যায় জীবনে আনন্দ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এই সত্যের ঝাপটা লেগেছে রাখালের বিশ্লেষণী মনে -সেই ঝলকমারা আলোয় সে মানে খুঁজছে একটি নীড়াশ্রয়ী মানুষের জীবনে আনন্দ আসে কিসে আর কেন।

সংশয়ের জের তাই তার মিটছে না। রাজীবের এসব বালাই নেই। সংঘাত সঙ্কীর্ণতা অসম্পূর্ণতা নিয়ে নীড় বেঁধে ঘর করার যেটুকু আনন্দ তাতেই সে বিশ্বাসী—টাকার অভাবটা না থাকলেই হল!

রাখাল নিজেও ওইটুকুই চায়—যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে বাসন্তীকে নিয়ে সংসার করার—স্বচ্ছলভাবে সংসার করার আনন্দটুকু। কিন্তু সে ভাবে অনেক বড় বড় কথা।

তার চিন্তা আর কাজে, আদর্শ আর জীবনে, সামঞ্জস্য নেই। তাই তার সংশয়ও ঘোচে না!

এখনো ভোরেই বিশুকে পড়াতে যায়।

আগে মাঝে মাঝে খালি দেবতার প্রসাদের ভাগ পেত এ বাড়িতে, আজকাল নিয়মিত চা-জলখাবার জোটে।

আগে চা-জলখাবার দেওয়া হত না তাকে সম্মান করেই। জমিদার-গিন্নী হলেও বিশুর মা হঠাৎ পূর্ববঙ্গের গাঁ থেকে উৎখাত হয়ে শহরে এসেছে, শতাধিক বছরের পুরনো ধারার জের টেনে সেখানে চলছিল জীবন-যাপন,—ক্রিয়াকর্ম ব্রতপূজা গুরুসেবা ইত্যাদি সমেত।

রাখাল উঁচু জাত, ছেলের বিদ্যাদাতা গুরু। ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া তাকে কি আর কিছু খেতে দেওয়া চলে?

গুরুদেব সম্পর্কে বিশুর মা'র সংস্কার ভাঙে নি। তবে সংস্কারটার ডালপালা নতুন জীবনের বাস্তবতা কিছু ছেঁটে ফেলায় ছেলের প্রাইভেট টীচারকে গুরুস্থানীয় করে রাখার বদলে স্নেহ দিয়ে একটু কাছের মানুষ করে ফেলেছে!

ঘরের লোকের চা-জলখাবারের ভাগ তাকে দিতে এখন আর বাধে না বিশুর মা'র।

স্নেহ আর চা-জলখাবার জুটছে রাখালের, আগে যে অসাধারণ শ্রদ্ধা আর সম্মান পেত সেটা ঘুচে গেছে। শুধু বিশুর মা নয়, এ বাড়ির প্রায় সকলের কাছেই।

নির্মলা পর্যন্ত তাকে যেন আর সমীহ করে না।

এই সরলা ও মুখরা ক্ষীণাঙ্গী বিধবা তরুণীটিকে সেদিন পর্যন্ত রাখাল বিশুর মা'র নিজের বোন বলেই জানত। সম্প্রতি জেনেছে যে সে তার জ্যাঠতুতো বোন।

নির্মলা নিজেই তাকে জানিয়েছে। নির্মলাই প্রতিদিন তাকে চা জলখাবার এনে দেয়। একটা মানুষকে জলটুকু খেতে দেওয়া কি ঝি চাকরের মত বাজে মানুষের কাজ?

বিশু সেদিন সেই সময়টাতেই নীচে গিয়েছিল। বিশুকে নীচে দেখেই নির্মলা তাড়াতাড়ি শুধু খাবারটা নিয়ে এসেছিল, নইলে সাধারণত চা আর খাবার সে একসাথেই আনে।

রাখালের সঙ্গে একা কথা বলার জোরালো ঝোঁক আছে নির্মলার।

সরলভাবে সে নিজেই জানিয়েছে রাখালকে যে, নিশ্চিন্ত মনে প্রাণ খুলে কথা কইতে না পেলে কি আলাপ করে সুখ হয়?

নির্মলা বলেছিল, জানেন, এই ঘরবাড়ি জমিদারি সব আমার পাওনের কথা। বিষয় ছিল আমার বাপের, বিশুর বাপের না। কেমন কইরা উইড়া আইয়া জুইড়া বইল অবাক হইয়া ভাবি।

: সতীশবাবুর জমিদারি নয়?

নির্মলা হেসেই আকুল।

: জামাইবাবুর জমিদারি? কী কথা যে কন। জমিদারি ছিল ঠাকুরদার। আমার বাপেরে দিয়া গেছিল, ত্যাজ্য-পুত্র করছিল দিদির বাপেরে। বুঝলেন না?

হঠাৎ শুনে জটিল ব্যাপারটা সত্যি বোঝে নি রাখাল।

: আপনার বাবা—দিদির বাবা—?

: দুই ভাই ছিল। ঠাকুরদাদার দুই পোলা।

রাখাল তবু তাকিয়ে ছিল জিজ্ঞাসুভাবে।

নির্মলা হেসে বলেছিল, আঃ, আপনে তো জানেন না কিছুই। কথাডা কি, আমার বাপ ছিল ঠাকুরদার বড় পোলা, দিদির বাপ ছিল ঠাকুরদার ছোটো পোলা। বুঝলেন না?

: হাঁ, এবার বুঝলাম।

: দিদির বাপ, মানে আমার খুড়া, জোর কইরা কইলকাতা আইছিল। কলেজে পড়ব, বিলাত যাইব, খিষ্টান হইব,—এইসব মতিগতি ছিল দিদির বাপের। লেখাপড়া শিখবা, বিদ্বান হইবা, ঢাকা কলেজে পড় না গিয়া তুমি? তা না, কইলকাতা আইসা পড়নের ঝোঁক চাপল দিদির বাপের। আমার বাপ ঢাকা কলেজে পড়াছিল। দুই-তিন-বার ফেল কইরা আর পড়ে নাই, বাড়িতে আইসা বইয়া ছিল। কাণ্ডটা দ্যাখেন ভাইবা, আমার বাপে বিয়া করছিল আমার মায়ের সতীনরে, পোলাপান হয় নাই কয়েক বছর। ঠাকুরদা খুড়ারে হুকুম দিছিল, তুমি বাড়ি আইসা বিয়া কর। দিদির বাপের কী তেজ। কইয়া পাঠাইল যে বাড়িও ফিরুম না বিয়াও করুম না।

নির্মলার কথা বলার ভঙ্গিটি অতি মনোরম। যাকে বলে চোখে-মুখে কথা কওয়া, কথার সঙ্গে চোখে-মুখে ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে চলা। হাতও কাজে লাগে কিন্তু সেটা হাত নাড়া হয় না, কথার টানের ওঠানামার সঙ্গে সহজ ভঙ্গির মুদ্রা রচনা করে।

কথা বলার চেষ্টা যেন তার ক্ষীণ দেহের একটা আবেগ-ব্যাকুলতারও রূপায়ণ।

শুধু কথা বলার ভঙ্গি নয়, কথার সুরটিও তার মিষ্টি।

তার কথা শুনতে বড় ভাল লাগে রাখালের।

বিশু ফিরে আসার পরেও নির্মলা তার কাহিনী বলে যায়। বিশু গোড়ায় উপস্থিত থাকলে এসব কথা হয়তো সে তুলতই না। কিন্তু এতটা এগিয়ে বিশুর খাতিরে এখন আর মাঝখানে থামতে সে রাজী নয়। বিশু শুনুক, যা খুশ ভাবুক। যদি বলে দেয়, দিক।

নির্মলা গ্রাহ্য করে না।

নির্মলার কাকাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়। বিয়ে করা নিয়ে বাপের সঙ্গে বিবাদ করে ছ-মাসের মধ্যে সেই বিয়েই সে করল, ঢাকার এক সাধারণ উকিলের মেয়েকে। কে জানে এর মধ্যে আরও কি রহস্য ছিল? যাই হোক, বিয়ের এক বছরের মধ্যে জন্মে গেল বিশুর মা। নির্মলার বাবা পর পর তিনবার বিয়ে করেছিল—ছেলেপিলে আর হয় না। শেষে চার বারের বার নির্মলার মাকে বিয়ে করার পর জন্মাল নির্মলা।

বাপের জমিদারি পাওয়া উচিত ছিল নির্মলার কিন্তু ঠাকুরদাদা আর তার বাপ মারা যাবার পর ত্যাজ্যপুত্র খুড়াটি এসে জমিদারি দখল করে বসল। তাকে নাকি ত্যাজ্যপুত্র করা হয় নি, কোন দলিল নেই।

: মুখের কথার মূল্য নাই, না? বাপে কইল তুমি আমার পোলা না তোমারে এক পয়সা দিয়া যামু না। খুড়া কইল, তোমার সম্পত্তি আমার কাছে গোরক্ত, মাতৃরক্ত। সেই মানুষটা দিব্যি উইড়া আইসা জুইড়া বইল জমিদারি, তারে যে বাপ ত্যাগ করছিল তার দলিল নাই।

সাদাসিদে বাস্তব কাহিনীর মধ্যে যেন পুরাণের আমেজ মেলে। মধ্যযুগের জীবনধারার জের টেনে চলেছে মানুষ আজকের দিনেও। এত যে ওলট পালট হয়ে গেল জগতে, এক রাষ্ট্রে জমিদারি ফেলে আরেক রাষ্ট্রে পালিয়ে এল সতীশ, তবু সে রয়ে গেল জমিদার। সেই যে কবে চাষীর মাটিতে কামড় দিয়েছিল জমিদার, প্রলয় ঘটে গেলেও সে কামড় যেন আলগা হবার নয়।

বাড়িতে ঢুকবার সময় বাইরের রোয়াকে দুজন প্রৌঢ়-বয়সী মুসলমানকে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখেছিল রাখাল,—একজন খেলো হুঁকোয় টানছিল তামাক। দেখলেই বোঝা যায় সতীশের চাষী প্রজা, কাল পাকিস্তান থেকে এসেছে, রাত্রে এ বাড়িতেই ছিল। মাঝে মাঝে এরকম দু-একজন চাষীকে এসে

দু-একদিন থাকতে দেখা যায়। বাইরের ঘরে ওদের শোয়ার জন্য পৃথক তক্তপোশের ব্যবস্থা আছে।

খাওয়ার জন্য পৃথক থালা-বাসনের ব্যবস্থা আছে, খাওয়ার পর নিজেরাই ধুয়ে-মেজে সাফ করে রাখে।

কোথায় সেই জমিদারি—জমিদার এসে আস্তানা গেড়েছে কোথায়। কে জানে এখানে বসে সে কী করে চালাবে জমিদারি, কী করে ভোগ করবে অন্যে যে জমি চাষ করে তার পুরুষানুক্রমে পাওয়া স্বত্ব।

দোতলার ঠাকুরঘরেই আজও সে বিশুকে পড়ায়। প্রতি পূর্ণিমার বিশেষ পূজার দিন বিশুর মা'র শোবার ঘরে পড়াবার ব্যবস্থা হত, যে সুযোগে রাখাল বিশুর মা'র গয়না কখানা সরাতে পেরেছিল। সে ব্যবস্থা রহিত হয়ে গেছে।

পূর্ণিমা তিথিতে ছাত্রকে আর তার পড়াতেই হয় না রাখালকে বলে দেওয়া হয়েছে, ঐদিন তার ছুটি।

বিশুর মা'র শোবার ঘরের বন্ধ দরজায় আজকাল তালা ঝুলতে দেখা যায়।

কে জানে কতদিন পরে বিশুর মা টের পেয়েছিল যে তার কখানা গয়না কমে গেছে। একদিন হঠাৎ তার শোবার ঘরের দরজায় তালা দেখে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল রাখালের।

প্রতি পূর্ণিমায় তার ছুটি। বিশুর মা'র ঘরের দরজায় তালা!

বিশুর মা কি জেনেছে যে গুরুর মত শ্রদ্ধেয় বিদ্যাদাতা রাখাল নিয়েছে গয়না কটা?

কিন্তু দিন যায়, কিছুই বোঝা যায় না। কারো কাছে আকারে ইঙ্গিতেও শোনা যায় না যে বিশুর মা'র ঘর থেকে রহস্যজনক ভাবে দু হাজারেরও বেশী টাকা দামের সোনার গয়না উধাও হয়ে গেছে।

বিশুর মা'র কথা আর ব্যবহার থেকেও কিছু টের পাওয়া যায় না।

ব্যবহার খানিকটা বদলে গেছে বিশুর মা'র। কিন্তু একজন গয়না চুরি করেছে সন্দেহ জাগলে কথার ব্যবহারের যেরকম পরিবর্তন হওয়া উচিত, মোটেই সেরকম নয়। বরাবরই বিশুর মা'র কথায় ব্যবহারে প্রকাশ পেত স্নেহের ভাব, আগে তারই মধ্যে থাকত একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব, ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ না করার সংযম।

এটাই শুধু অন্তর্হিত হয়েছে।

তার মুখ শুকনো দেখলে আগে বিশুর মা বলত, তোমারে কান কাহিল দেখায় বাবা?

আজকাল সে উদ্বেগের সঙ্গে বলে, রাখাল! মুখ শুকনা যে? অসুখ করছে না কি?

আগে শুধু উপর উপর জিজ্ঞাসা করত রাখালের ঘর-সংসার আপন জনের কথা। আজকাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেয়।

নিজের হাতে তৈরি করা পিঠা পায়েস খেতে দিয়ে সামনে বসে তার নতুন ব্যবসা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে খুঁটিনাটি এত কথা জেনে নেয় যে তার শতাংশ জানবার আগ্রহ সাধনার দেখা যায় নি।

ব্যবসায় কত টাকা লাগিয়েছে এবং টাকা কোথায় পেয়েছে, শুধু এই কথাটা স ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না।

অন্য সব কথা শুনে বলে, বেশ করেছ রাখাল। লক্ষ্মী সাইধা ঘরে আসেন না, সেনারে আনন লাগে।

চিন্তিত ও গম্ভীর দেখায় বিশুর মা কে। খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আনমনে বলে, লক্ষ্মীর আবার যাওনের মন হইলে ঠেকান দায়। আমাগো দ্যাখো না? সব ফেইলা থুইয়া চইলা আইলাম। আদায় পত্র নাই, টাকা আনানের হাঙ্গামা, প্রজাগো মতিগতি বিগড়াইয়া গেছে

হঠাৎ নিজের কথা বন্ধ করে বিশুর মা ডাকে, নির্মলা? রাখালেরে আরেকটু পায়েস দিয়া যা।

পায়েসে থাকে সিদ্ধ-করা চাল-ডিনগটা এঁটো। ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া বা ক কিছু দেওয়া যেত না আজ তাকে বিশুর মা যত্ন করে নিজের হাতে রাঁধা পায়েস খাওয়ায়!

শুধু তাই নয়। জিজ্ঞাসা করে, আমার রাঁধা পায়েস বৌমা খাইব না?

: কেন খাবে না। আমি তো খেলাম?

বিশুর মা হাসে।—তুমি ব্যাটাছেলে, মাইয়ালোকের বাছবিচার বেশী থাকে না?

বিশুর মা কি জেনেও চুপ করে আছে? তুচ্ছ করে বাতিল করে দিয়েছে তার গয়না চুরির অপরাধ? সন্দেহ হলেও জোর করে মন থেকে দূর করে দিয়েছে সন্দেহটা?

শুধু সন্দেহ করে অবশ্য মুখে কিছু বলা যায় না সোজাসুজি। কিন্তু এরকম আত্মীয়ের মত সুমিষ্ট ব্যবহার কি করা যায় আর সেই মানুষটার সঙ্গে? কথা বলার বদলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকতে সাধ যায় না?

ছেলের মাইনে-করা মাস্টার। ইচ্ছা হয় না তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিতে ? ।

অথবা সত্যই বিশুর মা তাকে মনেপ্রাণে এতখানি স্নেহ করে বসেছে যে প্রাণঘাতী অভাবের তাড়নায় সে যা করে ফেলেছে সেটা তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে ? সামান্য গয়না যা গেছে সে তো আর ফিরবে না, লজ্জা দিয়ে তাকে দমিয়ে দিলে লাভ হবে না, তার চেয়ে সে সামলে-সুমলে উঠুক—একটা অপরাধ করে ফেলেছে বলেই নিজেকে অমানুষ ভেবে সে যেন তলিয়ে না যায় ?

অথবা খটকা যা কিছু সব তার নিজের মনের ? পূর্ণিমার দিন পূজার সমারোহ হয় শুধু এই জন্যই তাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, গয়না হারিয়ে গিয়েছে বলেই শুধু সাবধান হবার জন্য ঘরের দরজায় তালা পড়েছে, গয়না হারানোর ব্যাপারে তার সম্পর্কে কিছুই ভাবে নি বিশুর মা ?

সেটা অসম্ভব নয়। কবে কখন কিভাবে গয়না কটা গেছে বিশুর মা টের পায় নি। একদিন কিছুদিনের জন্য সে শোবার ঘরে একলা বসে ছিল, শুধু এই জন্য তাকে সন্দেহ করার কথা হয়তো কল্পনাও করতে পারে না বিশুর মা।

রাখাল বাজারে যায়। বাজারটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই দোকানে চলে যাবে।

বাড়ি ফিরতে সাধনা বলে, তোমার বিশুর মা একবাটি পায়েস, এই এত পিঠে আর একখানা কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে।

বেশ ভাল একখানা রঙীন শাড়ি। দেখে কিন্তু খুশী হতে পারে না রাখাল।

এই একখানা শাড়ি দিতে মরবে না বিশুর মা। যাকে স্নেহ করে তার বৌকে এরকম দশখানা শাড়িও দিতে পারে। কিন্তু এ তো শুধু একটা দুর্বলতার নমুনা। অনেককে স্নেহ করে অনেককে দরাজ হাতে দান করার যে স্বভাব জমিদার-গিন্নী বিশুর মা'র ছিল, এ শুধু এখনো সেটা বজায় থাকার নমুনা। জমিদারি ফেলে পালিয়ে এসেও সবদিকে বিরাট চাল বজায় রেখে চলেছে বিশুর মা। বেহিসাবী অর্থহীন চাল—শুধু জের টানা।

সাধনা বলে, ছেলের মাস্টার, তাকে এত খাতির !

রাখাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সে চটে যায়। বলে, যা তা বোলো না। খাতির আবার কি ? উনি আমায় মায়ের মত স্নেহ করেন।

সাধনা আশ্চর্য হয়, আহত হয়। তারপর সেও রাগ করে।

বলে, বড়লোকের শখের স্নেহ! আমি এ কাপড় নেব না। তোমার মনিব-গিন্নীর কাপড় তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

রাখাল গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি না নাও, আমি নেব। লুঙ্গি করে পরব।

: জানিয়ে দিও আমি কাপড় নিই নি।

: তোমার দরকার থাকলে তুমি জানিয়ে দিও।

খুব তাড়াতাড়িই রাগটা পড়ে যায় সাধনার। স্নান করে রাখাল বেরিয়ে যাবার আগেই। গা মুছে ঘরে এসে রাখাল দেখতে পায়, শাড়িখানা পরে সাধনা দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় দেখবার চেষ্টা করছে তাকে কেমন মানিয়েছে।

সাধনা একটা বড়ো আয়না চেয়েছিল। মানুষ-প্রমাণ আয়না, যার সামনে দাঁড়ালে চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়।

—তুমি আমাকে দেখছ—আগাগোড়া দেখছ। তুমি কী দেখছ আমি সবটা দেখতে পাই নে। শুধু মুখটা দেখি, ঘাড়টা দেখি, কোনরকমে চুলটা বাঁধি।

: নিজেকে দেখে করবে কী?

: তুমি কী দেখ সেটা দেখব। দাও না একটা বড় আয়না কিনে?

বেশী দিনের কথা নয়। খোকা যখন জন্ম নেবার প্রথম নোটিশ জানিয়েছে ইঙ্গিতে।

ওরকম আয়না একটা কিনে দিত রাখাল। কী ভাগ্য, ঘটনাচক্রে কেনা হয় নি। তখনকার সেই সুগঠিতা সুললিতা রূপলাবণ্যময়ী সাধনা এই ক-বছরে রোগা হয়ে কালচে মেরে লাবণ্য হারিয়ে কী দাঁড়িয়েছে সেটা শুধু সে-ই চোখ দিয়ে দেখছে তাই ভাল। তার সহ্য হয়।

বড় আয়নায় আগে নিজেকে নিজের চোখে দেখে রাখলে আজ সেই আয়নায় নিজেকে দেখে সাধনা নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত।

: তুমি পায়েস খাবে না?

: একপেট খেয়ে এসেছি।

: এত পায়েস কী করব! নষ্ট করার চেয়ে বিলিয়ে দেওয়াই ভাল! খোকাকে একটু ধরবে পাঁচ মিনিট?

: দেরি কোরো না কিন্তু।

সাধনা হাসিমুখেই বলে, কেন, আপিস আছে নাকি তোমার!

মুখে তার হাসি দেখতে পায় বলেই অগত্যা রাখাল চুপ করে থাকে, নইলে হয়তো রাগের চোটে আবার একটা কড়া কথা বলে বসত।

তার দোকান সম্পর্কে সাধনার অবজ্ঞা আর উদাসীনতা মাঝে মাঝে গায়ে

তার জ্বালা ধরিয়ে দেয়। কারবারের জন্য কি ভাবে টাকা যোগাড় করছে সেটা না হয় নাই জানল সাধনা। এই দোকানের কল্যাণে বীভৎস দারিদ্র্যের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছে, এটা কি খেয়াল থাকে না তার? এমন অনায়াসে অবজ্ঞাভরে বলতে পারে যে দোকানে যাবে সেজন্য আবার তাড়া কিসের?

হয়তো দোকানের মূল্য আছে সাধনার কাছে, তার দোকানে যাওয়া না যাওয়ার বিশেষ গুরুত্ব নেই। রাজীব দোকান চালায় রাজীব সব করে—তার দোকানে যাওয়াটা নিছক শখের ব্যাপার। তার গেলেও চলে না গেলেও চলে।

এটা ভাবলে জ্বালা আরও বেশী হয় রাখালের। সেই সঙ্গে বোধ করে একটা খাপছাড়া ভোঁতা বেদনার পীড়ন। চাকরি আর মাস্টারি করা ছাড়া সাধনা তার আর কোন যোগ্যতায় বিশ্বাস করে না বলে নয়, সাধনার কাছে শ্রদ্ধা পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নই তার মনে আসে না। এ শুধু মানসিক বেদনা বোধ, শোক দুঃখ আতঙ্কের মতই বাস্তব কিন্তু চিনে জেনে নেবার মত স্পষ্ট নয়।

নিজের জন্য খানিকটা পায়েস তুলে রেখে সাধনা পায়েসের বাটিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময়ে তাকিয়ে যায় আশার দিকে।

ভাত চড়িয়ে আশা তরকারি কুটছিল, সঞ্জীবকে তার আপিসের ভাত রেঁধে দিতে হয়। কত সমারোহ ছিল তার রান্নার, সে সব আজ চুলোয় গেছে। ধার করে করে সঞ্জীব তাকে আরামে বিলাসে রেখেছিল, আজ সে নিরাভরণা হয়ে দিন কাটায়, একটার বেশী তরকারি রাঁধে না।

মাছ খায় একবেলা, সপ্তাহে একদিন কি দুদিন!

আশাকে পায়েসের ভাগ দিতে ইচ্ছা হয় সাধনার কিন্তু সাহস পায় না। আশা হয়তো অপমান বোধ করবে।

পুকুরপাড় ঘুরে সাধনা যায় উদ্বাস্তু কলোনিতে। আজকাল ওখানে যাতায়াত তার বেড়েছে। দুর্গার নতুন সংসারটা দেখার আগ্রহটাই তার সবচেয়ে প্রবল। পাঁচশ টাকায় পার-করা মেয়ে, তারই কাছে ভোলার মা'র মাকড়ি বাঁধা রেখে যোগাড় করা পাঁচশ টাকা।

আজও ভোলার মা মাকড়িটা ছাড়িয়ে নিতে পারে নি।

দুর্গা বলে, আসেন দিদি, বসেন।

পায়েস দেখে বলে, ওমা! নিজের হাতে পায়েস আনছেন? আমারে কেন ডাইকা পাঠাইলেন না দিদি, গিয়া নিয়া আইতাম।

: তাতে কি, আমি নিয়ে এলে দোষ আছে কিছু?

: না না, দোষের কথা কই নাই।

বিয়ের পরেও দুর্গার চুলের আধা রুক্ষতা অদৃশ্য হয় নি। নিরুপায় নিরাশ্রয় এক মানুষের মেয়ে পঁচিশ টাকার বিয়ের অনুষ্ঠানের মারফত এসেছে আরেক নিরুপায় মানুষের ঘরে, একরাশি চুলে তেলের কমনীয়তা সে কোথা থেকে কী দিয়ে কেমন করে আনবে! সাধনা ভুলে যায় নি। ভুলে যায় নি যে বাগানের একারণেই তার চুলেও ক্রমে ক্রমে রুক্ষতা এনে দিচ্ছিল রান্না করার জন্য মাথায় দেওয়ার দুটো তেলের শিশিই খালি দেখে তাকে তখন হিসাব করে দেখতে হত কোন তেলটা আনতে দেবে।

মুখের শুকনো ভাবও ঘোচে নি দুর্গার। মনের আনন্দ আর স্বাস্থ্য দিয়ে বুঝি এ শুকনো ভাব ঢাকা পড়বারও নয়, আসল বাস্তব অভাবের এটা সৃষ্টি। তবে শুকনো মুখেও তার ঘনিয়ে আছে একটা সুখের উত্তেজনা, চাউনি হয়েছে আরও ঘন ও গভীর।

সাধনা জিজ্ঞাসা করে বিষ্ণু ঘরে নেই?

: ওই ব্যাপারে গেছে।

ব্যাপার জানে সাধনা এই জমি থেকে ছোটো কলোনিটা উৎখাত করার একটা অপচেষ্টা চলছে। জমিটা প্রভাত সরকারের। তার প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়িটার গা ঘেঁষে বহুকাল জঙ্গল হয়ে পড়ে ছিল জমিটা, কোনদিন তার কোন কাজেই লাগে নি। সামান্য কিছু খাজনার বিনিময়ে আশ্রয়হীন মানুষকে এ জঙ্গল সাফ করে কাঁচা ঘর তুলে বাস করতে দেবার প্রস্তাব সে খুশী হয়েই গ্রহণ করেছিল। কিছু মাইল তফাতে নাগদের মাঠে জোগলার ধারের যে প্রকাণ্ড কলোনিটা গড়ে উঠেছে, সেখানকার বাসিন্দাদের নিজেদের সমিতি আর স্থানীয় উদ্বাস্তু সমিতি মিলিতভাবে প্রস্তাবটা দিয়েছিল। ওই কলোনির বাড়তি লোক আর নবাগত কয়েকটি পরিবার এখানে এই ছোটো কলোনিটি গড়েছে।

জঙ্গল-ঢাকা পোড়ো অব্যবহার্য জমিটাকে চোখের সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ছোটো ছোটো ঘর উঠে ছবির মত রূপ নিতে দেখে প্রভাতের মাথায় কে জানে কী এক নতুন পরিকল্পনা এসেছে জমিটাকে অন্য কাজে লাগাবার, এখন সে কলোনির বাসিন্দাদের তুলে দিতে চায়। অনেকটা দূরে, শহরতলীর প্রায় শেষপ্রান্তে আর একখণ্ড জমি সে এদের দেবে, নিজের খরচে ঘরগুলি সেখানে সরিয়ে দেবে।

সে জায়গাটা ভাল নয়। জমিটা রাস্তার ধারেই বটে এবং রাস্তার এধারে কয়েকখানা ঘরবাড়িও আছে, কিন্তু জমিটা শুধু নীচু মাঠ আর জলা, খানিক তফাতে রেল লাইন।

কলোনির লোকেরা ওখানে উঠে যেতে রাজী হয় নি।

এই নিয়ে একটা গোলমাল চলেছে।

দুর্গার সঙ্গে কথা কইতে কইতে কলোনির নানাবয়সী কয়েকটি মেয়ে বৌ এসে দাঁড়ায়। এদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সাধনার পরিচয় ঘটেছে।

সকলের সঙ্গে সে আলাপ করে। ভুবনের বৌ রাজু প্রায় সমবয়সী, তার কাছে খবর নেয় ভুবনের কাজ হয়েছে কি না। দীনেশের বাট বছরের বুড়ী মাকে জিজ্ঞাসা করে, দীনেশের বৌ পদ্মর জ্বর কমেছে কি না। তেরো বছরের তুলসীর কাছে জেনে নেয়, তার মা কী করছে। এই সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে করতে উঠে পড়ে কলোনি থেকে তাদের তাড়াবার চেষ্টার কথা।

দীনেশের বুড়ী মা বলে, আমাগো মইরাও শান্তি নাই!

সাধনা বলে, সত্যি, এ কি অন্যায় জুলুম!

এদের সঙ্গে সুখদুঃখের কথায় মেতে গিয়ে সাধনা ভুলে যায় যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরবে বলে সে রাখালের কাছে ছেলেকে রেখে এসেছে।

আধ ঘণ্টারও বেশী দেরি হয়ে যায় তার বাড়ি ফিরতে।

বাড়ি ফিরে দেখে, তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বাসন্তী গল্প করছে শোভার সঙ্গে, রাখাল বেরিয়ে গিয়েছে।

বাসন্তী বলে, বাঃ ভাই, বেশ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? যা রাগটা রেগেছে তোমার কত্তাটি!

: ছি ছি, কথা কইতে কইতে একেবারে ভুলে গিয়েছি!

: বেশ করেছ। রোয়াকে বসে গম ঝাড়ছি, মুখ অন্ধকার করে রাখালবাবু তোমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে হাজির। গম ঝাড়ছি দেখে বললেন, ও, আপনিও কাজে ব্যস্ত! আমি বললাম, এ কাজ দুঘণ্টা বাদে করলেও চলবে, ওবেলা করলেও চলবে, কি বলবেন বলুন না? বললেন তোমার কথা—আসছি বলে ছেলেকে গছিয়ে তুমি নাকি ভেগেছ, উনি বেরোতে পারছেন না। আমি বললাম, আমার কাছে রেখে যান না খোকাকে? বললে তুমি বিশ্বেস করবে না ভাই, ছেলেটাকে দড়াম করে রোয়াকে বসিয়ে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। আমিই যেন অপরাধ করেছি! খোকা বেচারা কেঁদে যায় আর কি, কত কষ্টে যে ঠাণ্ডা করেছি তোমার ছেলেকে।

বসিয়ে বসিয়ে কথা কইতে বড় ভালবাসে বাসন্তী। কথা বলার এমন একটা নাটকীয় উপলক্ষ পেয়ে তার যেন খুশীর সীমা নেই। এতক্ষণ বোধ হয়

সবিস্তারে শোতার কাছে বিবরণ দিচ্ছিল, সাধনা এসে পড়ায় আরেকবার বলার সুযোগ পেয়েছে।

পরনে তার বেনারসী, জর্জেটের ব্লাউজ। দেয়ালের ওপাশ থেকে একই বাড়ির একদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আর একদিকের দরজা দিয়ে এপাশে আসবার জন্য সে বেনারসী শাড়ি আর জর্জেটের ব্লাউজ পরে নি, এই দামি জামা কাপড়ে রানী সেজেই সে কুলো দিয়ে রেশনের গম ঝাড়ছিল।

রাজীবের জেল ঠেকাতে আর নতুন করে ব্যবসা গড়ে তুলতে সে শুধু জমানো টাকা আর গায়ের গয়নাই দেয় নি, তার জন্য কাপড় কেনা নিষেধ করে হুকুম জারি করেছে।

দামি দামি ভাল ভাল শাড়ি জমেছে অনেক, সর্বদা পরে পরে সেগুলি সে ছিঁড়ছে। অসময়ে তার জন্য কম দামি কাপড় কেনার পয়সা খরচ করারও দরকার নেই রাজীবের।

বলে, দু-বছর চালিয়ে দেব।

রাজীবের জন্য নিজের স্বামীর জন্য। দেশ জুড়ে কাপড়ের হাহাকারের জন্য যদি তার এই সিদ্ধান্ত হত যে যারা উলঙ্গিনী হতে বসেছে তারা যতদিন কাপড় না পায় আমি একখানা কাপড়ও কিনব না, তাঁদের রঙবেরঙের শাড়ি থেকে জর্জেট বেনারসী পর্যন্ত জমানো শাড়িগুলি আটপৌরে কাপড়ের মত ঘরে পরে ছিঁড়ে প্রায়শ্চিত্ত করব এতদিন কাপড়-চোরদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য।

সাধনা ভাবে, এসব কথা কি উঁকিও মারে না বাসন্তীর মনে?

সাধনা কিনা সন্ত সন্ত ঘুরে এসেছে উদ্বাস্তু কলোনি থেকে, নিজের চোখে দেখে এসেছে মেয়েরা সেখানে কী দিয়ে কী ভাবে লজ্জা নিবারণ করছে, জেনে এসেছে মালতী কেন আজ তিনদিন ঘর থেকে বার হতে পারে না—বেনারসী পরা বাসন্তীকে দেখে কথাটা তাই তার জোরের সঙ্গে মনে পড়ে। স্বামীর জন্য—বিপদগ্রস্ত স্বামী যাতে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সামলে-সুমলে নিতে পারে, আবার ফিরিয়ে আনতে পারে সোনার গয়না আর জর্জেট বেনারসী কিনে দেবার সামর্থ্য—বাসন্তীর পণ শুধু এই জন্য।

মোটাসোটা আঁটোসাটো ফরসা সুন্দরী স্বামী-সোহাগিনী বৌ। স্বামী বই সে জানে না।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টারও বেশী দেরি করে ফেলায় নিজেকে সত্যই অপরাধিনী মনে করে দ্রুতপদে সসঙ্কোচে সাধনা বাড়ি ফিরেছিল। ভাববার চেষ্টাও করেছিল কী ভাবে কী বলে ক্রুদ্ধ রাখালের কাছে কৈফিয়ত দেবে।

বাসন্তীর কাছে রাখালের কীর্তিকাহিনী শুনতে শুনতে তার মুখে মেঘ নেমে আসে।

তবু সে চুপ করে থাকে।

তার চুপ করে থাকা আর তার মুখের কঠিন ভাব ভড়কে দেয় বাসন্তীকে। সে একটু শ স্কিত ভাবেই দরদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এরকম কি করতে আছে ভাই? কিছু হয়েছে নাকি? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য ভাবনা নেই। যতই রাগ হয়ে থাক, ফিরে আসতে আসতে রাগ অনেকটা জুড়িয়ে যাবে। যা ঘটেছিল বললেই তখন মিটে যাবে ব্যাপার। বরং উলটো তুমিই ভাই এক হাত নিতে পারবে মানুষটাকে, বলতে পারবে, এখুনি আসবি বলে গেলাম আর ফিরলাম না, একবারটি দেখতে হয় তো বিপদে আপদে পড়েছি নাকি, কি হল আমার? ডাকাতে ব্যাঙ্ক লুঠছে, একটা মেয়েছেলেকে একলা পেয়ে—

: তুমি আর পেনিও না। দিনের বেলা দশজনের মধ্যে কি আবার হবে? কলোনির ওদের সাথে কথা কইতে কইতে দেরি হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে, কি করা যাবে। তাই বলে এ রকম গালাগালি করবে! আমি শুধু ছেলে আগলে থাকব, আমার অধিকার নেই আধঘণ্টা বাইরে থাকার? চাকরি তো নয়, দোকানে যাবে। একটু দেরি করে দোকানে গেলে কি পৃথিবী রসাতলে যেত? ভারি তো বিড়ির দোকান!

সাপের ফণা তোলার মত মুখ উঁচু করে বাসন্তী বলে, ছি, ভাই, ছি! যার থেকে ভাতকাপড় তাকেই তুমি অমন তাচ্ছিল্য কর! বিড়ির দোকান বলে তোমার ঘেন্না! আমি তো বিড়িওয়ালার বৌ, আমায় তবে নিশ্চয় ঘেন্না কর!

সাধনা বিপাকে পড়ে নরম সুরে বলে, আমি তাই বলেছি? তোমার সব উলটো মানে। আপিস তো নয়, নিজেদের দোকান, আধঘণ্টা দেরি করে গেলে কি হয়! আমি যে এদিকে খেটে মরছি, আমার ছুটি চাই না? আমি আধঘণ্টা ছুটি নিলেই দোষ?

বাসন্তী গালে হাত দেয়। তুমি থেকে একেবারে তুই-এ নেমে আসে। বলে, ছুটি নিয়েছিস? ছুটি? তার নিজের সোয়ামী, নিজের ঘরসংসার, তোরি সব, তুই আবার ছুটি নিবি কার কাছে?

সাধনা একটু হাসে, তা বৈকি, আমারি সব, আমিই হর্তাকর্তা বিধাতা। আধঘণ্টা হাওয়া খেতে গেলে তাই মেজাজে আগুন ধরে যায়।

: হাওয়া খেতে গেছিলি? বলে গেছিলি, আমি আধঘণ্টা হাওয়া খেতে

গেলাম? কাজে বেরোবে মানুষটা, একটু ধরো বলে ছেলেকে চাপিয়ে দিয়ে গেলি উধাও হয়ে! রাগ তো করবেই মানুষটা, একশোবার করবে। নিজেই তো বুঝিস রাগ করবে। নিজেই তো তুই ইচ্ছে করে রাগিয়েছিস।

বলতে বলতে আবেগে উত্তেজনায় থমথম করে বাসন্তীর মুখ। এ পর্যন্ত কখনো সাধনা তার এরকম ভাবান্তর ঘটতে দেখে নি। কড়া সুরে বাসন্তী বলে, ওই এক ধুয়া উঠেছে শুনি, আমরা নাকি দাসী বাঁদী। যতই সুখে রাখুক সোহাগ করুক, আসলে আমরা চাকরানী। ওনারাই কর্তা, মালিক, খুশি হল মাথায় রাখেন খুশি হলে পায়ের নীচে মাড়ান। এমনি হই বা না হই, আসল দাসী বাঁদী। এ আসল আবার কিরে বাবা! বেশ তো, দাসী হলে দাসী, বাঁদী হ'ল বাঁদী—তাই যদি নীতি হয় সংসারের, তাই সই! তা নিয়ে মাথায় ঘা করে আর করছি কি? কিন্তু সব নাকি ওনাদের খুশিতে হয়! আমরা কিনা পুতুল, ওনাদের হুকুমে উঠি বসি, খুশি অখুশি খাটাই না মোটে। এমন ছিষ্টিছাড়া ইস্তিরি তো সংসারে দেখি নি ভাই। সবাই আমরা খুশি খাটাই, কর্তালি করি। আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের কায়দায় আমরা জোর খাটাই।

আশার দিকে চেয়ে বাসন্তী লজ্জার সঙ্গে হাসে, আশাদি চুপ করে শুনছেন, আমি বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম।

আশা সত্যই এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি।

আগেও সে কম কথা বলত, বেকারের বৌ সাধনার সঙ্গে এক রকম ভালো মন্দ কোন কথাই বলত না। তার এই অবজ্ঞায় কি ভাবেই যে মাঝে মাঝে জ্বলে যেত সাধনার গা, এমন একটা উগ্র ইচ্ছা জাগত গায়ে পড়ে আশাকে অপমান করবার।

কিন্তু সে আশা আর নেই।

এখন সে মনের দুঃখে চুপচাপ থাকে এটা জানা থাকায় তার নীরবতায় কেউ ক্ষুণ্ণ হয় না। আগে সে চলত দূরত্ব বজায় রেখে, আজকাল নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে।

বাসন্তীর কথা শুনে আশা বলে, আপনার কথা শুনতে বেশ লাগে।

: খুব বকবক করি, না?

: তাতে কি, প্যানপ্যান তো করেন না। একজন কম একজন বেশী কথা কইবে, তাই তো উচিত।

সাধনা ভাবে, এতই সামান্য কি তফাতটা? হুড়মুড় করে দুদিন এসে ঘাড়ে চেপেছে দুজনেরি, বাসন্তী বরং অভাবে পড়েছে আশার চেয়ে অনেক ভাল অবস্থা

থেকে। বাসন্তী কাতর হয় নি, খানিকটা সামলে নিয়েছে। সে ভুলতে পারে, হাসতে পারে, বকবক করতে পারে। আশা যেন কাবু হয়ে পড়েছে একেবারে, মনের জোরে সর্বদা নিজেকে তার খাড়া রাখতে হয়।

সে নিজে? তার যখন ছিল দুর্দশা, এরা দুজন ছিল সুখে। আজ এদের অবস্থা গেছে বদলে, তার শেষ হয়েছে অসহ্য অভাবের দিন। নিজে সে বদলায় নি?

বর্ষা আসা-আসি করছে।

তবে বাঁচা যায়। গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে মানুষের।

প্রতিবারই মনে হয়, এবারের গরম বুঝি আর সয় না। কিন্তু সেন শুধু কথা নিয়ে বলার মত বাড়িয়ে মনে হওয়া। কে না জানে যে গরম প্রতিবারই অসহ্য মনে হয় কিন্তু দিব্যি সয়ে যায় মানুষের ফ্যানের বদলে যাদের শুধু ভাগে হাত-পাখা সম্বল, তাদের আরও সহজে।

এবার কিন্তু সত্যই অসহ্য হয়েছে। নতুন রকম, ভীষণ রকম গরম পড়েছে বলে নয়, জীবনটাই অনেক নতুন আর বাড়তি শোষণে সহ্য শক্তিতে ভাঁটা পড়িয়ে দিয়েছে বলে। বেঁচে থাকাটাই এমন ভয়ানক কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে গরমের কষ্টটা মনে হচ্ছে প্রকৃতির একটা অসহ্য অত্যাচারের মত!

গরমকে এয়ার কণ্ডিশনড্ করার স্বাদটা এ পাড়ার কয়েক জনের চোখে দেখা আছে। কয়েকটা সিনেমায় বাস্তবকে মার্কিনী আর খানিকটা ব্রিটিশ ধরনে উড়িয়ে দেবার প্রচারের সঙ্গে ঘণ্টা দুই গরম দেশে গরম কালে সর্বাঙ্গীণ শীতলতা ভোগ করতে দেওয়া হয়।

সাধনা বাসন্তী বা আশারা কেন, বাসন্তীর ঝি বকুল পর্যন্ত অনেকবার এ ঠাণ্ডা সহ্য করেছে।

ঝির কোলে মেয়েকে দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে পাশে বসিয়ে বাসন্তী সিনেমা দেখত। যাত্রা থিয়েটার দেখতে যাবার স্বদেশী সেকেলে ফ্যাশনকে সে বিদেশী সিনেমায় যাওয়া পর্যন্ত টেনে এনেছিল।

এখন অবশ্য সে সিনেমার নেশা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে বকুলকেও ছাড়িয়ে দিয়েছে।

দুঃখের দিনে সিনেমায় গিয়ে দু দণ্ড দুঃখ ভুলে থাকা যায়, অভাবের অনেক জ্বালা থেকে একটু রেহাই পাবার জন্য গরিবেরাই বেশী 'সিনেমা ছাখে' -এসব কথার মানে বোঝে না বাসন্তী। কেনরে বাবা, এত খাতির করা কেন দুঃখকে? আনন্দ করার জন্য নয়, দুঃখকে একটু এড়িয়ে যাবার জন্য সিনেমায় যেতে হবে?

সিনেমা ছাড়ার চেয়ে বকুলকে ছাড়তেই বরং তার কষ্ট হয়েছে ঢের বেশী।

বকুল কেঁদেকেটে অনর্থ করে বলেছিল, মোকেও শেষে ছাঁটাই করলে মা? এত বছর খাটছি তোমার সংসারে?

বাসন্তীও কেঁদে ফেলেছিল। -আমরাও যে ছাঁটাই হয়েছি বাছা? তোকে পুষব কী করে? মাসে তুই দু-বার তিনবার মাইনে নিয়েছিস, একবার দেবার সাধ্যি যে আমার ঘুচে গেছে লো হারামজাদি। আমি এক টুকরো মাছ খেলে তুই দু টুকরো খেতিস, আমায় যে ডাল দিয়ে ডালের বড়া দিয়ে চালাতে হচ্ছে মা?

: কেঁদো নি মা। পায় পড়ি তোমার? ঝাঁটা মেরে দূর করে দাও মোকে, তুমি কেঁদো নি। আচ্ছা মা, এমন ছিষ্টিছাড়া অঘটন কেমন করে ঘটে বল দিকিন, কে ঘটাল? এতকালের চাকরানীটাকে তিনে মাইনায় ভাত কাপড় রাখতে পারবে না, এমন দশা কেন হল তোমার? সারা দেশে কি শনির নজর পড়ছে?

: স্বাধীন হতে গেলে এরকম হয়।

: স্বাধীন হই নি তবে? স্বাধীন হলে কি হবে? তুমি ফের রাখতে পারবে মোকে?

আবার হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বকুল বলেছিল, কবে তবে আমরা স্বাধীন হব মা? কবে সেদিন আসবে মা?

পরনে তার বাসন্তীরই সাতাশ টাকা দামের পুরনো একটা তাঁতের শাড়ি। প্রায় নতুন শাড়িটা। কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল বকুল। সাত মাসের অকাল প্রসবের রক্তে ভেসে গিয়েছিল তার ছাপা শাড়িটা, মাস তিনেক আগে বাসন্তীই একটি মাসও আর টিকবে না বলে সঙ্কোচের সঙ্গে যে শাড়িটা তাকে দান করেছিল।

বাসন্তী ব্যবহার করলে একমাসেই ছাপা শাড়িটা ছিঁড়ে ফেঁসে যেত সন্দেহ নেই, তিন চার দিন পরে পরেই সে লণ্ড্রীতে সাফ করতে দিত শাড়িটা।

বকুল তিনমাস একটানা ব্যবহার করেছে, দু-এক জায়গায় সামান্য মোটা সেলায়ের চিহ্ন পড়া ছাড়া কোথাও একটা নতুন ফুটো, পয়সার মত ফুটোও হয়নি শাড়িটাতে।

কাপড়টা খুলে ফেলে সাতাশ টাকার তাঁতের শাড়িটায় জড়িয়ে বকুলকে পাঁজা কোলে তুলে এনে তার দামি পাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল।

ডাক্তার ডেকেছিল সোলো টাকা ভিজিটের।

অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল পাড়ার একজনের গাড়িতে সাত টাকা ভাড়া দিয়ে। ভাড়া হিসাবে নয়, পেট্রলের দাম হিসাবে প্রভাত নির্বিকার চিত্তে সাত টাকা আদায় করেছিল। তবু, তার নামটা বাসন্তী প্রকাশ করে না।

বকুল ঝির জন্য তার শোকটা আন্তরিক। নিজেই আজ সে ঘর ঝাঁট দেয় বাসন মাজে বলে নয়। এ সব সে করছে নিজের খুশিতে রাজীবের আপত্তি উপেক্ষা করে গায়ের জোরে।

রাজীব বলে, একটা ঠিকে ঝি রাখতে পারি না ভেবেছ না কি?

বাসন্তী বলে, তুমি আর কথা কয়ো না। পার্টনার যাকে বোকা পেয়ে পথে বসায় তার মুখে আবার কথা! নবাবী যখন করতে হয় আমিই করব, তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না! বুঝলে?

লোলুপ চোখে রাজীব তাকে দেখে। এক যুগ ধরে তার প্রেমে ভাঁটা পড়ল না, দিন দিন যেন নেশার মতই চড়ছে।

মেঝে ঝাঁট দিতে দিতে বাঁকা চোখে বাসন্তী তাকিয়ে নেয়।

: ঠিকে ঝিদের ঝাঁটা মারি। যেদিন পারব আবার বকুলকে রাখব।

লোকের বাড়ি ঝি আসে, ঝি চলে যায়—আগে বাসন্তী বুঝতে পারত না এ ব্যাপারের মানে। এখন খানিকটা টের পেয়েছে, বকুলকে ছাড়িয়ে দেবার পর।

ঝি পুরনো হওয়া আজকাল অসাধারণ ব্যাপার। পুরনো দিনের মত আদর দিয়ে আপন করে সে ঠিকে ঝি বকুলকে এত বছরের পুরনো করেছে, কিন্তু সেটা আজ কজন পারে? সে নিজেও আজ পারছে না।

গিন্নিদের আর ঝিদের মধ্যে শুধু পয়সা আর খাটুনি লেনদেনের চাঁছাছোলা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। দোষ কোন পক্ষেরই নয়। নিজেদেরি জোটে না গিন্নিদের, তিন বাড়ি খেটে ঝিদের ভরে না পেট।

সাধনাকে সে বলে, তাই বটে ভাই। অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট। ঝির টিকবে কিসে? ছাঁকা মাইনে, বাঁধা ধরা ছাঁকা কাজ, দুটো মিষ্টি কথা পায় না ঝিকে মিষ্টি কথা মানুষ বলবেই বা কোন ভরসায়? আজ এটা কাল ওটা চেয়ে

বসবে—দেবার সাধ্যি কই? ছাঁকা মাইনে দিয়ে রাখতে পারলে আমি কি বকুলকে ছাড়াই। না চাইতে এটা-ওটা কত কী পেয়েছে, দুটো একটা টাকা যখন-তখন চেয়ে নিয়েছে, মাইনে থেকে কখনো কাটি নি। আজ কোন মুখে শুধু মাইনেটা ধরে দেব?

যা বোঝে না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না বাসন্তী, যেটুকু বোঝে সহজভাবে সোজাসুজি বোঝে। তার এই সহজ বাস্তববোধ মাঝে মাঝে বিচলিত করে দেয় সাধনাকে।

অভাবে তারও স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। চাকুরে স্বামীর সঙ্গে যে উগ্র ব্যবহার কল্পনাতেও আনতে পারত না, স্বামীটি বেকার হতেই তার চেয়ে বেশী উগ্রচণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অভাব আশাকে করে দিয়েছে ঠিক তার বিপরীত নির্জীব নির্বাক মূর্তিমতী হতাশার মত।

অথচ কত সহজভাবে বাসন্তী মেনে নিয়েছে অভাবকে।

কত অনায়াসে বাতিল করে দিয়েছে আগের দিনের জের, অতীত সুখের জাবর কেটে দুঃখ দুর্দশাকে আরও বেশী অসহ্য করা। সেই বাসন্তী বিশেষ কাবু না হয়েই রাঁধে-বাড়ে বাসন মাজে—মেয়েকে রাখে, রানীর মত যার আলস্য উপভোগের ঢং দেখে সেদিনও গা জ্বলে গিয়েছে সাধনার।

কিন্তু কেন? কেন বাসন্তীর পক্ষে এটা সম্ভব হল? সে যা পারে নি, আশা যা পারছে না, বাসন্তী কেন তা পারবে?

এ প্রশ্নের জবাব সাধনা পায়। বাসন্তীর কাছেই পায়।

কিছুদিন পরে বাসন্তীর চোখে-মুখে সে দেখতে পায় ক্লেশের ছাপ, ক্লান্তির চিহ্ন। তার পরিপুষ্ট সর্বাঙ্গের অত্যধিক লাবণ্য ধীরে ধীরে খরচ হয়ে যাচ্ছে টের পাওয়া যায়।

এই তবে আসল মানে বাসন্তীর এত সহজে এত অনায়াসে দুঃখকে বরণ করার? জীবনী শক্তি সে সঞ্চয় করেছিল অনেক, তার বা আশার যে সুযোগ কোনদিন জোটে নি।

জমানো গয়না জমানো টাকা দিয়ে সে স্বামীকে উদ্ধার করেছে বিপদ থেকে। জমানো স্বাস্থ্য আর অনাহত আনন্দ ভরা মন নিয়ে নেমেছে অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে।

তাজা দেহ তাজা মনকে ক্ষয় করার সুযোগ পেয়ে বাসন্তী সহজে খাড়া থাকতে পেরেছে। তাদের মত আগে থেকেই ওর দেহ আর মনের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায় নি।

তাই বটে। ঠিক।

এই গরম সহ্য হওয়া আর অসহ্য হওয়ার মত একই ব্যাপার। জীবনীশক্তি বজায় থাকলে গ্রীষ্মও যেমন সয়, দুঃখও তেমনি সহজে কাবু করতে পারে না মানুষকে। বাসন্তী মোটা-সোটা মানুষ, গরমে তবু তাদের চেয়ে তার কষ্ট হয়েছে কম।

অভাব তাকে কাবু করতে পারছে না এখনও।

দুজনের অতীত জীবন মিলিয়ে দেখতে গিয়ে মনে মনে সাধনা থ বনে থাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে আগে নয়, রাখালের চাকরি যাবার পর সম্প্রতি তারা দুঃখের স্বাদ পেয়েছে। আগে না কি তারা সুখে ছিল। আজ এমনই চরম দুরবস্থা যে তুলনার ফাঁকে এই পরম মিথ্যাটাও সত্যের মত মনে হয়।

অভাব ছিল না কবে? কেরানীর মেয়ে কেরানীর বৌ সে আর তার মত অন্য সকলে কবে জেনেছে প্রাচুর্যের স্বাদ, কবে মুক্ত থেকেছে আতঙ্ক আর দুর্ভাবনার আবহাওয়া থেকে? কোনমতে বেঁচে থাকাটাই চিরদিনের অভ্যাস, দেহ মনের সর্বাঙ্গীণ ঘাটতিই চিরন্তন প্রথা - অবনতি হতে হতে চাকরি গিয়ে রাখাল বেকার হয়ে পড়ামাত্র একেবারে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হওয়ায় মনে হত সুদিনই ছিল বুঝি আগেকার কোনমতে টিকে থাকার দিনগুলিও।

বাসন্তী এতকাল এড়িয়ে এসেছে এই অপূর্ণতার চাপ। পিছিয়ে সে আছে অনেক দিক দিয়ে, যে সব বিশ্বাস ধারণা সংস্কারকে বাতিল করে দিয়ে তাদের মত মানুষেরাও এগিয়ে গেছে এখনো সে সবের গুদাম হয়ে আছে তার মনটা, কিন্তু জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির অভাব সে জানে নি, পরিবেশের সঙ্গে নিত্য নতুন সংঘাত বাধে নি তার পিছিয়ে পড়া জীবনের।

এই পর্যন্তই ভাবতে পারে সাধনা। বাসন্তীর সঙ্গে নিজের এই একপেশে অসম্পূর্ণ তুলনা তাকে উন্মনা করে দেয়, ঈর্ষা মেশানো বিষাদ আর নৈরাশ্য জাগায়।

এত দাম জীবনে প্রাথমিক মোটা প্রয়োজনগুলির? জীবনকে রসালো আনন্দময় করার জন্য এত জরুরী এই ভিত্তি শক্ত করে গাঁথা?

অনভ্যস্ত টানাটানি আর অবিশ্রান্ত খাটুনি যেন রাজীবের সঙ্গে বাসন্তীর নতুন এক ধরনের প্রণয়লীলা। তাদের স্থূল অমার্জিত ঘন গাঢ় রসালো প্রণয়ের যেন নতুন একটা পর্যায় আরম্ভ হয়েছে অভাবের দিন শুরু হওয়ার সঙ্গে বিলাসব্যসন ত্যাগ করে রান্না করা বাসন মাজা ঘর ঝাঁট দেওয়ায় মেতে গিয়ে রাজীবকে যেন আবার নতুন করে জমিয়েছে বাসন্তী।

দুজনের হাবভাব কাবু করে দেয় সাধনাকে।

মুখে শ্রান্তির ছাপ পড়েছে বাসন্তীর কিন্তু রসে আহ্লাদে প্রাণটা যেন তার থৈ-থৈ করছে।

তার কাছে গোপন করে না বাসন্তী। নালিশ জানায়। মনের মানুষের সোহাগের বন্যায় হাবুডুবু খেতে খেতে সখীর কাছে দম নেবার অবসরটুকুতে থমথমে আনন্দের ভঙ্গিতে নালিশ করে।

—বুড়ো বয়সে এমন করে পিছনে লেগে থাকে ভাই। কষ্ট করছ দেখে সোহাগ বাড়িয়েছেন। জ্বালাতন হয়ে গেলাম।

জ্বালাতন বৈ কি।

ঈর্ষা থেকে আসে আত্মগ্লানি। স্বল্প অমার্জিত মানুষ? ওদের সারা বাড়ি খুঁজে রামায়ণ মহাভারত আর দু একখানা সতীর অমুক সতীর অমুক ছাড়া বই মেলে না একখানা? চিঠি লিখতে বসলে কলম ভাঙার উপক্রম বাসন্তীর?

কি এসে গিয়েছে তাতে ওদের।

আর কি লাভ হয়েছে তাদের বই মাসিকপত্র খবরের কাগজ পড়ার সাধ আর চিন্তা করার সাধ্য থেকে, কিঞ্চিৎ সভ্যতা আর মার্জিত রুচি থেকে।

অভাব অনটন পর্যন্ত ওরা তলিয়ে দিয়েছে স্থূল আনন্দ আর উন্মাদনায়।

আর অভাব মিটে গেলেও তাদের জীবন হয়ে আছে নিরানন্দ প্রাণহীন একঘেয়ে দিন কাটানো।

বাস্তব দুঃখের সঙ্গে সখীর এই অবাস্তব বাবচাতুরী আর ছেলেখেলা কোথায় ভাবিয়ে তুলবে সাধনাকে, তার বদলে জাগে ঈর্ষা আর খেদ।

বহুকাল ধরে দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে তারা কি হয়েছে আর সদ্য সদ্য দুঃখের সঙ্গে পরিচয় শুরু হওয়ায় বাসন্তীরা কি হয়েছে—তারই মধ্যে সে করছে তুলনা।

দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা নিয়েও সে যে ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছিল রাখালের বেকারত্বের ধাক্কায়, সে অভিজ্ঞতা না নিয়েই যে বাসন্তীকে শুরু করতে হয়েছে দুর্দিনের যাত্রা এটা খুব সরল সহজ বাস্তব হিসাব।

কিন্তু এটা মনেও আসে না সাধনার।

সে ভাবে না যে সঞ্চিত বাড়তি শক্তি শেষ বাসন্তীর শেষ হয়ে যাবে দুদিনেই, কিসের জোরে তখন সে বইবে অনভ্যস্ত দুর্দশার বোঝা?

ঝি-গিরি রাঁধুনিগিরি দাই-গিরি করেও বঞ্চিত সঙ্কুচিত অপূর্ণ জীবনকে প্রেম দিয়ে রস দিয়ে কাব্য দিয়ে আনন্দময় করার চিরন্তন উপদেশটাই হাতে-নাতে

করে পালন করতে শুরু করেছে বাসন্তী। কদিন আর লাগবে ফাঁকিটা প্রকট হতে?

ইতিমধ্যে বাসন্তীদের নীচের তলায় একদিন ভাড়াটের আবির্ভাব ঘটে— প্রৌঢ়বয়সী চরণদাস। হরেকৃষ্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কাজ করে। তার স্ত্রী রাধা কালো এবং রোগা, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। সঙ্গে আসে রাধার বিধবা বুড়ী মা, আঠার উনিশ বছরের ভাই গৌর। সেও ওই কারখানায় ঢুকেছে চরণের চেষ্টায়।

নীচের তলাটা যেন হঠাৎ মানুষে আর কলরবে ভরে যায়। দুখানা ঘরে এতগুলি মানুষ!

বাসন্তী কল্পনাও করতে পারে না।

বাড়ভাড়া প্রায় তিন ভাগের দুভাগ কমিয়ে দেবার জন্য বাসন্তীই উৎসাহী হয়ে তার সংসারটা গুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেডখানা ঘর আর খোলা ছাদটুকুতে।

ভাড়াটে বাহিনী দেখে তার সত্যি সত্যি রাগের সীমা থাকে না।

: তোমার এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই। আর তুমি ভাড়াটে পেলে না?

রাজীব ভড়কে গিয়ে বলে, কেন, কী হল? কোন হাঙ্গামা করেছে নাকি, বজ্জাতি?

: ওরা এতগুলি লোক আমায় জানালে না কেন?

রাজীব আমতা আমতা করে বলে, আমি কি জানতাম? বন্ধু একে জুটিয়ে দিলে, বললে যে লোক খুব ভাল, কোনরকম গোলমাল করবে না। চরণবাবুকে শুধিয়েছিলাম ওরা লোক কজন, কী বিত্তান্ত। তা আমায় বললে যে, স্বামী-স্ত্রী আর কটি ছেলেপিলে।

বাসন্তী ঝংকার দিয়ে বলে, তবে তো খুব ভাল লোক, গোড়াতেই মিছে কথা বলেছে! যেমন তুমি, তোমার বন্ধুও জোটে তেমনি।

: তা, ওরা লোক বেশী তো আমাদের কী এমন অসুবিধে?

: মাহা মরি, যা বলেছ! নীচের তলায় হাট বসালে, আমাদের কি অসুবিধে! আমি থাকব না এখানে, তুমি অন্য বাড়ি খোঁজ কর।

অনেকদিন বাদে আজ রেগেছে বাসন্তী, রাগ করে মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলেছে।

কোঁদল করা নয়। আগের মত কোঁদল করতে বোধ হয় ভুলেই গেছে বাসন্তী। তবু তার কাছে একটা মুখ ঝামটা পেয়ে রাজীবের খুশীর সীমা থাকে না।

খুশী হয়ে করে কি, এই সকালবেলাই বাসন্তীর স্বামী কড়া হুকুম অগ্রাহ্য করে বাজার থেকে প্রায় সোনার মতই দুর্মূল্য আস্ত একটা ইলিশ মাছ নিয়ে আসে।

খুশী হলে হোক। নইলে এই নিয়ে ঝগড়া করুক। রাজীবের মনটা ছটফট করছে বাসন্তীর কোঁদলের স্বাদ পাওয়ার জন্য।

মাছ দেখে বাসন্তী মুখ বাঁকিয়ে আড়চোখে তাকায়। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে!

রাজীব কৃতার্থ হয়ে যায়।

: ঘুষ দিচ্ছ? এত বড় মাছটা যে আনলে, কে খাবে? তিনবেলা করব আমি—কাল বাসি মাছ খাওয়াবো।

: মাছ খাওয়ার লোকের অভাব আছে নাকি তোমার?

: সেই হিসাব ধরেছ? একা একা ভাল জিনিস খেতে বিশ্রী লাগে?

: লাগে না?

: আজকাল আর বিশ্রী লাগে না গো, লাগে না। নিজের জোটে না, পরকে দেব!

মাছ দেখে হেসে ফেলে রাজীবকে কৃতার্থ করেছিল বাসন্তী, হাল্‌কা সুরে হলেও শেষ কথাটা বলে সেই আবার তাকে আহত করে।

বাসন্তীর মুখে অভাবের উল্লেখ শুনলেই তার আঘাত লাগে না—এভাবে বলা হলে লাগে।

একটু ম্লান গম্ভীর মুখেই সে দোকানে যায় সেদিন।

দেখে বাসন্তীরও মনটা যায় খারাপ হয়ে।

ধীরে ধীরে সে নীচে নামে।

তফাত থেকে দেখেই নিজের বাড়িতে মানুষের যে ভিড়টা তার অসহ্য ঠেকেছে, সেই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে সে দেখবে সইয়ে নেয়া যায় কিনা।

ঘর গুছানো আর রান্নাবান্না নিয়ে তারা ব্যস্ত। তখনো ঘরে অনেক জিনিস এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে, রাধা আর তার বড় মেয়ে প্রণতি কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগেছে সেই বিশৃঙ্খলার পিছনে।

মালপত্রের মতই এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে বসে ছড়িয়ে আছে ছয়টি ছেলেমেয়ে—বড়টির বয়স দশ-এগারর বেশী নয়।

প্রণতির বয়স পনের-ষোল হবে।

: ঘর গুছোচ্ছেন?

: হ্যাঁ, দেখুন না চেয়ে, কি ঝন্‌ঝাট। দিব্যি ছিলাম, কি যে পোকা ঢুকল

মাথায়। নিজের বাড়ি ভাড়া দিয়ে দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো। কোথায় রাখি এখন এত জিনিস?

সেটা মিছে নয়। তাকালেই বোঝা যায় জিনিসপত্রগুলি শুধু চরণদাসের একার জীবনে সঞ্চয় করা নয়, বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে জমেছে। জীর্ণ পুরনো একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য কত জঞ্জালও যে আছে। ফেলতে বোধ হয় মায়া হয়।

: আপনাদের নিজের বাড়ি ছিল নাকি?

: তবে না তো কি? কত বললাম, একখানা ঘর অন্তত নিজেদের জন্য রাখো, তাতে বাড়তি জিনিসপত্র থাকবে। তা নয়, সবটা বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিলেন।

কোলের ছেলেটি দোলায় ঘুমোচ্ছিল। দোলা টাঙানো হয়েছে সর্বাগ্রে। এমন আচমকা চিৎকার করে ছেলেটা কেঁদে ওঠে যে বাসন্তী চমকে ওঠে।

: কি হল?

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে মুখে মাই গুঁজে দিয়ে বাধা বলে, কিছু হয় নি।

বসতে বলে না কেন কে জানে। বোধ হয় ভেবেছে, এক বাড়িতে থাকে, দরকার হলে নিজেই বসবে। ছোটখাটো রোগা কালো মা-টির জন্য বাসন্তী মায়া বোধ করে, কিন্তু ছেলেমেয়ের পালটি দেখে তার অস্বস্তিরও সীমা থাকে না। দিনরাত এরা হট্টগোল করবে—এইটুকু বাচ্চাটার পর্যন্ত কি গলা-ফাটানো কান্না।

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না বাসন্তী।

বাসন্তী ও মাঝে মাঝে সাধনার সঙ্গে পাড়া বেড়াতে বেরোয়।

নীচের তলায় হৈ হৈ কিচির-মিচির ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি তার সহ্য হয় না, বাইরে বেরিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

মাঝে মাঝে সে তার সহজ বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সাধনার মনের নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার সূত্র ধরিয়ে দেয়।

মল্লিকদের শোভার বিয়ে না হওয়ার রহস্য সে জলের মত সহজ করে বুঝিয়ে দেয় সাধনাকে

মল্লিকদের বাড়ি লোক অনেক। অনেক লোক মানেই অনেক হাঙ্গামা, অনেক কাজ। বাড়ির মেয়েরা সারাদিন ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে থাকে, অবিশ্রাম খাটে।

বুড়ো রাজেন মল্লিক পেনশন পায়। দুই ছেলে চাকরি করে, এক ছেলে ডাক্তারি পড়ে, এক ছেলে বখামি করে ঘুরে বেড়ায়, আরেক ছেলে পড়ে স্কুলে। শোভার বড় বোনের বড় ছেলেটিও এখানে খরচ দিয়ে থেকে কলেজে পড়ে, তার বাবা মফস্বলের শহরের ডাক্তার। বড় ছেলের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, মেজ ছেলের দুটি এবং আরেকটি শীগগির হবে। এ ছাড়াও থুড়থুড়ে একজন বুড়ী থাকে বাড়িতে, শোভার সে পিসীমা, রাজেনের চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

তা ছাড়াও মাঝে মাঝে আত্মীয় কুটুম্ব আসে।

তবে দু-চারদিনের বেশী থাকে না। যারা আসে তারা নিজেরাই এটা ভাল করে বোঝে যে আজকের দিনে এর চেয়ে বেশী চাপ দিতে গেলে সহ্য হবে না, আত্মীয়তা কুটুম্বিতার বাঁধন ছিঁড়ে যাবে।

বড় মেয়ে মেজ মেয়ে মাঝে মধ্যে দু-একমাস থেকে যায় খরচ দিয়ে। বড় জামাই ডাক্তার, মেজ জামাই মোটামুটি ভালই চাকরি করে।

ছেলেদের চাকরি-বাকরি পড়াশুনা সব শহরে। দেশের সম্পত্তি বেচে দিয়ে রাজেন এই ছোটখাটো বাড়িটা কিনেছিল। বাড়িটা রাজেনের, শুধু এই একটি সূত্রে বাঁধা হয়ে এতগুলি প্রাণীর জীবনযাপন এখানে একত্র হয়ে আছে।

মোটামুটি মিলে-মিশেই আছে। ঝগড়াঝাঁটি যা হয় তার চেহারা এখনো পারিবারিকই বটে। বড় স্বার্থের সংঘাত ঘটবার কারণ এখনো ঘটে নি।

রাজেন পেনশন পায়, বাড়িটাও তারই।

কিন্তু ভাঙন ঠেকাবে কে? কাল যা ভেঙে দিতে চায়? ভাঙনের পোকা কুরে কুরে ক্ষয় করেছে ভিতরে ভিতরে তলায় তলায়। নজর করলে বাইরে চোখে পড়ে এই ধরনের পারিবারিক প্রাচীনতা আর জীর্ণতা। অন্ধ বিশ্বাসী তবু আশা করে, হয়তো আরও অনেক কাল টিকে যাবে।

স্কুল কলেজ আপিস, বুড়ো-বুড়ী কাচ্চাবাচ্চা, অসুখ বিসুখ পুজা-পার্বণ — এলোমেলো বিশৃঙ্খল সংসারযাত্রায় কোনরকমে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপাত করতে হয় মেয়েদের। অবশ্য যার যতখানি করণীয় এবং যে যতখানি না করে পারে তারই হিসাবে।

রান্না করা বাসন মাজা কাপড় কাচা ছেলে ধরা সেলাই-করা—নানা কাজে শুধু হাত লাগাতেই হয় না শোভাকে, নানা কাজ সম্পন্ন হওয়ার দায়িত্বও তাকে নিতে হয়।

সেই তো শুধু ঝাড়া-হাত-পা এ বাড়িতে, জোয়ান বয়সী সুস্থ সমর্থ মেয়ে শোভাও মনে করে না তাকে বেশী রকম খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, অন্যায় ভার চাপানো হয়েছে তার ঘাড়ে। নিজেদের বাড়িতে যতটা পারে খাটবে না মেয়েছেলে, চালু রাখবে না সংসার?

অনাদর অবহেলা নেই। ডাল তরকারি যদি কম পড়ে যায়, হাঁড়িতে ভাতে টান পড়ে, সেটা শুধু তার একার বেলা নয়, কারো ইচ্ছাকৃত নয়। যে দিনকাল, যে ব্যবস্থা রেশনের আর যে দাম কালোবাজারী চালের, পুরুষ আর ছেলেপিলেদের খাওয়ার পর মেয়েদের বেলা এরকম কম পড়বেই।

তার পাতেই বরং বেশী ভাত দেবার চেষ্টা হয়, বৌদি ডালের বাটি কাত করে দেয় তারই পাতে।

সবাই যেমন পরে সেও তেমনি পরে সোলাই করা কাপড়। বৌদিদের চেয়ে বরং তার কাপড়টাই আসে আগে, না চাইতে তার জামার ছিট কিনে আনে ভায়েরা।

শোভার কেন বিয়ে হয় না আবিষ্কারের চেষ্টায় এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাধনা পরিবারটিকে পরীক্ষা করেছে।

বাসন্তী বলে, ওমা, তা আনবে না? মায়ের পেটের বোন, বাপ বেঁচে রয়েছে, ছেলেপিলের জামার ছিট এনে সেলাই করিয়ে নেবে শুধু?

তাই বটে। ছিট শুধু শোভার একার জন্যে আসে নি, শুধু নিজের জামাটিই সে সেলাই করবে না।

চা করে বড় বৌ নিজে এনে দেয় ননদকে।

শুনে বাসন্তী বলে, ওমা, তা দেবে না? একলা নিজে কটাকে সামলাবে? ননদ যদি না রোগা ছেলেটার ঝনঝাট পোয়াতো, রাতে ঘুমোতে না পেয়ে মরে যেত না বড় বৌ।

: এই জন্য বাড়িতে আদর শোভার? সবার জন্য খেটে মরে, সবার দায় সামলায়, তাই তার খাতির? বিনা মাইনেতে এমন প্রাণ দিয়ে খাটবার লোক মিলবে না বলে।

: না না, ছি! খাটতে না পারলে, আলসে কুড়ে হলে কি ফেলে দিত? সবাই হয় তো এতটা সন্তুষ্ট থাকত না, এইমাত্র। বোন বলেই আদর যত্ন করে,

সবার জন্য এত করে বলে আরও খুশী সবাই, এইমাত্র। মেয়েটাও কি ওসব ভেবে খেটে মরে? নিজের বাপ-ভায়ের সংসার বলেই খাটে।

মুখে তর্ক করে না সাধনা, মনে মনে বলে, সে তো নিশ্চয়। বাপ ভায়ের সংসার বলে প্রাণের তাগিদে প্রাণপাত করে খাটে বলেই তো তার এত দাম। হাজার টাকার মাইনে দিয়েও তো এমন লোক মিলবে না যে আপন জনের জন্য করছি জেনে এমন ভাবে প্রাণ দিয়ে করবে।

কিন্তু তাই বলে বাপ মেয়ের, ভায়েরা বোনের, বিয়ে না দিয়ে আইবুড়ো করে ঘরে রেখে দেবে নিজেদের স্বার্থে?

: বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি গেলেই মুশকিলে পড়বে, তাই বুঝি বিয়ে দেবার গরজ নেই?

বাসন্তী হেসে ফেলে, ধেৎ, কি যে সব অদ্ভুত কথা তোমার মনে আসে ভাই। বাপ ভাই কখনো তা করতে পারে? বিয়ে দিতে পারলে বরং দায় চুকবে, হাঁপ ছাড়বে।

: তবে?

: সুবিধামত পাত্র পায় না, এই আর কি। যা দিনকাল! তা ছাড়া, শুধু খাটতেই পারে মেয়েটা, আর কি আছে যে ভাল ছেলের পছন্দ হবে? ওদের এখন উঁচু নজর এদিকে মেয়ের যে চেহারাও নেই, লেখাপড়া গানবাজনাও শেখায় নি, সে খেয়াল রাখে না!

যে দিনকাল। ওরা যেমন পাত্র চায় সেরকম পাত্রের পছন্দসই পাত্রী শোভা। শোভার সেজ বোন প্রভা কদিন হয় বাপের বাড়ি এসেছে। তার স্বামী রামনাথও এসেছে সঙ্গে।

মল্লিকদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে আজ সাধনা বিশেষভাবে আলাপ করে রামনাথের সঙ্গে, ভালভাবে লক্ষ্য করে প্রভার হালচাল। এমন কিছু অসাধারণ সুপাত্র নয় রামনাথ, মানানসই বয়স, মোটামুটি চেহারা ও স্বাস্থ্য, মোটামুটি ভাল কাজ করে। শোভার চেয়ে প্রভাও এমন কিছু বেশী লেখাপড়া গানবাজনা শেখে নি, দেখতেও সে বোনের তুলনায় এমন কিছু রূপসী নয়। রামনাথ নিজেই তাকে পছন্দ করেছিল—দশ বছর আগে দাবীদাওয়াও তাদের পক্ষে ছিল সাধারণ।

আজ রামনাথের মত পাত্র অনেক বেশী দুর্মূল্য। শোভার মত মেয়েকে আজ যদি আরেকজন রামনাথ বিয়ে করেও, অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে তাদের বর্ধিত মূল্য।

শুধু বেকার বেড়েছে বলে নয়, যত উপার্জন হলে বুক ঠুকে বিয়ে একটা করে

ফেলা যায় সেটা আকাশে চড়ে গিয়েছে বলে, খাস্ত বস্ত্রের মতই ঘাঁটতি দেখা দিয়েছে সাধারণ যোগ্য পাত্রের।

তাই এসেছে এই উদাসীনতা। যেমন চায় তেমন বিয়ে দেবার সাধ্যও তাদের নেই।

চোখকান বুজে যেমন-তেমন একজনের হাতে সঁপে দেওয়া যায় শোভাকে। আগের দিনে দরকার হলে তাই দিত। এই আশা থাকত যে যতই খারাপ হোক বিয়ে, যত সামান্যই জুটুক যে জন্য বিয়ে দেওয়া জীবনের সেই সার্থকতা—বাপের বাড়ি আইবুড়ো হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে সে অনেক ভাল। বর বুড়ো হোক, সেদিক থেকে ব্যর্থ হোক মেয়ের জীবন, খেয়ে পরে সংসারে গিন্নি হয়ে দিন কাটাবার সুখটা সে পাবে। অথবা যোয়ান বয়সী অকেজো অপদার্থ হোক বর—তার বাপ দাদা ভাল ঘরের মানুষ, তারা স্বামীর দিকটি ছাড়া অন্যদিকে সুখে রাখবার চেষ্টা করবে মেয়েকে।

আজ আর এসব ভরসা নেই। ভাল বর ছাড়া কোনদিকে আশা করার কিছু নেই যে বাপের বাড়ি কুমারী হয়ে পড়ে থাকার দুর্দশার চেয়ে বিয়ে দিলে অন্তত সামান্য একটু ভাল হবে মেয়ের জীবনটা?

প্রভার সঙ্গে কথা কইতে কইতে শোভার উপর বাড়ির মানুষের নির্ভরতা লক্ষ্য করে মনে মনে সাধনা সায় দেয়। দশটা ঝি দশটা রাঁধুনি দশটা দাই এর মতই তাকে ছাড়া গতি নেই এ বাড়ির ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষের—এর চেয়ে আর কি চরম ব্যর্থতা কল্পনা করা যায় একটি বিকাশোন্মুখ নারী জীবনের।

কিন্তু এর চেয়েও বীভৎস ভয়ানক ব্যর্থতা সহজই কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে এদেশে। গায়ের জোরে ঋষির মন্ত্রের অচ্ছেদ্য বাঁধনে চিরকালের জন্য বেঁধে ওকে যে কোন একটা পুরুষের দাসী ক'রে দিলে ওর নতুন তাঁতের শাড়িটি হয়তো আর ওর গায়ে উঠবে না, মাছের টুকরো না পেলেও ঝোল আর আলুর টুকরো দিয়ে পেট ভরে যে ভাত খেয়েছিল ওবেলা তার বদলে নুন ভাত না পেয়ে উপোস করেই দিন কাটবে।

: ও শোভা! —সাধনা ধৈর্য হারিয়ে ডাকে,—বাড়িতে একটা লোক এলে বুঝি ফিরে তাকাতেও নেই?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজেনের ডাক শোনা যায়, শোভা? আমার ওষুধটা দিয়ে গেলি না মা?

এবং অন্যদিক থেকে বড় বৌ বরদার সকাতর আহ্বান আসে, ও ঠাকুরঝি? দুধ বার্লিটা এনে দাও? একেবারে খেয়ে ফেলল যে আমায়?

থলে পুতা দিয়ে বাপের ওষুধটা মাড়তে মাড়তে শোভা কাছে এসে দাঁড়ায়। নীরবে মাথা নেড়ে একবার ইঙ্গিত করে যেদিক থেকে বাপের ডাক এসেছে, আরেকবার ইঙ্গিত করে যেদিক থেকে এসেছে বরদার সকাতর আবেদনের হুকুম। ক্লিষ্টক্লান্ত স্বরে বলে, কেমন আছেন ?

বিয়ে হলে চুলোয় যেত, প্রত্যক্ষ মরণের জলন্ত আগুনে। বিয়ের নামে সঁপে না দিয়ে বাপ দাদা তাকে ভাজা ভাজা করছে বাপ দাদার উপর নির্ভরশীল তেইশ চব্বিশ বছরের কুমারীত্বের তপ্ত তেলে।

: শোভা ? ওষুধ খাবার সময় যে পেরিয়ে গেল মা।

: ঠাকুরঝি, ছুটোতে মিলে যে চেঁচাচ্ছে ভাই !

শোভা চেঁচিয়ে বলে, আসছি।

সেটা ছুদিকেরই জবাব হয়।

দাঁড়িয়ে থেকে শোভা বলে, দেখছেন তো, খেটে খেটে সময় পাই না। আপনাদের বাড়ি যাব ভাবি, হয়ে ওঠে না।

: দেখছি বই কি বোন ? পাঁচ দশটা স্বামী আর বিশ পঁচিশটা ছেলেমেয়ে নিয়ে বিরাট সংসার চালাচ্ছ।

প্রভা মুখে একটা পান পুরে দিয়ে বলে, ওকে আমি এক মাসের জন্য নিয়ে যাব। খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে কালি মাখিয়ে দিয়েছে চেহারায়। যেমন বুদ্ধ হয়েছে বাবার, তেমনি স্বার্থপর হয়েছে দাদা। বিয়ের যুগ্যি মেয়েটাকে কোথায় একটু ভাল খাইয়ে শুইয়ে বসিয়ে রেখে সুশ্রী করবে, ঝিয়ের মত চেহারা করেছে।

সোমনাথ সিগারেট ধরিয়ে বলে, সুধীর বাবুর ছেলেটার সঙ্গে জুটিয়ে দিতে পারলে তুমি—

: চুপ কর তুমি।

ঠিক কথা। শোভার সামনে সতাই বলা উচিত নয় যে কোন এক বাবুর কোন এক ছেলের সঙ্গে তাকে জুটিয়ে দেবার কথা তারা ভেবেচিন্তে পরামর্শ করে রেখেছে।

মনে তার আশা জাগবে, নানা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করবে। তারপর যদি কোন কারণে বিয়েটা না হয় ?

ছেলেকে বাড়িতে ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিল, আশার জিম্মায়। এমন সে প্রায়ই রেখে যায় আজকাল। আশা আপত্তি করে না, বিরক্ত হয় না। তার নিজের

ছেলেপিলের ঝন্‌ঝাট নেই, বাড়ি থেকে এক রকম বেরোয় না, সাধনার ছেলেটাকে একটু দেখলে দোষ কি?

বরং ভালই লাগে ছেলেটিকে নিয়ে থাকাতে। মনটা একটু অন্যদিকে যায়।

কি পরিবর্তনটাই ঘটে মানুষের! কি অদ্ভুতভাবেই উল্টে যায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক! চব্বিশঘণ্টা এক বাড়িতে থেকেও যার সঙ্গে কথা কইতে বিরক্তি বোধ হত, যেচে আলাপ করতে ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ালে আয়নায় যাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকাত না, আজ সে খুশী হয়েই তার ছেলেকে পাহারা দেয় তাকে একটু নির্বিবাদে পাড়া বেড়াবার সুযোগ দিতে।

এমন বিশেষ কোন উপকার সাধনা তার করে নি যে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে, কোন প্রত্যাশাও রাখে না তাদের কাছে। সাধনাদের দিক থেকে এই প্রত্যাশার ভয়েই কিছুদিন আগে আরও বেশী করে সে ওদের এড়িয়ে চলত!

আজ উল্টে গেছে অবস্থা। আশা টের পেয়েছে, তাদের মত মানুষের জীবনে দারিদ্র্য আর দরিদ্রকে এড়িয়ে চলা যায় না। একটা জেল তৈরি করে নিজেকে সেখানে কয়েদ করতে হয়।

সাধনার সঙ্গে সে প্রাণ খুলে সোজাসুজি এসব কথাও বলে। তাদের আগের দিনের সম্পর্কের কথা।

সে বলে, গরিবরাই বরং ফাঁকতালে চায় না, হাত পাতে না। এদেশে তাহলে ভিখিরিই গিজগিজ করত। তোমার দুর্দশা দেখে সত্যি কষ্ট হত ভাই, বিশ্বাস করবে? কিন্তু ভাবতাম, নরম দেখলেই আজ এটা চাইবে, কাল ওটা চাইবে, হঠাৎ এসে বলবে বড় বিপদে পড়েছি, কটা টাকা দাও। তুমি চাইতে না বলে আবার রাগও হত!

সাধনার মুখে হাসি ফোটে।

: ওসব টের পেতাম। কখন কী চুরি করি এ ভয়টাও তোমার ছিল।

এক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়ে থেকে আশা জোর দিয়ে বলে, মিছে বলব কেন সত্যি সে ভয় ছিল। 'রাজার হস্ত করে সমস্ত গরিবের ধন চুরি'—কবিতাটা মুখস্থই করেছিলাম ছেলেবেলায়, সত্যিকারের চোর কারা চিনি নি। ভাবতাম যার নেই, সেই বুঝি চুরি করে দায়ে ঠেকে!

এত খোলাখুলি কথা কয়, কিন্তু আশার মনের নাগাল যেন পায় না সাধনা ভেতরটা যেন তার আড়ালেই থেকে যায়। বোঝা যায় ভেতরে তার তোলপাড় চলছে দুঃখ আর বিষাদের—কিন্তু তার রকমটা যেন রহস্যময়।

আশা নিজে থেকে কথা কয় কম। সাধনা তাকে কথা বলায়।

আশা হতাশায় ঝিমিয়ে গেছে, প্রাণপণ চেষ্টায় খাড়া রাখছে নিজেকে, কিন্তু সেটাই কি সব? ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার হয়ে যায় নি তার। সঞ্জীব চাকরি করছে, দেনা শোধ করে দায়মুক্ত হতে যতদিনই লাগুক একদিন তার আগের অবস্থা ফিরে আসবে। চিরদিন সে কষ্ট পাবে না।

এমনভাবে কেন তবে মুষড়ে গেছে আশা?

কষ্ট সইতে পারে না, সেজন্য ঝিমিয়ে যাক, বিমর্ষ হয়ে থাক, কখনো ভুলেও কি হাসতে নেই? দুদণ্ডের জন্য সজীব হতে নেই ভবিষ্যৎ সুখের দিনের কথা ভেবে?

সাধনা বলে, আমাদের সত্যি মনের জোর বড় কম।

: কে বললে?

দুঃখ কষ্ট পেলেই আমরা দমে যাই। সুখের দিনও যে আবার আসবে সেটা ভাবি না।

: আসবে ভাবলেই কি দুঃখ ঘুচে সুখের দিন আসে [illegible] সব?

: ভাবলেই আসে না তা ঠিক। কিন্তু একদিন তো আসবেই! দুঃখ তো চিরস্থায়ী নয়।

: নয়? এদেশে কত লোক দুঃখে জন্মে দুঃখেই মরে তুমি জান?

সাধনা একটু বিপাকে পড়ে ভাবে, এর মনটা তো বড্ড বাঁকা। কাদের সুখ দুঃখের কথা বলছে নিশ্চয় বুঝছে, অথচ না বোঝার ভান করে টেনে আনল দেশের লোকের কথা।

ও বেশ একটু সাধারণভাবে ভাসাভাসাভাবে কথাটা তুলেছে বৈ কি। যেন সাধারণ সমস্ত মানুষের সাধারণ সুখ দুঃখের কথা বলছে।

সাধনা শুধু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে দেয়ালে টাঙানো সঞ্জীবের বাঁধানো ফোটোটার দিকে চেয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়ার কারবার করতে বেশ চালাক হয়ে উঠেছে সাধনা আজকাল।

: আমাদের সুখ দুঃখের কথা বলছিলাম। তোমার আমার কথা। মিছিমিছি কেন যে আমরা পর হয়ে থাকি? প্রাণ খুলে দুটো কথা কইলেও তো প্রাণটা হালকা হয়? আমরা একজন কি সিঁদ কেটেছি আরেকজনের সুখের ভাণ্ডারে?

তখন ভরা দুপুর। বৈশাখী নিদাঘ দুঃখী আশাকে রোজ এসময় খানিকক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখে। তার সুখের ভাণ্ডারে না হোক দুপুরবেলার ঘুমের ভাণ্ডারে সাধনা আজ সিঁদ কেটেছে।

নতমুখে মেঝেতে হাত রেখে বসে ছিল আশা। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল মেঝেতে ঝরে পড়তে দেখে সাধনা ভাবে,—পেরেছে!

তবে মিছেই সে এতদিন সখিত্ব করে নি বাসন্তীর সঙ্গে। মনে অতি ক্ষীণ একটু দ্বিধার ভাব জাগে মাত্র, তাতে শেষ পর্যন্ত আটকায় না। এগিয়ে গিয়ে আঁচল দিয়ে সে চোখ মুছিয়ে দেয় আশার। কিন্তু না বলে একটা মিষ্টি কথা, না দেয় তাকে লজ্জা পাবার সুযোগ।

সেই অহঙ্কারী আশা আজ আচমকা কেঁদে ফেলেছে কিন্তু কিছুই যেন আসে যায় না তাতে।

যে আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়েছে সেই আঁচল দিয়েই সে তার ঘাড় আর কণ্ঠার কাছ থেকে ময়লা ঘষে তুলে আনে। চোখের সামনে ধরে বলে, মেয়েমানুষের গায়ে এত মাটি পড়লে জামা-কাপড়ের মতো তাকেও ধোপার বাড়ি দেওয়া উচিত।

চোখ সজল হলেও মুখে হাসি ফোটে আশার।

: ধোপার বাড়ি নয়, হাসপাতাল।

: ওমা, তাই বল।

সাধনা নিজের কান মলে। —ছিঃ আমাকে, একশো ছিঃ। সাধে কি বাসন্তী বলে আমি মেয়েমানুষ নই? এক বাড়িতে থাকি, আমার চোখেও পড়ে না?

আশা চুপ করে থাকে।

যা মনে হত আশার মুখের গোমড়া ভাব, এখন সেটাই সাধনার চোখে ধরা পড়ে তার শ্রান্ত বিষণ্ণ মুখের স্বাভাবিক পাণ্ডুরতা হয়ে।

: ভয় পেয়েছ?

: না।

: ভাবনা হয়েছে?

আশার মুখে আবার একটু ক্ষীণ হাসি ফোটে।

সাধনা বলে, তা ভাবনা হয় নানারকম। কিন্তু তুমি নেতিয়ে পড়েছ কেন ভাই? বাপের বাড়ি খুব এল না?

আশা বলে, বাপের বাড়ি আমি যাব না এ অবস্থায়।

সাধনা বুঝতে পারে সে তার কোন অবস্থার কথা বলছে। তার সন্তান-সম্ভাবনার অবস্থার কথা নয়। যেতে পারলে ভালই হত বাপের বাড়ি, কিন্তু বাপের দেওয়া একটি গয়না পর্যন্ত তার গায়ে নেই, ভিখারিনীর মত কী করে সে যাবে বাপের বাড়ি?

আশার কাছে আত্মীয়স্বজন আসে খুব কম। আজ বলে নয়, চিরদিনই এদিক থেকে আশাকে কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে সাধনার।

দু-একজন আত্মীয় ছাড়া কলকাতায় আপনজন আশার কেউ নেই। তার বাপের বাড়িও পশ্চিমে, শ্বশুরবাড়িও পশ্চিমে।

আপনজনের অভাবটা আজকাল আশা অনুভব করছে।

: মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি লাগে! মনে হয় সবাই বুঝি সীতার মত আমায় বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে।

: স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়েছে।

সাধনা হাসে। হাসির কথায় সে আশাকে একটু তাজা রাখতে চেষ্টা করে।

কথা কইতে কইতে কড়া নড়ে বাইরের দরজার। দরজা খুলে সুবেশ সুদর্শন চেনা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কাকে খুঁজছেন?

পিছন থেকে আশা বলে, শচীনবাবু! আসুন, ভেতরে আসুন।

সাধনাকে পরিচয় দেয়, ইনি আমার ভগ্নীপাত—মাসতুতো বোনের।

সাধনা নিজের ঘরে যায়, শচীন যায় আশার ঘরে। বেশীক্ষণ বসে না মানুষটা, দশ কুড়ি পরেই বেরিয়ে যায়। সদর দরজা বন্ধ করে আশা এসে বসে সাধনার ঘরে।

তার মুখ দেখে সাধনা ভড়কে যায়।

মানুষটা এসে এইটুকু সময়ের মধ্যে যেন তুলি দিয়ে নতুন কালো বিষাদ আর হতাশা লেপে দিয়ে গিয়েছে আশার মুখে। শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে।

: কী হল ভাই?

: এবার আমার গলায় দড়ি দেবার পালা।

: গলায় আমাদের দড়ি দেওয়াই আছে। আবার কী হল?

আশার মুখে এক মর্মান্তিক হাসি ফোটে।—আবার উনি ধার করছেন। আমায় না জানিয়েই করছেন।

: উনি বলে গেলেন বুঝি?

: হ্যাঁ। ওঁর কাছেও গিয়েছেন টাকার জন্য। দু-তিনবার।

সাধনা একটু ভেবে বলে, এক হতে পারে, সঞ্জীববাবু হয়তো ভেবেছেন আত্মীয়ের কাছে টাকা নিয়ে বাইরের দেনাটা সাফ করে দেবেন। আত্মীয়ের সঙ্গে অতটা কড়াকড়ি হবে না, সুদ লাগবে না, ধীরে সুস্থে শোধ করে দেবেন।

আশা ফাঁকা চোখ তুলে তাকায়।

: এরকম কিছু ভাবলে কি আর আমায় না জানিয়ে ভাবত? সে বুদ্ধি ঘটে থাকলে কি আর এ দশা হয়।

কে জানে এ কী ঝোঁক মানুষের, কোথা থেকে আসে? যে পথে প্রতিক র নেই জানে, আরও বিপদ ঘটবে জানে, অন্ধ হয়ে সেই পথেই চলে?

মাস দুই আগে সঞ্জীব এই শচীনের কাছে টাকা ধার করেছিল, আশাকে জানায় নি। গত মাসেও আরেক অজুহাতে কিছু টাকা ধার করেছিল। গতক ল আবার টাকা চাইতে গিয়েছিল, নানা কথা মনে হওয়ায় শচীন আজ তার কাছে এসেছিল ব্যাপারটা বুঝতে।

আশাকে সে শক্ত হতে উপদেশ দিয়েছে। এ নাকি বড় পিছল পথ, গড়িয়ে চলতে শুরু করলে থামা যায় না।

উপদেশ দিয়ে সঞ্জীবের বদলে আশার হাতে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল।

আশা টাকা নেয় নি। বলেছে, যার দরকার তাকে দেবেন। আমার টাকার দরকার নেই।

: পৃথিবীটা যেন কেমন লাগছে ভাই, চিনতে পারছি না। অসম্ভব ব্যাপার সব সম্ভব হচ্ছে। মাথাটা ঘুরছে বলে? আমি একরকম ভাবি, আসলে দেখি স উল্টো রকম হয়।

: এতটা হাল ছেড়ে দিও না।

: হাল আছে না কি যে ধরব? আমায় সুখে রাখতে না জানিয়ে দেনা করেছিল, আমার সুখ। গয়না দিয়ে জীবন দিয়ে দেনা শুধছি, অসহ্য হলে ভাবছি আহা, আমার সুখের জন্য মানুষটা পাগল, আমি কষ্ট না করলে কে করবে?

একটা অদ্ভুত হাসি ফোটে আশার মুখে, আমার কষ্ট দেখেই আবার ধার করছে নিশ্চয়, আমার সুখের জন্য। জানে তো সামনে ওঠার আগে আমি ম গেলেও সুখ নেব না একটু মাছ পর্যন্ত আমি আনতে দিই না, টাকাটা অগ নিজের সুখের জন্য খরচ করছে।

সাধনারও নিজেকে বড় নিস্তেজ অসহায় মনে হচ্ছিল। ম্লান মুখে সে জিজ্ঞাসা করে, চাকরিটা ঠিক আছে তো? না, এইভাবে—?

: চাকরি ঠিক আছে। ওসব কিছু নয়। আসল ব্যাপার আমি বুঝে গিয়েছি আমার জন্যে না ছাই, নিজের আরাম বিলাস ছাড়া চলে না, কষ্ট সয় না। আগে অজুহাত ছিলাম আমি, এখন আর অজুহাত লাগছে না।

নিজের কপালটা টিপে ধরে আশা।—সেদিন দুটো পাঞ্জাবি করালে। টাকা পেল কোথায়? না এক বন্ধুর কাছে পাওনা ছিল, শোধ দিয়েছে। একটু ছিঁড়েছি জামা—রিপু করে সেলাই করে দুমাস অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু না তা হয় না, সেলাই করা জামা গায়ে আপিস করা যায় না। একটা করালেই হ

'কবারে? না, দুটো করালেই সুবিধে –খরচ কম লাগে, বেশীদিন টেঁকে, অমুক হয়, তমুক হয়।

খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকে আশা। বলে, তোমায় বলব কী ভাই, ওসব কথা মুখ ফুটে বলতে গেলেও নিজেকে হীন মনে হয়। তুমি তো দেখে আসছ, কী ...ধি কী খাই? তুমি তো দেখছ, চেহারা কী হয়ে এসেছে? ভেতরে ভেতরে ...র পাই শরীরে কত জোর কমেছে। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে ওঠে। তোমাদের সঞ্জীববাবুর জন্য এমন ভয় হত গোড়ার দিকে, এই খেয়ে আপিসের খাটুনি খেটে ...নুষটা কি বাঁচবে? মাঝে মাঝে জামায় মাংসের ঝোলের দাগ দেখতে পাই। ...কট থেকে সিনেমার টিকিট বেরোয়। দেখে কী স্বস্তিই যে পেলাম। ভাবলাম, ...গ্য অনেক বন্ধু আছে, মাঝে মাঝে হোটেলে খাওয়ায়, সিনেমা দেখায়। ...মি ...র দেনা শুধতে ধরে শুকিয়ে আমসি হচ্ছ, সে ধার করে সিনেমা দেখবে, হোটেলে মাংস খাবে কেউ তো ভাবতে পারে? পারে কেউ?

দুজনেই চুপ করে থাকে।

আকাশ-পাতাল ভাবে সাধনা। আশা একটুও কাঁদে না কেন? সব ...শেষ হয়ে ...চ্ছ, কেঁদেও আর লাভ নেই, এ ভাব তো ভাল নয়।

তার ছেলের গালে টোকা দিয়ে আশা আদরের সুরে বলে, দেখি ... ...চ্ছ, দেখি? মা মেরেছে, রাগ হয়েছে, দোখ?

শিশু মুখের একটা শেখানো ভঙ্গি করলে সে হাসে।

যেন কিছুই হয় নি!

সাধনা ভেবে চিন্তে বলে, একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। ভু... যদি বুঝে ..., তুমি নিজেই ভুল বুঝেছ। কেউ যদি ঠকিয়ে থাকে, তুমি নিজের বোকামিতে ঠকে...ছ। আমি তাই বলি কী, গায়ের জ্বালায় ঝগড়া না করে, সোজাসুজি পষ্টা...ষ্টি ...কয়ে বোঝাপড়া করে নাও।

: কথা কওয়ার আর কী আছে?

: আছে বৈকি? শুধু মানুষটাকে দেখো না, অবস্থাটাও খেয়াল করো।

আশা মুখ বাঁকায়। অর্থাৎ তার চেয়ে আজ কার অবস্থা খারাপ?

: ওর মনের জোর নেই এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। উপায় কী বলো? তুমি ...ও আর গড়েপিটে মানুষ কর নি তাকে। মানুষটা কষ্ট সইতে পারেন না, সইতে ...শেখন নি। কী এমন হাতিঘোড়া চান? ধার যে করেন, ফুর্তি করতেও নয়, ...খেয়ালে উড়িয়ে দিতেও নয়। দুটো জামা পরবেন, একটু সিনেমা দেখবেন, ...মন্দ এটা ওটা খেয়ে খিদে মেটাবেন। আসলে এ তো সামান্য চাহিদা।

বরাবর পেয়ে এসেছেন, এখন পান না, সে দোষ তো সঞ্জীববাবুর নয়। নিরুপ হলে কষ্ট করতেই হয় মানুষের, সেটাই উনি পারছেন না। তোমার মনে জো আছে তুমি পারছ, ওঁর সে জোরটুকু নেই। নইলে যতটা খারাপ ভাবছ, অত খারাপ নয়।

: তুমি যে উকিলের মত ওকালতি করলে।

: সঞ্জীববাবুর উকিল নই, আমি তোমার স্বার্থই দেখছি। মানুষটা ভাল কি ভদ্রলোকের মনের জোর নেই—এটা তোমাকে মানতেই হবে। মেনে সেইরক ব্যবস্থা করতে হবে, সব দিক যাতে বজায় থাকে।

আশা তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, এর পরেও বজায় থাকবে? কী করে বজা থাকে? সর্বনাশ হতে বসেছিল, চাকরিটা পর্যন্ত যেত। আমি অতি কষ্টে ঠেকিয়েছি আবার কে ঠেকাবে? মনের জোর তো আর আকাশ থেকে আসবে না।

সাধনা বলে, আমিও তাই বলছি। এটুকু তোমায় বুঝতেই হবে ভাই। তুমি নিজে কষ্ট করে ব্যবস্থা করে সামলাতে পারবে না। একবার চেষ্টা করেছ করেছ, পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেল। তুমি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মনের জোর এনে দিতে পারবে না, নিজে বিপদে পড়ে পোড় খেয়ে নিজের মনটাকে নিজেকেই ঠিক করতে দিতে হবে ওঁকে। যার দায়িত্ব তাকেই সব ছেড়ে দাও। যা কিছু অভাব ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তুমি যতটা পার সামলে সুমলে চলবে, সাহায্য করবে

: ফল কী হবে সে তো জানা কথা! নিজেও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে

: সে তো এমনিও ডোবাবেন, ওমনিও ডোবাবেন, তুমি কিছু করতে পারছ কি? ডুবতে বসলে বরং বাঁচবার চেষ্টা আসবে, মনটা শক্ত হবে।

আশা সংশয়ভাবে বলে, এতেও যার শিক্ষা হল না, সে কি শিখবে কোনদিন

সাধনা ভরসা দিয়ে বলে, শিক্ষা হতে দিলে কই তুমি? বিপদে পড়তে পড়তে সামলে দিলে। কষ্ট যা করবার তুমি করছ তার গায়ে কি আঁচ লাগছে মনে যত কষ্ট হোক, অনুতাপ আপসোস হোক, ওটা শিক্ষার ব্যাপার নয় হাতেনাতে শিখতে দিতে হবে। চাকরি যায় যাবে, চাদ্দিকে দেনা করে করে তোমার কপালেও দুঃখ আছে অনেক। কিন্তু কি এমন সুখে আছ? ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে কদিন চালাবে? তার চেয়ে মানুষটার চেতনা হোক, দুজনে মিলে আবার উঠবে।

আশা তো বোকা নয়। সাধনা এত কথায় যা বোঝাতে চেয়েছে, সে দুকথায় তার আসল মানেটা তুলে ধরে।

বলে, সোজা কথায় আমাকে কর্তালি ছাড়তে বলছ। সরলা অবলা বৌ হ

স্বামীর ওপর নির্ভর ? সে আনবার মালিক এনে দেবে আমি রেঁধে দেব। কোথা থেকে কী করে আনছে সে ভাবনা তার।

সাধনা একটু হাসে।

: হাবা সাজতে কি পারব ?

: পারবে। পারতে হবে। আজ মিলে মিশে বোঝা বইতে চায় না, জোর করে বোঝার ভাগ নেওয়া খুব সম্মানের ? দেখলেই তো ওতে লাভ হয় না, বোঝা নিয়ে টানাটানি মারামারিই ঘটে। ঘরে চুপচাপ ভালমানুষটি সেজে থাকেন, বাইরে গিয়ে নিজের মূর্তি ধরেন। তার চেয়ে যেমন চান তাই হোক। দুদিন যাক, টের পাবেন, নিজেই ডাকবেন পাশে এসে দাঁড়াও, হাত মেলাও।

আশা বুদ্ধিমতীর মত বলে, কথায় তো হল। দেখি কাজে কী হয়।

বাসন্তী সব শুনে বলে, তুইও যেমন ভাই, জলের মত সব বুঝিয়ে মীমাংসা করে দিলি। একটা নীতি খাড়া রেখে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা ঘর-সংসার করতে পারে ?

: তুই তো করছিস। ছিটেফোঁটা সুখ চাই না, হলে আগের মত, নইলে নয়। ঝি পর্যন্ত রাখিস না।

বাসন্তী গালে হাত দেয়। —এটা নীতি নাকি ? আশাদি যে কষ্ট করে আসছে, ওর নাম নীতি করা বুঝি। দরকার হয়েছে, উপায় নেই, তাই আমিও এসব করছি, আশাদিও করছে। কিন্তু তুই আশাদিকে যে পরামর্শ দিয়েছিস ভাই সে একেবারে খাসা নীতি। তুমি ওরকম ছিলে আজ থেকে এরকম হবে, নরম হয়ে থাকবে, রাগ হলে ঝগড়া করবে না, নালিশ করবে না, কিচ্ছু করবে না। তাই নাকি মানুষ পারে ?

জোরে জোরে মাথা নাড়ে বাসন্তী, উঁহু, পারে না। তা ছাড়া কার দোষ তুই ধরতেই পারিস নি। ওর জন্যেই তো মানুষটা ফের বিগড়েছে।

: তাই নাকি ?

: তাই। একশোবার তাই। কর্তালি করেছে তো কি হয়েছে ? তুমি বৌ, বৌ হয়ে কর্তালি কর না যত পার, মাস্টারনী হয়ে কর্তালি করতে যাও কোন বুদ্ধিতে ? বৌ হবার সাধ্য নেই, শাসন করার গুরুঠাকুর ! না খেয়ে না পরে আমি কী কষ্টটাই করি ! আমি মনে মনে কি বলি জান ? বলি, আহা, মরি মরি ! হাসি নেই, কথা নেই, মুখটা যেন ভাতের হাঁড়ি, বাড়িতে যেন দশটা রুগী মর মর, চব্বিশ ঘণ্টা এমনি ভাব —অমন কষ্ট নাই বা করতে তুমি ! তার চেয়ে হেসে দুটো কথা কইলে মানুষটার বেশী উপকার হত।

বাসন্তী কথা বলছিল উনানটা সাজাতে সাজাতে। আব্দার জানিয়ে বলে, মুখে একটা পান গুঁজে দে না ভাই?

পান মুখে এলে চিবিয়ে গালে রেখে বলে, এটুকু যদি বোঝাতে পারে, কাজ হয়। মানুষ লোহায় তৈরি নয়? ঘরে একটু আদর পেলে স্বস্তি পেলে ও মানুষটা কখনো ধার করে বন্ধু নিয়ে সিনেমা দেখত, হোটেলে খানা খেত? তারা অন্য ধাতের লোক। ঘরে তারা গোবেচারী সেজে থাকে না বৌয়ের ভয়ে, বৌকে মারধর মেরে গয়না নিয়ে ফুর্তি করতে যায়।

কথাটা লাগসই মনে হয়। কিন্তু খটকা যায় না। এতই কি সহজ এ ব্যাপারের শেষ কথা?

একজন বাইরে লড়বে, ক্ষতবিক্ষত হবে, ঘরে ফিরলে আরেকজন তাকে একটু আরাম দেবে বিরাম দেবে ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেবে মমতার বাস, আর কিছুই চাই না।

এতখানি সহজ আর ব্যক্তিগত এ লড়াই?

ঘর হল পুরুষ সৈনিকের দেহমনের হাসপাতাল আর মেয়েরা হল তাদের নার্স?

তাই তো ছিল এতকাল? লড়াই তবে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে পড়ছে কেন? ভাঙন ধরছে কেন এই অপরূপ ব্যবস্থায়?

এক একটি নীড় তো এক একটি দুর্গবিশেষ ছিল রোজগেরে স্বামীর। তার মনের মত হাসি আনন্দ আদর মমতা তার জন্য তৈরি হয়েছে সেখানে। মেয়েরা বিগড়ে গিয়ে বিদ্রোহিনী হয়ে তো ভেঙে ফেলে নি সে দুর্গ, ওলটপালট করে দেয় নি পুরুষের লড়াই করে ঘরে ফিরে শান্তি আর স্বস্তি পাবার ব্যবস্থা?

হাসিমুখে দুটা কথা কইবে আশা? পেটের সঙ্গে প্রাণটা যখন জ্বলছে তখন নিজের বগলে সুড়সুড়ি দিয়েও হাসি আনতে পারে মানুষ?

হাঁড়িতে ভাতের অভাবের জন্য মুখটা যখন ভাতের হাঁড়ি—

ঘরে ফিরে সাধনা উনান ধরায়। হাঁড়ি চাপাতে হবে।

৬

রাখাল বলে, তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

সাধনা ভাবে, সর্বনাশ! কী দুঃসংবাদ কে জানে!

হাত ধুয়ে কাপড়ে মুছতে মুছতে সাধনা এসে বসে। রাখাল তার ধোয়া হাতে তুলে দেয় নয়া প্যাটার্নের নতুন সোনার দুল।

: এই কথা!

: না, এটা আসল কথা নয়।

আসল কথাটা ব্যবসা নিয়ে। এতদিন রাজীবের আগেকার দায় ছিল, সম্প্রতি সেটা শেষ হয়েছে। আর তাকে দফায় দফায় কিস্তির টাকা দিতে হবে না। টাকাটা সে কারবারে লাগাবে। রাখালকেও সে অনুরোধ করেছে, লাভের অংশ কম টেনে কারবারে লাগাতে।

সাধনা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে।

: অত খুঁটিনাটি বুঝি নে আমি। আমায় কী করতে হবে বলো।

আগে হয়তো রাখাল আহত হত। প্রিয়া কবিতা বোঝে না জানালে নতুন কবি যেমন আহত হয়। শুরুতে প্রায় কাব্যসৃষ্টির উন্মাদনা নিয়েই সে নোংরা অশ্রদ্ধেয় বিড়ির পাতা সুখা তামাকের ব্যবসা শুরু করেছিল, ধরাবাঁধা জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেটাই ছিল নতুন সৃষ্টির ঝোঁক।

আজকাল ওসব অভিমান তার ভোঁতা হয়ে গেছে।

সে বলে, আসল কথা, কিছুদিন কষ্ট করতে হবে।

: করব।

তার এই নির্বিকার উদাসীন জবাবটা আঘাত করে রাখালকে।

: শেষকালে কেঁদেকেটে ঝগড়া করে অনর্থ করো না। বেশীদিন নয়, কয়েকমাস একটু টানাটানি যাবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

: বেশ তো।

তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে রাখাল হাতের মোটা চুরুটটা মুখে গুঁজে ধরায়। শুধু বিড়িপাতা সুখা আর সাধারণ চলতি সিগারেট নিয়ে

তাদের কারবার—সম্প্রতি সে নিজে উদ্যোগী হয়ে কয়েকরকম চুরুট তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। কবে এককালে ছবি আঁকা পদ্য লেখার ঝোঁক চেপেছিল কিছুদিন, সেই বিদ্যা নিয়ে নিজে একটা চৌকো পিচবোর্ডে জলন্ত-চুরুট-ধরা একটা হাত এঁকে তার নীচে লিখেছে, "চুরুট খান : একটা চুরুট দশটা সিগারেট পঞ্চাশটা বিঁড়ির সামিল! দাম কত সস্তা পড়ে! তিনবার চারবার নিভিয়ে খান একটা চুরুট!"

রাজীব সংশয়ভরে বলেছিল, ঠিক কথা লেখা হল কি? এ রকম হলে সবাই তো চুরুট খেত!

রাখাল বলেছিল, এটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে বেঠিক কথা লিখতে হয়। ওটাই হল বিজ্ঞাপনের আর্ট।

: বটে নাকি।

: তবে? একটা বিজ্ঞাপন দেখান তো আমায় যা স্রেফ ভণ্ডামি আর মিথ্যা নয়? কেমন করে বোকা লোককে ভাঁওতা দিয়ে ঠকানো যায়, এটাই হল বিজ্ঞাপনের আর্ট। নইলে কী করে বিজ্ঞাপন দিতে হয় তার এক্সপার্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন দেবার বড় বড় কোম্পানি গড়ে ওঠে? পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে মস্তা বিজ্ঞাপন সব ওই এক ধাপ্পাবাজি।

রাজীব আমতা আমতা করে বলে, আপনিও শেষে ওই ধাপ্পাবাজি করে বসলেন?

: মোটেই না। আমি শুধু জানিয়ে দিলাম আমাদের এখানে চুরুটও পাওয়া যায়।

সাধনা কী ভাবছে বুঝতে না পেরে রাখালের মুশকিল হয়। রাগত মনোভাবটা দমন করে চকটে টান দিয়ে রাখাল বলে, রাজীবটা হল গিয়ে একেবারে সেকেলে ব্যবসায়ী। আমি যেমন চাকরি করতাম, ও ঠিক তেমনি ব্যবসা করে। বাপ ঠাকুর্দার বাঁধা নিয়মে। জগৎ পালটায় তো ওদের নিয়ম পালটায় না। সকাল সন্ধ্যায় ধূপধুনো দেবার কী ঘটা! কালীর ছবিকে প্রণাম করবে, গণেশকে প্রণাম করবে, তারপর মাথা ঠেকাবে কাঠের ক্যাশবাক্সটায়!

: ক্যাশটাই তো আসল।

রাখাল হাসে, ক্যাশ ছাড়া বোঝেই না। ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত খোলে নি। লোহার সিন্দুক আছে, আবার ব্যাঙ্ক কেন? আমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলিয়েছি।

নতুন দুল কানে লাগিয়ে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে সাধনা বলে, এটা না

আনলেও চলত। এসব ঝোঁক আমার কেটে গেছে। দেখো না খালি গলায় ঘুরে বেড়াই ?

: এ বৈরাগ্য চলবে না। আমি এদিকে কতরকম ভাবছি, বিকালের পড়ানোটা ছেড়ে দিয়ে আরও কোমর বেঁধে নেমে পড়ব, টাকা করব, —গয়না পরতে তোমার অরুচি জন্মাবে কি রকম ?

: অনেক টাকা করবে ভাবছ, না ? লাখ টাকা ?

: লাখের বেশী নেই ?

সাধনা সোজা তার দিকে তাকিয়ে বলে, কী আশ্চর্য দেখো, আমি জানতাম তোমার এ ঝোঁক আসবে। খুব যখন টানাটানি চলছিল, তখন মনে হয়েছিল কথাটা। টাকার জন্য ভীষণ কষ্ট পেলে, এরপর তোমার রোখ চাপবে টাকা করার। তাই সত্যি হল।

: আমি কিন্তু মোটে দু-চার মাস এসব ভাবছি। রাজীবের সঙ্গে কারবারে না নামলে হয়তো কোনরকমে দিন চালাবার চিন্তাই করতাম।

: এ ঝোঁক তোমার আসতই। একটু সামলে নেবার অপেক্ষায় ছিলে।

: তুমি চাও না টাকা ?

: চাই। গয়না পরব না পরব জানি না, চারবেলা ভোজ খাব আর দুঘণ্টা অন্তর নতুন নতুন কাপড় পরব।

টাকার চিন্তার চেয়ে টাকা করার চিন্তায় রাখাল আজ কম মশগুল নয়।

টুইশনি, ফালতু রোজগার আর চাকরির ধান্ধায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে সময়ও তার কম যায় না টাকা করার চেষ্টায়।

একটা ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত ঠেকে তার কাছে। আজ আরও বেশী টাকা করার নেশায় মেতে থাকার সঙ্গে আগের দিনের সেই দিবারাত্রি টাকার ভাবনা আর ছেলে পড়িয়ে চাকরি খুঁজে বেড়াবার ধান্ধায় মেতে থাকার মধ্যে সে যেন একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। টাকার অভাবে কষ্ট পাওয়াটুকু বাদ দিলেই যেন মিলে যায় নেশাটা। সেদিন টাকার চিন্তায় ডুবে থাকত নিরুপায় হয়ে, আজ স্বেচ্ছায় টাকার চিন্তায় ডুবে আছে।

টাকার চিন্তা ছাড়া একদণ্ড শান্তি নেই!

তবু, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ বেড়ে গেছে। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে তো পরিচয় ঘটছেই ব্যবসা সূত্রে, জানা চেনা যাদের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম উঠে গিয়েছিল তাদের সঙ্গেও আজকাল মাঝে মাঝে দেখা হয়, পাড়ার

লোকের সঙ্গে চলে মেলামেশা আর মনে প্রাণে উদাসীন হয়ে থাকার বদলে স্বেচ্ছায় তাদের ভালমন্দের খবর রাখা।

সাধনা যেমন জমিয়ে তুলেছে পাড়ায় মেয়েদের সঙ্গে সেরকম মেলামেশা নয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বসে বসে গল্প জমিয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব করার সময় তার নেই।

কাজে যেতে আসতেই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। কেউ বসে থাকে দাওয়ায়, কেউ সামনে পড়ে পথে, কারো সঙ্গে দেখা হয় মুদীর দোকান রেশন থানায় বাজারে, কারো সঙ্গে বাসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু দণ্ড কথা হয়, তাতেই আদান প্রদান হয় আসল খবরগুলির, তাতেই বজায় থাকে এবং গড়ে ওঠে হৃদ্যতা।

কারো বাড়িতে অসুখ বিসুখ, কাজে বেরিয়ে যাবার সময় একটু ঘুরে খবর জেনে যাওয়া যায় কয়েক মিনিট বাড়তি সময় দিয়ে।

দোকান যেদিন বন্ধ থাকে সেদিনও নিজের কাজ ঘরের কাজ নিয়ে ছুটাছুটি করতে হয়, তবু দেখা যায় পাড়ায় বা আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি ক্রিয়াকর্মে গিয়ে সামাজিকতা বজায় রাখা থেকে পাড়ার বৈঠক বা আড্ডায় গিয়ে বসার জন্য সময়ের অভাব হয় না মোটেই।

এই মেলামেশার ফলে স্থানীয় নানারকম লৌকিক ব্যাপারে তাকে আজকাল ডাকা হয়। সে সবে যোগ দিতেও তার অসুবিধা হয় না।

এমনি পার্থক্য টাকার চিন্তায় হন্যে হয়ে বেড়ানো আর টাকা করার সাধকে দাড় করানোর মধ্যে!

সময় তখনও থাকত। কিন্তু আত্মীয়তা বন্ধুত্ব সামাজিকতার জন্য সময় দেবে কে? সে ইচ্ছা আসবে কোথা থেকে? মেলামেশার বদলে ঘরের কোণে একা বসে চিন্তাজ্বরে মুহ্যমান হয়ে থাকতেই তখন ভাল লাগত। দেখা হলে পাড়ার মানুষের কুশল জিজ্ঞাসার জবাব দিতে দাঁড়াবার তাগিদ জাগত না, হাঁটতে হাঁটতেই ছুঁড়ে দিত দুটো চলতি শব্দ—চলে যাচ্ছে!

কাজের মানুষ দশজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার সময় পায় না—এ মিথ্যা অজুহাত ফাঁস হয়ে গেছে রাখালের কাছে।

সেও আজ কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ।

দশজনের জীবনকে সাধ্যমত এই সম্মানটুকু দেওয়ায় যেন বিবেকের জ্বালাও তার খানিকটা শান্ত হয়েছে—যে দশজনে বিশুর মা'র গয়নার ব্যাপার জানলে তাকে চোর বলত।

সাধনার যে শান্ত নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার ভাব আরেকটা দুঃস্বপ্নের মত ঘনিয়ে

এসেছিল তার জীবনে, দশজনের সম্পর্কে দুজনেরি মাথা ঘামাবার মাধ্যমে যেন তারও ঘোরটা কেটে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে।

সাধনা বলে, শোভার বিয়ে ঠিক হল শেষ পর্যন্ত।

রাখাল বলে, শুনলাম ওর দাদার কাছে। আপসোস করছিল, বোনের জন্য শেষে বুড়ো বর আনতে হল, লেখাপড়াও ভাল জানে না। কিন্তু উপায় কী, শোভার বয়সও তো বেড়ে যাচ্ছে।

সাধনা খুশী হয়ে বলে, তুমি শুনেছ সব?

: শুনেছি বৈকি। তোমার কাছে শুনেছি, ওদের কাছেও শুনেছি।

বাসন্তীর সঙ্গে কত কথা হয়েছিল শোভার বিয়ের সমস্যা নিয়ে, কত পরিষ্কার মনে হয়েছিল সমস্যাটা! বরটি কেমন সমস্যা তা নয়, সমস্যা মোটামুটি খাওয়াপরা জোটার। আজ আবার বিষম খটকা লেগেছে সাধনার মনে। প্রায় ষাট বছরের বুড়ো? শোভা বিনা প্রতিবাদে নিয়েছে! মন খারাপ হবার লক্ষণও দেখা যায়নি!

অবুঝ কাঁচা মেয়ে নয়। বুড়ো বরের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেবার কথাকাহিনি ব্যাপারও নয়। শোভা শুধু মুখ ফুটে 'না' বললেই এ বিয়ে ভেঙে যায়।

বরং 'না' যে বলেনি! জিজ্ঞাসা করা হলে বরং নীরবে সায় দিয়েছে।

মনের খোঁচা কথায় বেরিয়ে আসে সাধনার, বলে, মেয়ে নাকি এই বরের নামেই খুশী! এ কি ব্যাপার, অ্যাঁ? কোন মেয়ে এমন বিয়ে চাইতে পারে?

রাখাল তার জানা যুক্তিটাই দেখায় শোভার পক্ষে, বলে বাপের বাড়ি চাকরানীর মত জীবন কাটাতে হয়। স্বামী বুড়ো হোক আর যাই হোক, নিজের সংসারে খেয়ে পরে থাকবে।

: সেটাই কি সব?

: সব নয় মন্দের ভাল

সাধনা ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, আমার কিন্তু খারাপ লাগছে। খাওয়াপরার জন্য এরকম একজনের পাশে শোয়ার চেয়ে স্বাধীনভাবে ঝি-গিরি করা ভাল নয়?

: স্বাধীনভাবে ঝি গিরি? তুমি পাগল হলে নাকি? আসলে তুমি নিজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ ও মেয়েটাকে। ঘরের জন্য ওরকম বরের কথা ভাবতেও তোমার ঘেন্না হয়। কিন্তু শোভার কি সে তেজ আর চেতনা আছে? ওর কাছে ঘর আগে।

: আজও এমন মেয়ে রয়ে গেল কী করে?

: রেখে দেওয়া হয়েছে বলে!

: এত কাণ্ড চারদিকে, ওর মনে কি ধাক্কা লাগে না?

: লাগে। ঢেউ ওঠে, মিলিয়ে যায়। তবে এ তো নিষ্ফল হবার নয়, একদিন প্রতিক্রিয়া হবেই। অন্য মেয়ে হলে বিয়ের আগেই কেলেঙ্কারি করত, কারো সঙ্গে হয়তো বেরিয়েও যেত। ওর প্রতিক্রিয়া আসবে বিয়ের পর। যখন টের পাবে কি ভাবে কি জন্য ঠকেছে।

কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও। সুমতিদের মত মেয়েরা আন্দোলন করে, সংগঠন গড়ে, সভায় বক্তৃতা দেয়—ঘরের কোণে নিরীহ গোবেচারী শোভারা মুখ বুজে উদয়াস্ত খেটে যায়, বিনাপ্রতিবাদে নিঃশব্দে মেনে নেয় ভাগ্যে যেমন জোটে তেমন ঘর আর বর!

প্রাণটা জ্বলে যায় সাধনার।

আরও জ্বলে যায় নীলাম্বরী শাড়ি পরে শোভাকে আজ একা বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে।

: দিদি আপনাকে যেতে বলেছে।

: তা নয় বলেছে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। বসো?

: আমি একটু নমিতাদের বাড়ি যাব।

সাধনা হেসে বলে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাই বুঝি বেরিয়েছ ঘর ছেড়ে? খুব ফুর্তি হয়েছে, না?

শোভার নত চোখ আর মৃদু হাসি দেখে গালে তার একটা চড় মারতে সাধ হয় সাধনার!

মুখ ভার করার প্রতিবাদটুকুও জানাতে পারে না? ওর মনে ঢেউ ওঠে না ছাই হয়!

ওর ভাগ্য-মানা মনের ডোবায় ঢেউ তোলার সাধ্য নেই কালবৈশাখী ঝড়েরও!

নিজের বেলা যেরকম বিয়ের কথা ভাবতেও তার ঘেন্না হয়, সেই বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে সেজেগুজে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে—জগৎকে যেন জানিয়ে দিতে চায় যে এতদিনে গতি হল তার!

দুর্গার কথা সে ভাবে। ঘর-হারানো গরিব পরিবারের মেয়ে পঁচিশ টাকার বিয়েতে শুধু বর পেয়েছে, ঘর হারানো বর। ঘরের চেয়ে বড় হয়ে থেকেছে মানুষ। ঘর ভেঙে পড়ার অভিশাপ কি তবে আজ দরকার শোভার মত মেয়েদের নিজেকে মানুষ বলে জানতে পারার জন্য?

এতই বিতৃষ্ণা জন্মে মেয়েটার উপর, মানুষ হিসাবে এতই সে তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে যে তার কথা ভাববার প্রয়োজনও যেন তার ফুরিয়ে যায়।

নিজের এবং অন্যান্য জীবনের বিচিত্র সুখদুঃখ সংঘাতে যে আলোড়ন ওঠালে
সব মনে শোভা তার মধ্যে গুলিয়ে গিয়ে বাতিল হয়ে যায়।

আশা কী বোঝাপড়া করেছে সঞ্জীবের সঙ্গে কিছুই সে খুলে বলে নি সাধনাকে।
পড়ে জিজ্ঞাসা করার সঙ্কোচটাও সাধনা কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

মনে হয়, তার পরামর্শই গ্রহণ করেছে আশা। নরম হয়ে বিনীতা স্ত্রীর
অভিনয় করছে।

পরিবর্তন বিশেষ কিছুই ঘটে নি সংসারযাত্রার, সব দিক দিয়ে যে কঠোর
আনর্যাতনের ব্যবস্থা চালু করেছিল আশা সেটা মোটামুটি এখনো বজায় আছে,
জীব শুধু ভয়ে ভয়ে যেন আশার নতুন মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য বাজার থেকে
একটু মাছ, কালোবাজার থেকে আনছে দু এক সের চাল।

একখানা নতুন শাড়িও সে কিনে দিয়েছে আশাকে।

আশা চুপচাপ মাছটুকু রাঁধছে, হাঁড়িতে চাল চড়াচ্ছে পেট ভরে খাচ্ছে
নতুন শাড়িটা গায়ে জড়াচ্ছে।

জিজ্ঞাসাও করছে না তুমি টাকা পেলে কোথায়, মুখ ফুটে প্রতিবাদও জানাচ্ছে

মুখখানা তার হয়ে আছে ম্লান এবং গম্ভীর। কথা সে বলছে আরও কম।
যা বলে যা করে তাই সই, তার কিছু বলারও নেই করারও নেই।

নীরবে নিজের মনে নিজের কড়া দুঃখ ক্ষোভ আর বিদ্রোহের সঙ্গে যুদ্ধ করে
সংযত করে রাখছে।

সঞ্জীব আপিস চলে গেলে তার এঁটো থালা-গেলাস কুড়িয়ে নিয়ে কলতলায়
যেতে হঠাৎ ঝনঝন করে সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিছুক্ষণ ছটফট করে
ঘর আর বাইরে। হঠাৎ বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে পড়ে
।

তারপর উঠে স্নান না করেই ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসে দু-এক গ্রাস খায়
— উঠে দাঁড়িয়ে ঘটির জল ঢকঢক করে মুখে ঢেলে লাথি মেরে ভাতের থালা
বাটি ছিটকে সরিয়ে দিয়ে ঘটিটা আছড়ে ফেলে ঘরে চলে যায়।

সাধনা আসছে টের পেয়েই ভেতর থেকে দড়াম করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা!

আধঘণ্টা পরে অবশ্য নিজেই সে সাধনার ঘরে যায়।

শুধু একটু হাসে। সত্যই হাসে।

সাধনা সাহস পেয়ে বলে, পরামর্শ দিয়ে আমি বুঝি তোমার অনিষ্টই করলাম

আশা তেমনি ভাবে হাসে। বলে, শুনে রাগ করো না, তোমার পরামর্শ আমি এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দিয়েছি।

: তবে -?

: সে তুমি বুঝবে না।

সতীশের শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছিল। কোন অসুখ নয়, শুধু ভাঙন। বিশুর মা'র ধোওয়া মোছা গোবর লেপা ব্রত পার্বণ পূজা আর প্রসাদ ও দক্ষিণা বিতরণ বজায় থাকলেও সব যেন কেমন যান্ত্রিক হয়ে আসছিল ক্রমে ক্রমে।

আরেকদিন আর এক উপলক্ষে রাখাল পায়েস পিঠে পায়। কিন্তু সে যেন নেহাত তাকে না দিলে নয় বলে, আগে মহাসমারোহে দেওয়া হয়েছে বলে, কোনরকমে নিয়মরক্ষার জন্য দেওয়া হল।

নির্মলা বলে, কইতে আমার মাথা কাটা যায় আপনার কাছে। গোরুগুলারে পশ্চিমা গোয়ালার কাছে বেইচা দিছে। কত কইলাম, দুধ দেয়, গোরু বেচেন কেন দিদি? দিদি কয়, তুই মুখ বুইজা থাক মুখপুড়ি!

একটা নিশ্বাস ফেলে নির্মলা।

মুখপুড়ি কয়! ক্যান, মুখ পুড়াইলাম কিসে? জানি আপনে মানুষ না, দেবতা জানি কোনকালে ভুইলা আমার হাতখান ধরবেন না। ভাবি, না ধরলেন হাত, দেবতা মানুষ হইয়া জন্মাইছেন আপনে, আপন ভাইবা আপনে দরদ দিয়া দুইটা কথা কইলে অভাগী আমার পাপের জন্ম ধন্য হইব।

নির্মলা কপাল চাপড়ায় ডান হাত দিয়ে।—দিদির বড় খাতিরের মানুষটা সতীশবাবু। কয়বার গুণ্ডা-ডাকাইতের নাখান হাত ধরছে দিদি জানে? দিদি মন্দিরে পূজা দিবার যায়, বুড়া রাক্ষসটা আমারে টাইনা নিয়া যায় দিদির ঘরে।

নির্মলা কেঁদে ফেলে।—আপনে দেবতা। পায়ে ধইরা কইলেও হাত ধরেন না। আপনে ক্যান খাইটা মরেন। আপনার ক্যান টাকা নাই? আমি জানি, আপনাগো টাকা থাকে না। ডাকাইতগুলার টাকা ছাড়া কথা নাই, আপনে কী নিয়া পাল্লা দিবেন। চুরি-ডাকাতি আপনার কাম না।

রাখাল তার হাত ধরে। নিজের দেবতাত্ব ভুলে গিয়ে অবশ্য নয়।

নির্মলারও সে ভুল হয় না।

সহজে আর ভাঙবার নয় তার বিশ্বাস। ব্রতপূজা অন্তহীন আচারবিচার বাইরের নানা আড়ম্বরের আড়ালে মনুষ্যত্বহীনতার আড়ত জমিদারবাড়ির অন্দর মহলে তার জীবন কেটেছে, ছেলেবেলা বিধবা হয়ে আজ সাতাশ বছর বয়স।

সে বিশ্বাস করতে পারত না যে নিজে যেচে হাত ধরে টানলেও মানুষ তাকে কলাগান করতে পারে,—দেবতা ছাড়া এটা অসাধ্য।

রাখাল তাই তার কাছে সত্যই দেবতা।

রাখাল গভীর মমতার সঙ্গে বলে, যেসব দিন চলে গেছে, যেতে দাও। যে জেলখানায় আটকে ছিলে সেটা ভেঙে পড়ছে। আপসোস করে লাভ কী হবে? জীবন তো তোমার ফুরিয়ে যায় নি, এবার অন্যভাবে গড়ে তোল জীবনটা।

একটি হাত তার ধরাই থাকে রাখালের হাতে। অন্য হাতে চোখ মুছে সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

: এত জীবন দিয়া আর কী করুম

: জীবন কী কেবল মানুষের [illegible] আমি তোমায় শিখিয়ে দেব কী করে নতুন জীবন গড়বে?

হাত [illegible] নিয়ে নর্মদা গড় হয়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

ষোলো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল নির্মলা, বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হবে শোভার। দুজনেই তারা জানে না জীবন নিয়ে কী করবে। [illegible] সঙ্গে মানুষের উপর তীব্র একটা বিদ্বেষ আছে নির্মলার— জীবনের অভিজ্ঞতায় যার জন্ম [illegible] এই, শোভার [illegible] নেই জানাশোনা।

কোন জ্বালা নেই বলে [illegible] জ্বালায় সাধনা আক্ষেপ করেছে তার কাছে।

শোভারও একদিন আসবে বাসনা আর জ্বালাবোধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে। যে কৃত্রিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে তার মন সেটা কেটে [illegible] আসবে।

সাধনা বলে, ও মেয়েটার কথা বোলো না আমায়, ঘেন্না হয়। তোমার ওই নির্মলার জন্য মায়া হয়, বেচারীর উপায় ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটা কী? ও তো [illegible] বেড়াজালে আটক থাকে নি জন্ম থেকে।

সাধনার কাছে এতটুকু ক্ষমা নেই শোভার।

তার নিজের জীবনের সমস্ত বন্ধন সঙ্কীর্ণতা অসহায়তা আর অপমানের প্রতীক হয়ে যেন দাঁড়িয়েছে মেয়েটা।

প্রভার সঙ্গে শোভা তার বাড়িতে বেড়াতে এলে ভদ্রতার খাতিরেও সে এই ঘৃণা আর অবজ্ঞা চাপতে পারে না।

শোভা টের পেয়ে বলে, সেজদি, আমি একটু ঘুরে আসছি।

সে চলে গেলে প্রভা হেসে বলে, আগে ঘর ছেড়ে বেরোত না। কদিন খুব

যাচ্ছে বন্ধুদের কাছে। আজকালকার মেয়ে তো, বিয়ের আগে জামাটামার প্যাটার্নটি পর্যন্ত নিজেরাই পরামর্শ করে ঠিক করবে।

প্রভার হাসিভরা মুখেও একটা চড কষিয়ে দেবার সাধ জাগে সাধনার। বিয়ের নামে বেশ্যাবৃত্তি করার সুযোগ পেয়েছে বলে শোভা খুশী প্রভাও খুশী বোনকে এই সুযোগ জুটিয়ে দিতে পারছে বলে!

ভোলার মা আজও ডিম বেচে। মাঝখানে গরমে ডিম তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত বলে কিছুদিন ডিম বন্ধ রেখে তরকারি বেচেছিল। কুমড়োর ফালি, কাঁচা আম, কাঁচা লঙ্কা, লেবু এই ধরনের তরকারি। দু-এক পশলা বৃষ্টি নেমে গরম কমায় আবার সে ডিম বেচছে, তার সঙ্গে কিছু কিছু তরকারি বেচাটাও বজায় রেখেছে।

রাখাল বলে, তুমিও কারবার বাড়াচ্ছ ভোলার মা?

: উপায় কি কন? লাভ থাকে না।

: ঠিক বলেছ। আমাদেরও এই দশা। মালের দর চড়ছে, লাভ জমছে ওপরের দিকে, আমাদের কপালে ঢুঢ!

ভোলার মা'র কাছে একটা গুরুতর খবর শুনে সাধনা কলোনিতে গিয়েছিল, সেখানে দেখা হল সুমতির সঙ্গে।

সেও এই বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে এসেছে।

বলে, আপনি প্রায়ই এদিকে আসেন শুনেছি।

: আমি এমনি আসি এদের সঙ্গে কথাটথা বলতে। কী হাঙ্গামা হয়েছে শুনছিলাম।

: প্রভাতবাবু শাসিয়ে গেছে, নিজেরা না উঠে গেলে মেরে তাড়াবে

: তাড়ালেই হল। পাড়ায় লোক নেই।

সাধনার নিশ্চিন্ততায় একটু আশ্চর্য হয়েই সুমতি তার দিকে তাকায়। বলে, আমরাও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু লোক থাকলেই তো হয় না, তাদের একসাথে জোটাতে হয়। প্রভাতবাবুর ভাড়াটে লোক হঠাৎ এসে হাঙ্গামা করবে। বড় কলোনি হলে ভিন্ন কথা ছিল, এইটুকু কলোনি, কজন আর মানুষ। পাড়ার লোক আসতে আসতে এদের দফা শেষ হয়ে যাবে।

শুনে সাধনা চিন্তিত হয়ে বলে, প্রভাতবাবু শাসিয়ে গেছে, ওকেও শাসিয়ে দিলে হয় না? দশজনে গিয়ে যদি আগে থেকে ধমক দেয় যে এসব কুবুদ্ধি চলবে না, ওর কি সাহস হবে হাঙ্গামা করতে?

সুমতি আবার একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি তো মন্দ কথা বলেন নি!

হাঙ্গামা হবার আগেই ঠেকাবার চেষ্টা করলে দোষ কী? আমি আজকেই সমিতির সভায় তুলব কথাটা!

কথা বলতে বলতে শোভার কথা উঠে পড়ে।

সুমতি বলে, শোভার বিয়ে হচ্ছে জানেন? মল্লিকদের বাড়ির শোভা?

: শুনেছি।

: কী কাণ্ড দেখুন, মেয়েটা গিয়ে আমায় ধরেছে, বিয়ে বন্ধ করিয়ে দিতে হবে। এত লোক থাকতে আমায় গিয়ে ধরেছে, এই সেদিন আমি জেল থেকে বেরিয়ে এলাম। ওর বাড়ির লোকের সঙ্গে শুধু জানাশোনা আছে, এই পর্যন্ত। গিয়ে বলতে গেলে তারা শুনবে কেন আমার কথা? বরং অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। ওদের বাড়ির মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমার কথা বলার কী অধিকার আছে? শোভা ছাড়বে না, আমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সাধনা যেন আকাশ থেকে পড়ে শুনছিল, শোভা চায় না বিয়েটা হোক?

: তাই তো বলছে। তিনবার গিয়েছে আমার কাছে। কত বুঝিয়ে বলেছি, তোমার মত নেই এটা জোর করে বাড়ির লোককে জানিয়ে দাও। নিজে না পার, বৌদিদি আছে, দাদা আছে, তাদের কাউকে দিয়ে বলাও। তা, বলে কী, বলতে টলতে ও পারবে না, বলে কিছু লাভ নেই। কী ভীরু বলুন তো মেয়েটা? বলে কিনা, আপনি তো নানা কাজ করেন, আমায় একটা কাজ জুটিয়ে দিন। তার মানে বুঝেছেন? বাড়িতে লড়াই করার সাহস নেই, চুপিচুপি পালাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমায়। বলতে বলতে কেঁদেই ফেলল মেয়েটা। নিজে কিছু করতে পারবে না, আমাকে করতে হবে। আমি আন্দোলন করি কিনা, তাই বুঝি ভেবেছে একটা আন্দোলন করে ওর বিয়েটা ঠেকাতে পারব।

সাধনা বলে, কী আশ্চর্য ব্যাপার! আমি তো ভাবছিলাম, মেয়েটার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, বিয়ে হলে হোক না হলে না হোক—সব সমান ওর কাছে। তাই তো! বাড়িতে মুখ ফুটে কিছুই বলে না, আপনাকে গিয়ে ধরেছে!

: বলুন তো? শক্ত মেয়ে হয় পরামর্শ দেওয়া যায়। আত্মীয়-বন্ধু হলেও বরং চেষ্টা করা যায়।

সাধনা চুপ করে ভাবে।

সুমতি কথা পালটে বলে, প্রভাতবাবুকে আগেই ধমকে দেওয়া উচিত। পাড়ার লোক ডাকতে গেলে রাখালবাবুর আসা চাই কিন্তু।

: রাখালবাবুকে বলবেন।

রাখাল মেলামেশা করে পাড়ার লোকের সঙ্গে কিন্তু হাঙ্গামার ব্যাপারে সে মাথা গলাবে এটা সে এখনও বিশ্বাস করতে পারে না।

সাধনা সোজা গিয়ে হাজির হয় মল্লিকদের বাড়ি। সময় অসময় খেয়াল থাকে না।

শোভা রাঁধছিল।

প্রভা বলে, আসুন, আসুন। এমন সকালবেলা হঠাৎ? রান্না নেই?

: দুটি লোক তার আবার রান্না। শোভা কই?

মেজ বৌ বলে, রাঁধছে বুঝি। বসুন না দিদি। বীরেনবাবুর বৌ আপনার খুব প্রশংসা করে।

সাধনা হেসে বলে, প্রশংসা মানে নিন্দা তো? আমি শোভাকে একটু ডেকে নিতে এসেছি।

: এখন? দরকারটা কি দিদি?

সাধনা নির্বিবাদে মিছে কথা বলে, একটা খাবার করেছি, একটু চেখে দেখবে।

চালাক কম নয় সাধনা। অন্য কারণে ডাকলে হয়তো প্রভারাও কেউ সঙ্গে যেত, এমনিই যেত। কিন্তু খাবার খেতে যখন শোভাকে একলা ডাকা হয়েছে, আর কেউ যাবে না জানা কথা, নিরিবিলি সে কথা কইবার সুযোগ পাবে শোভার সঙ্গে।

খাবার অবশ্য সে আনতে দেয় শোভার জন্য। রথবা দোকান থেকে তৈরি খাবার। বলে, খাবার খেতে ডাকি নি কিন্তু, তোমার বিয়ের কথা বলতে ডেকেছি। আমার কাছে লুকোবে না কিছু। লজ্জা করবে না।

শোভা মুখ বুজে থাকে।

: তুমি চাও না যে এ বিয়ে হোক?

শোভা একটুখানি মাথা নাড়ে। না চাওয়াটা যেন তার তেমন জোরালো নয়।

: সত্যিই চাও না, না, শুধু একটু অনিচ্ছার ব্যাপার? যদি ঠেকানো যায় ভালই, না গেলে আর উপায় কী—এ রকম ভাব নয় তো তোমার? চুপ করে থেকো না ভাই, স্পষ্ট করে কথা কও।

: চাই না তো। আমি মানুষ না?

সাধনা খুশী হয়ে বলে, মানুষ যদি তো চুপচাপ আছ কেন? স্পষ্ট জানিয়ে দাও, এসব জোর-জবরদস্তি চলবে না। তুমি না চাইলে কেউ বিয়ে দিতে পারে

রাত্রে সবে রাখাল বাড়ি ফিরেছে, প্রভাত সরকারের বাড়ি যাবার জন্য তাকে ডাকতে আসে।

খবর পাওয়া গেছে, আজ শেষরাত্রেই খুব সম্ভব প্রভাতের ভাড়া-করা লোকেরা কলোনিতে হানা দেবে। এ বিষয়ে সোজাসুজি কথা বলার জন্য স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক এক্ষুনি তার বাড়িতে যাবে।

: যাবে নাকি? –সাধনা জিজ্ঞাসা করে।

: ঘুরে আসি।

জামা কাপড় না ছেড়েই রাখাল বেরিয়ে যায়।

প্রভাত বাইরের ঘরেই ছিল। বসে বসে কোন বিষয়ে পরামর্শ করছিল তিনজন লোকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে বামাচরণকে দেখেই রাখাল চিনতে পারে।

রাজীবের ভক্তির সুযোগে শ পাঁচেক সিগারেট ধারে বাগাতে সেই যে দোকানে গিয়েছিল, তারপর লোকটিকে আর দেখে নি রাখাল। চেহারাটা কিন্তু স্পষ্ট মনে ছিল

লোকটা যেন বাস্তব জ্ঞানের প্রতীক, তাই একবার দেখলেও অঞ্জনের মত চোখে লেগে থাকে।

পাড়ার জন পনেরো ভদ্রলোককে এত রাত্রে হঠাৎ তার বাড়িতে হাজির হতে দেখে বেশ খানিকটা ভড়কে যায়।

: কী ব্যাপার?

সুমথের বয়স কম, কলেজে পড়ে। সে মুখ খোলে সবার আগে। বলে, আমরা খবর পেলাম আপনি নাকি ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে এই কলোনির লোকদের পেটাবেন। আমরা তাই এসেছি—

প্রভাত চটে বলে, যেখান থেকে উড়ো খবর পেয়েছ, সেখানে গেলেই হত?

রাখাল তাড়াতাড়ি দু পা এগিয়ে বলে, না না, কথাটা তা নয় প্রভাতবাবু। ছেলেমানুষ ঠিক বলতে পারছে না। কলোনির লোকেরা বলছে, আপনি ওদের মারধোর করে তাড়াবেন বলে শাসিয়েছেন। একটা গুজবও রটেছে যে আপনি নাকি গুণ্ডা ভাড়া করে রেখেছেন। আমরা গুজব শুনেই বিশ্বাস করে ছুটে এসেছি তা নয়। একজন ভদ্রলোক এসব করবেন আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা একটা অনুরোধ জানাতে এসেছি আপনাকে।

প্রভাত বলে, ও।

সুমথ বলে, অনুরোধ মানে? এই মানুষটার কাছে অনুরোধ মানে?

তার কথা কানে না তুলেই রাখাল বলে, আপনি কলোনির লোকদের উঠে

.যতে বলছেন, আমরা চাই না এ নিয়ে কোন হাঙ্গামা হয়। আপনি ওদে: বুঝিয়ে হোক, অন্যভাবে হোক চলে যেতে রাজী করাতে পারেন, আমাদের কিছু বলার নেই। পাড়ার মধ্যে আমরা হাঙ্গামা চাই না।

বামাচরণ প্রভাতের পিছন থেকে বলে, ইনিও কি হাঙ্গামা চান মশ হ? আপনারা বাজে গুজব শুনে ব্যস্ত হয়েছেন।

: তবে তো কথাই নেই।

ফিরে যেতে যেতে অসন্তুষ্ট সুমথ বলে, একটু শাসিয়ে দেওয়া হল না, কিছু না, অনুরোধ, জানিয়ে শেষ হয়ে গেল?

রাখাল হেসে বলে, আবার কী রকম হবে শাসানি? সাবধান খবরদার, মাথা ফাটিয়ে দেব, এই সব বললে তুমি বুঝি খুশী হতে? তার চেয়ে দশজন ভদ্রলোকের কাছে নিজের মুখে জানাল ওসব ফন্দি ওর নেই, সব বাজে গুজব, এটা ভাল হল না? এভাবে হাঙ্গামা করার রাস্তা ওর বন্ধ হয়ে গেল না?

বনয় সেন বলে, ঠিক কথা। এভাবে বলাই ঠিক হয়েছে।

এদিকে প্রভাত জিজ্ঞাসা করে, কী করা যায় হে?

বামাচরণ বলে, নাঃ, ও সব প্ল্যান চলবে না। আপনাকে তো বাস করতে হবে এখানে, পাড়ার লোকদের নিয়ে। অন্য বুদ্ধি করতে হবে।

রাখালের কাছে কিছুই শুনতে হয় না সাধনার। খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণই সে জানতে পারে।

লজ্জায় তার যেন মাথা কাটা যায়।

রাখাল সকলকে সামলে দিয়েছে, ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। প্রভাতকে ভাল করে শাসিয়ে দেবার সুযোগ কেউ পায় নি শুধু রাখালের জন্য।

গায়ে পড়ে নেতৃত্ব নিয়ে রাখাল বড়লোক বজ্জাতটার কাছে শুধু অনুরোধ উপরোধের প্যানানি গেয়ে এসেছে। কেউ একটু গরম হয়ে দুটো কড়া কথা বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দিয়েছে, সকলকে সায় দিতে সে বাধ্য করেছে তার ভীরু সবিনয় নিবেদনে যে প্রভাতবাবু দয়া করে পাড়ার মধ্যে হাঙ্গামা করবেন না।

সুমথ বলে, আর বলবেন না সাধনাদি। আমি একটু শাসাতে গেলাম ব্যাটাকে, রাখালদা আমাকেই শাসিয়ে দিলেন।

যে তীব্র আর অসীম ঘৃণা সাধনা তার চোখে দেখতে পায় তাতে তার চমকে যাওয়ার কথা। কিন্তু সাধনাও আর আগের দিনের ঘরের কোণের সেই জীবটি নেই।

হঠাৎ সে প্রশ্ন করে, সুমতি তোমার কে হয়?

এক মুহূর্ত চোখ পাকিয়ে থেকে সুমথ আচমকা হেসে ফেলে।

: আমার নাম সুমথ, ওর নাম সুমতি, তাই বলছেন? সুমতি আমার কেউ হয় না।

: তোমাদের খুব ভাব কিনা—

: আমার চেয়ে দু-তিন বছর বয়সে বড, দু ক্লাশ উঁচুতে পড়ে।

সুমথ মুখে এমন একটা গম্ভীর ভাব এনে কথাটা বলে যে এবার সাধনা হেসে ফেলে।

: মেয়েরা বয়সে একটু বড়ো হলে, দু এক ক্লাশ উঁচুতে পড়লে তাদের সাথে ভাব হতে পারবে না, এমন কোন আইন আছে না কি ভাই?

: তা অবশ্য নেই, ওসব গোঁড়ামিতে আমি বিশ্বাসও করি না। তবে কী জানেন, মেয়েরাই কেমন যেন একটু—

: ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দেয়? পাত্তা দেয় না?

সুমথ মুখ লাল করে বলে, আপনি কিছু বোঝেন না। আপনার শুধু ওই এক চিন্তা। ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যেন আর কোন সম্পর্ক নেই। আমি কি পাত্তা চেয়েছি যে সুমতি পাত্তা দেবে না?

: আমি কি তোমার কথা বলেছি? আমি সাধারণ ভাবে দশটা সাধারণ ছেলের কথা বলছি। তুমি নয় মহাপুরুষ, তোমার কথা বাদ দিলাম।

সুমথের মুখে যেন গুমোট নেমেছে মনে হয়।

দেখে সাধনা ভাবে, সেরেছে! ঝগড়া করবে না তো, ছেলেমানুষী বিক্ষোভের ঝড় তুলে? তারপর আবার কান্না শুরু হবে না তো, ছেলেমানুষী দুঃখের কান্না?

কিন্তু সাধনা কি জানে নিজে সে কোথায় আছে আর কোথায় পৌঁচেছে এ যুগের বিদ্রোহী ছেলে।

তাকে অবাক করে দিয়ে বুড়োর মত সুমথ বলে, আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি। আপনি বাঁশঝাড় দেখে বন চিনেছেন। বড় মেয়েদের জন্য অনেক ছেলের পাগলামি আসে বৈকি, নিশ্চয় আসে। অনেক ছেলে মানে কত ছেলে সেটাই আপনি জানেন না। ওরা কোন শ্রেণীর ছেলে সেটাও হিসেব করেন না।

তাই নাকি।

: তা ছাড়া কি? জোয়ান মদ্দ পুরুষের চেয়ে আপনারা এই সব কাপজী ছেলেদের বেশী ভয় করেন—এড়িয়ে চলেন। তাতে এই সব ছেলেরা আরও

বেশী করে আপনাদের দিকে ঝোঁকে কিনা, আরও বেশী পাগল হয় কিনা, আপনারা তাই ভারি মজা পান, খুশী হন।

সাধনা গালে হাত দেয়।

: কিন্তু ছেলে বলতে আজকাল ওদের আর বোঝায় না সাধনাদি বুঝলেন? সব ছেলের মধ্যে বড়লোক আর পাতি বড়লোক ছেলে কটা? ওদের মধ্যে বাঁকা রোমান্সের ব্যারামটা ছড়ানো গিয়েছিল বলে সব ছেলে ওই ব্যারামে ভোগে এটা ভাবি অন্যায় আপনাদের।

সাধনা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, সত্যি অন্যায়। যে বিষয়ে কোনদিন পাঁচ মিনিট ভাবি নি, সে বিষয়ে বড় বড় কথা বলার রোগ আমাদের সত্যি আছে ভাই। হওয়ায় চড়ে বেড়াই তো আমরা।

তার এই বিনয়ে খুশী হয়ে সুমথ বলে, এবার ভাবছেন তো? ভাবতে হচ্ছে তো আজকাল? তবেই বুঝে দেখুন। আপনারা ঘরের কোণে জীবন কাটান, আপনাদের পর্যন্ত এসব না ভেবে উপায় থাকছে না। ছেলেরা কিরকম ভাবনায় পড়েছে ভাবুন তো? কী জানেন সাধনাদি, ছেলেদের দোষ নেই, ছেলেদের বিগড়ে দেবার জন্য ভীষণ চেষ্টা করা হয়।

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, শুধু ছেলেদের নয় ভাই। পরশুদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে ছিলাম। কী ভিড়! সিনেমা দেখে এসে মনে হচ্ছিল, দূর, এভাবে বেঁচে থাকাই মিছে। তার চেয়ে সব কিছু চুলোয় দিয়ে মজাদার রঙদার কিছু করা যাক।

সুমথ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসে সাধনাকে। বলে, আপনাকেও গেঁয়ো ভাবতাম। মাপ চাইছি!

সাধনা অনুযোগ দিতে রাখাল হেসে বলে, এটা তোমার ছেলেমানুষী গায়ের জ্বালা। মারব কাটব ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব—এসব বললেই কি বেশী শাসানো হত? না গালাগাল দিয়ে অপমান করলে বেশী ভয় পেত? দশজনের কথার জোরটা তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা কেন আগে থেকেই ধরে নেব যে আমরা বলার পরেও নিজের মতলব হাঁসিল করবার স্পর্ধা লোকটার হবে? আগে থেকে ভয় দেখাতে যাব কেন? তাতে আমাদেরি দুর্বলতা প্রকাশ পেত।

: প্রভাতবাবু শুনবে তোমাদের কথা?

: শুনবে না? ওর এটুকু বুদ্ধি নেই? সবাই বারণ করলে সে কাজটা যে করা যায় না, মূর্খেও এটা বোঝে।

সাধনা যতটা জ্বালা বোধ করেছিল রাখালের এই সামান্য কয়েকটি কথায় সেটা

একেবারে জুড়িয়ে যাবে, এটা যেন তার পছন্দ হয় না। অথচ রাখাল ঠিক কথাই বলছে —এটা না মেনে উপায় নেই নিজের কাছে।

সাধনার তাই অন্য একটা জ্বালা।

সে কি রাখালের চেয়ে সব দিক দিয়েই ছোটো? বিদ্যায় বুদ্ধিতে বাস্তববোধে আত্মসংযমে কর্মনিষ্ঠায়—মনুষ্যত্বে? মানুষ হিসাবে রাখালের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার কথাটা জীবনে আজ প্রথম মনে আসে সাধনার। বেকার রাখালের সঙ্গে এতবড় প্রচণ্ড সংঘাত গেল, ভেঙে প্রায় চুরমার হবার উপক্রম হল তাদের জীবন—কিন্তু তখনও এরকম তুলনামূলক আত্মসমালোচনার চিন্তা তার খেয়ালেও উঁকি মেরে যায় নি।

সে শুধু বিচার করেছে রাখাল কেমন মানুষ, কেমন স্বামী।

ভাঙনটা সামলে নেবার পর আত্মসমালোচনা অবশ্যই এসেছে। নিজের কতগুলি বড় বড় দোষ আর ভুল সে আবিষ্কার করেছে নিজেই। নিজের কাছে সে স্বীকার করেছে যে দোষ কেবল রাখালের একার ছিল না, নিজেও সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, ধৈর্য হারিয়েছিল, নিজের সুখ-দুঃখ অর্থাৎ স্বার্থটাই সবচেয়ে বড় করে ধরেছিল।

কিন্তু রাখালের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে নি।

মানুষ হিসাবে তুলনা।

মানুষের যেগুলি গুণ, মানুষ হিসাবে যাতে পরিচয় মানুষের, রাখালের সঙ্গে নিজের সেই গুণগত তুলনা। কোন গুণটা তার বা রাখালের আছে বা নেই, কোন গুণটার বিকাশ কতখানি হয়েছে তার আর রাখালের মধ্যে।

একটু ভেবে দেখবার অবসর চেয়ে প্রাণটা যেন ছটফট করে সাধনার।

এদেশের মেয়েরা পিছিয়ে আছে। সে তা জানে এবং মানেও। রাখালের তুলনায় সে কোনদিক দিয়ে কতখানি পিছিয়ে আছে একান্তে একটু হিসাব করে দেখার জন্য তার যেন ধৈর্য ধরে না।

কিন্তু সারাদিন খেটেখুটে শ্রান্তক্লান্ত মানুষটা বাড়ি ফিরেছে, জামাকাপড় ছেড়ে পাঁচ মিনিট একটু বিশ্রাম করছে—এখন ওকে এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া, আসন পেতে রুটি গেড়ে খেতে দেওয়া আর মন বুঝে ঘুমানোর আগে একটু গা ঘেঁষে যাওয়া ইত্যাদি কর্তব্যগুলি পালন না করে নিজের চিন্তা নিয়ে মশগুল সে কোন হিসাবে হয়?

যার খাচ্ছে যার পরছে যার ভাড়া-করা ঘরে মাথা গুঁজে আছে, মানুষ হয়ে তার জন্য এটুকু না করলেই বা চলে কী করে?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও আদান-প্রদানের একটা বাস্তব নিয়মনীতি আছে তো

মন কিন্তু মানে না।

জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেছে চার দিকে। রুটির থালা সাজিয়ে আনতে রান্নাঘরে যেতে উঠানটুকুতে যে জ্যোৎস্না পড়েছে সেদিকে তাকাতেও যেন ইচ্ছা হয় না, চোখ উঠে যায় জ্যোৎস্নায় আলোকিত ওই আকাশে। সাধনাও ভাবে যে এ কি আশ্চর্য ব্যাপার? অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির তফাত তো এই যে পৃথিবীর ঘরবাড়ি মাঠ পুকুর গাছপালা অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকা থাকে আর পূর্ণিমার চাঁদের-আলো-মাখা রূপ নিয়ে ধরা দেয় চোখে চোখ কেন পৃথিবীকে বাতিল করে আকাশে জ্যোৎস্নালোকের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়?

মেঘ আর চাঁদের আলোয় মেশানো শোভা হোক, অথবা নির্মেঘ আকাশের শোভা হোক?

বাইরে কড়া নড়ে।

রুটির থালা হাতে দরজার কাছে গিয়ে সাধনা শুধোয়, কে?

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বামাচরণ বলে, প্রভাতবাবু এসেছেন। রাখালবাবুর সঙ্গে দুটো কথা কইবেন।

একমুহূর্ত ভাবে সাধনা।

প্রভাতবাবুরাই কি তবে তাকে একান্ত একটু চিন্তা করার ছুটি এনে দিল?

অথবা কর্তব্য হিসাবে দরজা না খুলেই এদের বলবে, একটু দাঁড়ান, উনি খেতে বসেছেন, আসছেন? বলে শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্ষুধার্ত রাখালের সামনে রুটি তরকারির থালাটা ধরে দিয়ে সে খেতে আরম্ভ করলে ধীরে সুস্থে বলবে যে বাইরে কে বুঝি তোমায় ডাকছে?

শ্রান্তি?

ক্লান্তি?

ক্ষুধা?

চুলোয় যাক সব!

সাধনা দরজা খুলে দেয়।

বলে, আসুন।

ভরা জ্যোৎস্নায় তার দিকে চেয়ে প্রভাত যেন থতমত খেয়ে ভড়কে যায়।

আমতা-আমতা করে বলে, রাখালবাবু আছেন?

তখন খেয়াল হয় সাধনার। হায়, ছুটি পাবার আশায় দিশে হারিয়ে সে

একেবারে ভুলে গেছে যে সে তার বোয়ের চাকরিতে ডিউটি করছে। আশাবা শুয়ে পড়েছে দরজায় খিল দিয়ে। সায়া ব্লাউজ খুলে ফেলে রেশন-মার্কা সুপারফাইন নতুন শাড়িটা শুধু গায়ে জড়িয়ে সে রেশনের গমভাঙা রুটি আর আলু পেঁয়াজের তরকারি থালায় নিয়ে খেতে দিতে যাচ্ছিল রাখালকে।

কিন্তু ভুল হয়ে গেছে, উপায় কী।

একটু দাঁড়ান, আমি ভদ্রমহিলা সাজ, বলে তো আর এদের সামনে সায়া ব্লাউজ গায়ে চড়ানো যায় না।

সাধনা স্পষ্ট সহজ ভাবে বলে, ভেতরে আসুন, উনি ঘরে আছেন। খেতে বসেছেন।

বলে সে নিজে এগিয়ে যায়। তার নিজের হাতে তৈরি পাশাপাশি লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা আর সরস্বতীর বাহন হাঁস আঁকা আসনে উপবিষ্ট রাখালের সামনে থালাটা নামিয়ে দেয়।

বলে, প্রভাতবাবুরা তোমার সঙ্গে কথা কইতে এসেছেন।

বলে, প্রভাতবাবু আর বানাচরণকে ডেকে বলে, আসুন, ঘরে আসুন। চেয়ার চেয়ার নেই, খাটেই বসুন দুজনে। উঠছ কেন তুমি? খেতে খেতেই কথা বলো না এঁদের সঙ্গে।

বাইরে সাধনার বিছানার চাদরটা শুকোচ্ছিল, সেটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়।

আশা দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কে এল?

সাধনা একটু গর্বের সঙ্গেই বলে, প্রভাতবাবু ওর সঙ্গে কথা কইতে এসেছেন। কলোনির ব্যাপার নিয়ে বোধ হয়।

এতেই আত্মসচেতন হয়েছে সাধনা আজকাল যে আশার কাছে এই গর্বপ্রকাশ তার নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে ভাবে, আমার হয়েছে কী? কী নিয়ে আমি ফুটানি করলাম আশার কাছে?

প্রভাতের মত লোক তাদের বাড়িতে এসেছে বলে অথবা পাড়ার মধ্যে রাখাল এত সম্মান পেয়েছে বলে তার অহঙ্কার—সাধনা বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ হাতে কেনা পাওয়ার মত কোন কারণেই যে বুকটা হঠাৎ তার বেশ একটু ফুলে উঠেছে, নিজেকে এতটা তলিয়ে বুঝবার সাধ্য সাধনার জন্মে নি।

তা হলে অনেক সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠত তার কাছে, অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেত।

তার আত্মচিন্তা আর আত্মসমালোচনাও যে কোন চেতনার প্রক্রিয়ার পাক

খাচ্ছে সেটা ধরা পড়ে যেত তার কাছে। রাখালের সঙ্গে তুলনায় নিজে ছোট মনে হবার বদলে কী যে তাকে পিছনে কোথায় ঠেলে রেখে দিয়েছে সেটা জানতে পারত।

কী কথা হয় শোনার জন্য আশাও দরজার কাছে তার পাশে দাঁড়ায়।

প্রভাত বলে, অসময়ে এসে আপনাকে আমরা বিরক্ত করলাম। আপনি খেয়ে নিলেই পারতেন।

রাখাল বলে, খাব'খন সেজন্য কী। মেয়েদের বুদ্ধি তো, দুজন ভদ্রলোক বাড়িতে এসেছেন, পরে খাবারটা দিলেই হয়। বলে গেলেন, রুটি চিবোতে চিবোতে কথা বলো! ভাত হলে তবু তাড়াতাড়ি গেলা যেত।

বামাচরণ বলে, তা যা বলেছেন দাদা! রুটি চিবোতে চিবোতে চোয়ালে ব্যথা হয়ে যায়! ক বছর বাদে দেখবেন বাঙালীর মুখের চেহারা পালটে গেছে। রোজ মুখের নতুন রকম ব্যায়াম হচ্ছে তো!

বলে সে সশব্দে হাসে।

প্রভাত বলে, তাহলে আর আপনার দেরি করিয়ে লাভ নেই, কথাটা সেরে ফেলা যাক। সেদিন আপনারা দশজনে গেলেন, সকলের সামনে আর ওকথা তুললাম না। আপনারা ধরে নিয়েছেন, গোলমাল বুঝি আমিই করতে চাই। আমার মশাই হাঙ্গামা করে লাভ? সে দিনকাল কি আর আছে যে জমিদারী দাপটে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেব? কথাবার্তা বলে ন্যায়সঙ্গত একটা মীমাংসা হোক, তাই তো আমি চাই!

রাখাল বলে, সেটাই তো ভাল কথা।

: আপনারা সেদিন আমায় বলে এলেন, হাঙ্গামা যেন না হয়। হাঙ্গামা করার কথা আমি ভাবিও নি। কিন্তু এদিকে কলোনির লোকেরা যে আমায় পিটোবে বলে শাসাচ্ছে সেটা তো আপনারা দেখছেন না?

: সে কি কথা? কলোনির লোকেরা যদি গোলমাল করে, আমরা দশজনে ওদেরও নিশ্চয় শাসন করে দেব।

সাধনা চুপ করে থাকতে পারে না।

ভিতরে গিয়ে সোজাসুজি প্রভাতকে বলে, কিন্তু ওরাই বা মিছিমিছি আপনাকে পিটোতে চাইবে কেন প্রভাতবাবু?

বিছানার চাদর-জড়ানো ঘরের বৌকে কলোনিবাসীর পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়াতে দেখে প্রভাত একটু ভড়কে যায়। তার হয়ে বামাচরণ বলে, সেই কথাই বলছি আমরা। উচিত কি অনুচিত বিবেচনা করবে না, কোন কথা শুনবে না, ওদের

জিদ বজায় রাখবে। এইখানে জমি দখল করে থাকবে, আর কিছু বিবেচনা করতে রাজী নয়। নড়তে বললে মাথা ফাটিয়ে দেবে, মারামারি করবে।

: ওরাই বা কোথায় যায় বলুন? একবার নিরাশ্রয় হয়েছিল, কুঁড়েঘরে মাথা গুঁজে আছে। আবার নিরাশ্রয় হতে বলেন ওদের?

: ওই তো মুশকিল, ওরাও ঠিক এমনি একগুঁয়ের মত কথা বলছে। আমরা ওদের নিরাশ্রয় হতে বলছি কি বলছি না—

: যেখানে উঠে যেতে বলছেন, সেখানে মানুষে থাকতে পারে না।

বামাচরণ অসহায়ের মত একটা নিশ্বাস ফেলে। গভীর আপসোসের সঙ্গে বলে, আপনিও সব কথা না শুনেই একটা সিদ্ধান্ত করে বসছেন—কী আর বলা যায় বলুন?

বাগাল এবার বিরক্তি জানিয়ে সাধনাকে বলে, তুমি আবার তর্ক জুড়লে কেন। ওঁরা কী বলছেন শোনা যাক আগে।

সাধনা চুপ করে থাকে।

বামাচরণ প্রভাতের দিকে তাকায়।

প্রভাত বলে, তুমিই বলো।

বামাচরণ বলে, দেখুন এ ভদ্রলোককে আপনারা একেবারে ভুল বুঝেছেন কলোনির লোকেরাও ভুল বুঝেছে, আপনারাও ভুল বুঝেছেন। কলোনির ওদের ও জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা এঁর মতলব নয়, ইনি যে প্ল্যান করেছেন সেটা ওদের মঙ্গলের জন্য। এঁর কি স্বার্থ নেই? নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে, শুধু ওদের মঙ্গল করার জন্যই ইনি প্ল্যানটা করেন নি। এঁর স্বার্থও বজায় থাকবে, কলোনির ওদেরও একটা স্থায়ী ভাল ব্যবস্থা হবে—এই জন্যই এঁর এত উৎসাহ।

: প্ল্যানটা কী?

বামাচরণ ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করে শোনায়। আসল ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয় কিন্তু সে এমনভাবে বলে যেন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে শ্রোতা দুজনের মাথায় ঢুকবে না।

কলোনির জমিতে প্রভাত একটা কারখানা গড়বে। স্টোভ, ল্যাম্প, লোহার উনান, বালতি ইত্যাদির কারখানা। কারখানার সঙ্গে সে তৈরি করবে খাটুয়েদের বসবাসের জন্য বড় একটা ব্যারাক। এই কারখানায় সে কাজ দেবে কলোনির লোকদের—যতজন কাজ করতে চায়। ব্যারাকের পাকা ঘরে তারা বাস করতে পারে।

বামাচরণের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে প্রভাত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মুখপাত্র

থামতেই সে বলে, ফ্যাক্টরির প্ল্যানটা আমার, অনেকদিনের লাইসেন্স নেওয়াই আছে। এইসব মানুষগুলির কথা ভাবতে ভাবতে যখন মনে হল যে ফ্যাক্টরিটা স্টার্ট করে দিলে এদেরও আমি একটা হিল্লে করে দিতে পারি তখন ভাবলাম, তা হলে আর দেরি করা উচিত নয়। এখানে আর কজন লোক থাকে? সকলেই অবশ্য ফ্যাক্টরিতে আসবে না, কেউ কেউ এদিক ওদিক অন্য কাজে ভিড়ে গেছেন। বেশীর ভাগ লোককেই আমি কাজ দিতে পারব— তবে আরও লোক আমার দরকার হবে।

রামাচরণ বলে বাইরের লোক কিছু নিতে হবেই। এরা সবাই আনাড়ি কাজ শেখাতে হবে। কিছু কাজ জানা লোক ছাড়া তো ফ্যাক্টরি চলবে না।

রাখাল বলে, আপনার এ প্ল্যানের কথা তো ব[illegible]নি প্রভাতবাবু?

: শুনতে না চাইলে কাকে শোনাব বলুন? এদের বলতে গেলাম, [illegible] ভবিষ্যতে উপকার হবে, ছ মাস আট মাসের জন্য ভিটে ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় থাকবে যাও। শুনেই সবাই [illegible]—তাড়াবার চাল [illegible] আমার মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে! কাকে কী [illegible] বলুন?

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, ওদের যেখানে যেতে বলছেন, [illegible] করবেন না?

রামাচরণ [illegible]

: কর্তা। [illegible] ও [illegible] পাঁচ [illegible] বছর পরে প্রভাতবাবুকে ছেড়ে দি[illegible] আপনারা কেউ [illegible] ওখানে কিছু বোঝার হুকুম নেই বুঝলেন?

সাধনা মুখ বাঁকিয়ে বলে কী যে সব গোলমেলে ব্যাপার।

রামাচরণ সায় দিয়ে বলে, ঠিক বলেছেন দিদি। গভর্নমেন্টের [illegible] মানেটা আমরা বুঝতে পারব? সব গোলমেলে ব্যাপার।

রামাচরণের মুখে গভর্নমেন্টের সমালোচনা শুনে সাধনা কী বলবে ভেবে পায় না।

রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, সত্যিই যদি আপনি এটা করতে চান প্রভাতবাবু—

: সত্যিই চাই মানে— ?

রাখাল শান্তভাবেই বলে, ওভাবে নেবেন না কথাটা। আমি বলছি দশজনকে কনভিন্স করানোর কথা। আপনার প্ল্যান খুব ভাল, সকলের খুশী হয়ে মেনে নেবার কথা। কলোনির ওরা এত কষ্ট করছেন —কয়েকটা মাস একটু খারাপ জায়গায় গিয়ে থেকে যদি ভবিষ্যতের উপায় হয়, ওঁরা এক কথায় রাজী হবেন।

কিন্তু বোঝেন তো, নানা লোকের মনে নানা প্রশ্ন জাগবে। আপনি যদি শেষ পর্যন্ত কিছু না করেন—

প্রভাত বলে, তা হলে আর মীমাংসা কী করে হবে বলুন? আমি কারখানা দেব, ওঁরা আমার জমি আটকে রাখবেন, এ তো আর হয় না! আমি বাধ্য হয়েই যেভাবে পারি ওদের তুলে দেবার চেষ্টা করব।

রাখাল বলে, সকলকে যদি ডাকা যায়, আপনার কথাটা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে রাজী আছেন? কারখানায় ওদের সকলকে কাজ দেবেন, ব্যারাকে থাকবার ব্যবস্থা করবেন—এসব জানিয়ে দেবেন?

: নিশ্চয়!

প্রভাত ও বামাচরণ চলে যাবার পর রাখাল খেতে বসলে সাধনা বলে, তুমি যে বড় একটা দায়িত্ব নিলে বুঝতে পারছ?

: আমার কী দায়িত্ব?

: তুমিই তো ডাকবে সকলের মিটিং? তোমার সেই মিটিংয়েই তো প্রভাতবাবু ওর প্ল্যানের কথা বলবেন আর ওদের জমি ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে? তোমাকে দায়ী করবে না লোকে?

মুখের চিবানো রুটি গিলে রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, তাই তো!

আজ সে আচমকা টের পায় যে দশজনের ব্যাপারে এগিয়ে গেলে দায়িত্ব ঘাড়ে চাপবেই।

সে হয়তো স্থির করবে না কিছুই, কী করা উচিত বা অনুচিত কোন পরামর্শও দেবে না, শুধু প্রভাতের প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্য অগ্রণী হয়ে দশজনকে একত্র জড়ো করাবে।

তবু, সেই দশজনের জমায়েতে যে সিদ্ধান্ত হবে তার জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব থাকবে তার!

কেন সে দশজনকে জড়ো করতে এগিয়ে গিয়েছিল? চুপচাপ গা বাঁচিয়ে না থেকে কী তার প্রয়োজন হয়েছিল দশজনের ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার? নিজের কাজ করে যাক আর চুপচাপ নিজের ঘরের কোণে বসে থাক—কেউ তাকে কোন বিষয়ে দায়ী করবে না।

কিন্তু দশজনের ব্যাপারে এক পা এগোলে দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে না।

দশজনের ভালমন্দ তো ছেলেখেলা নয় যে দায়িত্ব এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে ভাল করতে আসরে নামা যাবে।

নাম কেনা যাবে সস্তায়।

সাধনা তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে বলে, দেখো একার বুদ্ধিতে কিছু করা আমার মত নয়। মিটিং ডাকার কথাটা প্রভাতবাবুদের বলা তোমার উচিত হয় নি। আগে পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর ভাল মনে করলে জানালেই হত। তুমি হুট করে মিটিং ডাকার দায়িত্বটা নিয়ে বসলে।

: তুমি থামো। দোহাই তোমার।

: কেন, অন্যায় কথাটা কী বললাম?

: অন্যায় কথা বলো নি। আমায় একটু রেহাই দাও।

মেজাজ বিগড়ে গেছে রাখালের। তার দায়িত্বের কথাটা সাধনা মনে পড়িয়ে দিয়েছে বলে নয়, মনে পড়িয়ে দিয়ে সমালোচনা জুড়েছে বলে। চুপ করে থাকলে রাখালের রাগ হত না। জের টেনে টিপ্পনী দিতে আরম্ভ করায় সেটা অসহ্য হয়ে উঠেছে রাখালের।

কারণ, সাধনার কথাগুলি যেমন ঠিক, তেমন বেঠিকও বটে। একথা সত্য যে একার বুদ্ধিতে কাজ করা ভাল নয়, কিন্তু তাই বলে কখনো কোন অবস্থায় কেউ কোন ব্যাপারে নিজের বুদ্ধিতে দায়িত্ব নেবে না, তাহলেই বা চলবে কী করে?

দায়িত্ব যদি সে নিয়ে থাকে, নিয়েছে। সেজন্য এত সমালোচনা করা ও উপদেশ ঝাড়ার দরকার কী সাধনার? এই হল রাখালের রাগের কারণ।

অবশ্য মনটাও তার ভাল ছিল না, শরীরটা ছিল খুব শ্রান্ত।

রান্নাঘরে হেঁসেল গুছানোই ছিল। তবু সেখানেই যায় সাধনা। আর কোথাও গিয়ে একটু একা হবার জায়গা তার নেই।

সে শুধু ছোট নয়। রাখালও তাকে ছোটই ভাবে। আজ তার চরম প্রমাণ দিয়েছে। ঘর-সংসার বা ব্যক্তিগত সুখদুঃখ স্বার্থের কথা নয়। কলোনির মানুষগুলি সম্পর্কে তার আগ্রহের খবর রাখাল রাখে। ওদের ভালমন্দের প্রশ্ন নিয়ে ঘরোয়াভাবে তার সঙ্গে আলাপ করতে রাখাল নারাজ নয়—শুধু এ প্রশ্ন কেন, দাম্পত্য আলাপ আলোচনার স্তরে দেশবিদেশের সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে রাখালের আপত্তি হয় না।

কিন্তু কলোনির ওই মানুষগুলির বাস্তব প্রত্যক্ষ সমস্যা নিয়ে দাম্পত্যালাপের বদলে সমালোচনা ও পরামর্শ শুরু করা মাত্র ছোট মুখে বড় কথা শুনেই রাখালের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে।

প্রভাত ও বামাচরণকে সরাসরি ঘরে এনেছিল বলে রাখাল বিরক্ত হয়েছিল। ভেবেছিল, মেয়েমানুষের আর কত বুদ্ধি হবে। বিরক্ত হয়েছিল কিন্তু রাগ করে নি।

এখন সাধনা বুঝতে পারে রাখালের রাগ হয়েছিল তখন যখন সে যেচে মাথা গলিয়েছিল তাদের আলোচনায়, সরাসরি প্রভাতকে প্রশ্ন করেছিল, তর্ক জুড়েছিল।

আরও একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে সাধনার কাছে।

পাড়ায় এত লোক থাকতে প্রভাতেরা তাদের ঘরে এসেছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে—আশার কাছে এজন্য রীতিমত সে গর্ব বোধ করেছিল।

গর্ব সে একাই বোধ করে নি।

রাখালের কাছেও এ একটা স্মরণীয় ঘটনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নেতা হিসাবে গণ্য হবার অভিমানের স্বাদ পেয়েছে রাখাল—প্রভাত ও কলোনিবাসীদের সংঘাতের একটা মীমাংসা করার দায়িত্ব পেয়ে সে সুখী বই অসুখী হয় নি।

তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে সে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল। আসলে একটা জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার জন্য রাখালের দুশ্চিন্তা জাগে নি। কিভাবে সে কী ব্যবস্থা করবে এসব কথাই সে ভাবছিল গভীরভাবে।

দুর্ভাবনায় নয়, এই ভাবনায় ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল তার মুখ।

এ ব্যাপারে রাখাল এগিয়ে যাবে। কিন্তু তার উপদেশ ও পরামর্শ শুনতে সে রাজী নয়।

অথচ কাজে রাখাল সাধনার উপদেশ অনুসারেই চলে। সাধনা তাকে অন্যের সাথে পরামর্শ করতে বলে ছল এটা অবশ্য খেয়াল না রেখেই।

নিজেই সে হিসাব করে। এবং হিসাব করে পরদিন সকালে যায় সুমতির কাছে।

সুমথ তখন সুমতির কাছে সাধনার সঙ্গে তর্কাতর্কির গল্প করছিল।

সুমতি খুশীতে গদগদ হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে না বলে রাখাল একটু ক্ষুণ্ণ হয়।

সুমথের উপস্থিতিটা তার পক্ষে বরদাস্ত করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুমতি বলে, আসুন রাখালবাবু। সকালবেলাই যে?

: একটু দরকারী কথা ছিল।

বলে সে সুমথের দিকে বিশেষভাবে তাকাতে আরম্ভ করতে না করতে সুমথ যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

: কী কথা বলুন?

সব কথা খুলে বলার ইচ্ছা রাখালের ছিল না। সুমতিকে মোটামুটি প্রভাতের প্ল্যানের কথা জানিয়ে মিটিং ডাকতে তার সাহায্য চাইবে ভেবেছিল।

কিন্তু সুমতির সঙ্গে পারা দায়।

সে জেরা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জেনে নেয়।

তারপর মন্তব্য করে, ওদের কোন মতলব আছে। নইলে এ প্ল্যানের কথা এ্যাদ্দিন চেপে রেখেছিল কেন? ওদের তো নিশ্চয় জানাত, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তোমাদের তাড়াচ্ছি।

রাখাল বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

: তবে মিটিং ডাকার ভার নিলে কেন?

সুমতি শুধু প্রশ্ন করছে। সাধনা স্পষ্ট নিন্দা করেছিল। কিন্তু দুজনের কথার সুর যেন একই।

রাখাল ভেবে চিন্তে বলে, মিটিং ডাকাই তো ভাল? আগে ওদের অন্যরকম মতলব ছিল, সে তো জানা কথাই। জোর জবরদস্তি করে সকলকে ভাগাবার মতলবে ছিল। কিন্তু যাই হোক, সে সব মতলব তো ছাড়তে হয়েছে। এখন সকলের সামনে যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে কারখানা গড়বে, সকলের কাজ দেবে—খানিকটা করতে হবে নিশ্চয়। একেবারে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবে না।

: ওদের বিশ্বাস কী?

: কিন্তু আর কী জবাব আছে বলুন? এভাবে তবু ওদের খানিকটা বাঁধা যাবে, ওদের নিজেদের কথায়। কিছু না করে পারবে না কলোনির লোকদের জন্য। অন্যদিকে দেখুন, ওদের এ প্ল্যানটা না মানলে ওরা কি ছেড়ে কথা কইবে? যেভাবে পারে কলোনির লোকদের তাড়াবেই। গুণ্ডা লাগাবে, পুলিস আনবে—

: সেই ভয়ে—?

: ভয়ে নয়। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। আপনি আমি প্রাণপণ করেও ওদের কি রাখতে পারব এই জমিতে? ধরুন, আপনি আমি রক্ত দিয়ে ওদের ওখানে রাখলাম, কুঁড়েগুলি টিঁকিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপর? দু-চার হাত জমিতে হোগলার ঘর তুলে বুনো অসভ্যের মত ওদের জীবন কাটবে, এটাই কি আমরা চাই? প্রভাতবাবুর জমিতে এভাবে মাথা গুঁজে থেকেই কি এদের মোক্ষলাভ হবে? মানুষ হয়েও এরকম অমানুষের মত বাঁচার জন্যই কি এরা লড়াই করবে, আর আমরা সেটাই আদর্শ বলে ধরে নেব?

সুমতি চেয়ে থাকে।

রাখাল বলে, ভিখারীরা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে। ভিক্ষা না দিলে ভিখারীরা বাঁচবে না, সকলে ওদের ভিক্ষা দিন—এই বলে কি আমরা আন্দোলন করব? কলোনির ওরা বিপাকে পড়েছে সত্যি। কিন্তু আমরা কি কলোনিটা

কোনরকমে বজায় রাখতে আর সব ভুলে গিয়ে প্রাণ দেব ? এদিকে যে দুর্ভিক্ষে লাখ লোক মরছে ?

সুমতি বলে, আপনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন।

রাখাল বলে, মাথা আমারও ঘুরছে ! রামরাজ্যে হনুমান না হয়ে মানুষ হ.. চাইলে মাথা ঘুরবেই।

পাড়ার দু-চারজনের সঙ্গে রাখাল কথা বলে।

বীরেন ছাড়া বাকি কজনেই আপিস-গামী মানুষ। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা জীবন— বাসে দারুণ ভিড় হয় বলে কত মিনিট বাড়তি সময় রিজার্ভ রাখা দরকার তাও হিসাবে বাঁধা। রাখাল সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে, তারা অল্প কথায় সায় দেয়। রাখাল দায়িত্ব নিয়ে যা করবে তাতেই তাদের সম্মতি আছে।

দোকান বাজার রেশন ইত্যাদি জরুরী কর্তব্য সারতে হবে আপিস যাওয়ার আগে, বিস্তারিত আলোচনার সময় নেই

রাখাল আর সে রাখাল নেই। আগে সে ভেবে বসত যে সবাই এরা ... বা চেয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে চায়, গণ্ডগোলে কাজ নেই! কিন্তু আজ সে জা... যে এরা বড়ই বিব্রত এবং ব্যতিব্যস্ত কিন্তু সেইজন্য সমর্থন জানিয়ে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা এটা নয়।

তাকে এরা বিশ্বাস করে। এরা জানে এ ব্যাপারে তার নিজের কোন স্বার্থ নেই। ভুল সে করতে পারে কিন্তু কোন রকম মতলব হাসিল করার বজ্জাতি তার দ্বারা সম্ভব হবে না।

এটুকু বিশ্বাস যাকে করা যায় না তেমন কেউ এলে এদের রকম সে... বদলে, অগ্রিম চালাও সমর্থন জানিয়ে দেবার পরিবর্তে একেবারে অন্য ভাবে কথা বলত!

বিনয় যেন প্রায় কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বলে, হ্যা দাদা, আপনি একটু লাগুন হাঙ্গামা টাঙ্গামা যাতে না হয় দেখুন। আমরা আপনার সাথে আছি।

বাড়ওলা বীরেনের অনন্ত অবসর। সময় কাটতেই চায় না —অতিভোগে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভোগশক্তির ভোঁতা মন্থর দিনগুলি কাটানোই তার দারুণ সমস্যা।

রাখালকে সে যেন আঁকড়ে ধরে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে যেন জানার চেষ্টা করে রাখালও যা জানে না, কতরকম যে মন্তব্য করে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

রাখাল শেষে ধৈর্য হারিয়ে বলে, প্রভাতবাবু আর বামাচরণ তো আপনার সঙ্গ পরামর্শ করে গেছেন দত্তমশাই। আপনি তো সবই জানেন?

অন্য লোকে লজ্জা পেত কিন্তু লজ্জাশরম সবই ভোঁতা বীরেন দত্তের।

: আহা:, সেই জন্যেই তো, সেই জন্যেই তো। ওরা একরকম বলে গেল সেই তো জানতে চাইছি আসল ব্যাপারটা কী। আপনি তো আর ... ক... করবেন না? আপনার স্বার্থ কী?

ভিজে কাপড়ে বিশ-বাইশ বছরের একটি মোটাসোটা মেয়ে এসে বলে, ... দিক নাইতে নাইতে কল বন্ধ করে দিলে।

ক্রোধে লতিকার বিস্ফারিত চোখমুখ—দেহের গড়ন যেমন হোক মুখখানা ...মার মুখের মত সুন্দর—দিশেহারা রাগে এখন অবশ্য কুৎসিত দেখাচ্ছে। সাবানের ফেনা লেগে আছে গলায় আর কাঁধে পিঠে।

: কে বন্ধ করলে? ব্যাটাছেলে?

: না। অঞ্জলি। বললে কি জানো? ওপরের কলে নিজেদের বলে নাইবে ... এসব ট্যাকটিক্‌স আমরা জানি। আমায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে পার্টি ... বলে। ট্যাকটিক্‌স মানে কী বাবা?

অন্তরীক্ষ থেকে মেয়েলী গলায় মন্তব্য আসে—সকলকে শোনানোর মত জোরালো মন্তব্য: টিপটিপ জল পড়ে কলে, বালতি ভরতে আধ ঘণ্টা লাগে, উনি নিজেদের কল ছেড়ে আধঘণ্টা ধরে নাইতে এসেছেন। এসব মতলব আমরা যেন বুঝি নে!

বীরেন সখেদে বলে, বাড়ি বলুন, জমি বলুন, ভাড়া দেওয়া ঝকমারি মশায়। দেশের আইন হয়েছে তেমনি। যে দখল করেছে তারই দখলীস্বত্ব।

রাখাল হেসে বলে, না মশাই, না। তা হলে তো সত্যিকারের বাপবাজা হয়ে ...ত। জমিটমি সব জমিদার জোতদারেরই আছে যারা চাষ আবাদ করে, তারা আর দখলীস্বত্ব পেয়েছে জমিতে? বাড়িভাড়ার আইন তো আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে মশায়।

বীরেন দত্ত কথাটা বুঝতে একটু সময় নিতে চায়। তার মোটাসোটা মেয়েটা ...ক্ষণ ভিজে কাপড়টা টেনেটুনে লজ্জা করার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করতে করতে ফোঁস করে বলে, আমাদের বাড়ি, বাবা গাঁ্যাটের পয়সা খরচ করে বাড়ি করেছে, ... হয়ে যেতে বললে যায় না কেন ইয়ের ব্যাটাবেটীরা?

: কেন যাবে? ভাড়া তো দিচ্ছে।

: ভাড়া চাইনে। দয়া করে দূর হয়ে যাক।

বীরেন দত্ত এতক্ষণে মুখ খোলে, খকখক করে কাশতে কাশতে হাত তুলে তাদের বাজে তর্ক থামাতে বলতে বলতে দিশেহার মত হঠাৎ উঠে গিয়ে রঙীন কাচের আলমারি খুলে কী একটা ওষুধ মুখে পুরে দেয়। আস্তে আস্তে কাশিটা থামে।

: কী বলছিলেন কথাটা? বাড়িভাড়া আইনটা না হলে আমরা বাড়িওলারাই মারা পড়তাম?

: পড়তেন বৈকি! আপনাদের লোভের সীমা নেই, লিমিট রাখতেন না, বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছাড়তেন। ফলটা হত উলটো।

: কী রকম?

: মানুষ ক্ষেপে যেত। যতটা শোষণ করতে পারছেন, তাও পারতেন না। শোষণ করারও রীতিনীতি আছে তো? একটা সীমা বজায় রাখতে হয়। আপনাদের লাভ ঠেকাবার জন্য নয়, অসম্ভব লোভ করতে গিয়ে আপনারা পাছে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেন, সেটা ঠেকাবার জন্য আইন হয়েছে।

বীরেন দত্ত বাঁকা হাসি হাসে।

: আপনাদের কী আর বলব মশাই, আপনারা নাকের ডগাটি শুধু দেখতে পান! বলি, লিমিট বজায় রাখার জন্যই যদি আইন, শুধু বাড়িভাড়ার বেলা এত কড়াকড়ি কেন? চোরা কারবারের লাভে বুঝি লিমিট লাগে না? কাপড়ের লাভে? চিনির লাভে?

: ওসব অব্যবস্থা—

: ওসব অব্যবস্থা থাকতে পারে—বাড়িভাড়ার বেলাতেই ব্যবস্থাটা জরুরী হয়ে উঠল! ওই যে বললাম, নাকের ডগা ছেড়ে আপনাদের চোখ চলে না! বাড়িওয়ালা যদি লাখপতি কোটিপতি হত, তাহলে আর এ আইনের বালাই থাকত না। মুনাফা যারা লুটছে তারা বাড়িভাড়ার পিত্যেশ করে না। ইয়া বড় বড় বিল্ডিং-এ কটা প্রাণী বাস করে? ইচ্ছে করলে পঞ্চাশটা ভাড়াটে বসাতে পারে,—বসায়?

লতিকা ফোড়ন কাটে, কেন ওঁর সঙ্গে তর্ক করছ বাবা? উনিও ভাড়াটে বাড়িওয়ালাদের খারাপ ছাড়া ভাল ভাবতেই পারবেন না। উনি ভাড়াটে দেখবেন—বাড়ি করতে কত খরচ হয় সে হিসেব ধরবেন না।

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না রাখাল। কলোনির দিকে চলতে চলতে ভাবে, বাড়িওয়ালারা কি মাঝারি আর ছোটো ব্যবসায়ীদের দশায় পড়েছে? এদিকটা চিন্তাই করা হয় নি একেবারে!

সাধনাকে ঘিরে বৈঠক গড়ে উঠেছে কলোনির অধিকাংশ লোকের আর সাধনার অদম্য সাধ জাগছে রাখালের কিছু করার আগেই প্রভাত আর বামাচরণের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিতে।

কিন্তু মুশকিল এই, চক্রান্তটা কী সে ঠিক জানে না।

সকলে যখন প্রশ্ন করবে সে জবাব দেবে কী ?

রাখালের সঙ্গে প্রভাতদের পরামর্শের কথা উল্লেখ না করে সে তাই ভাসাভাসা ভাবে তাদের সতর্ক করে দেয়, সবাই সাবধান থাকবেন কিন্তু। ভাববেন না শুধু গায়ের জোরে আপনাদের ভাগাবার চেষ্টা করবে। নানা রকম ফন্দিফিকির করবে, ভাল মানুষ সেজে এসে ভাঁওতা দেবে।

বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করে, শুনছেন কিছু ?

: স্পষ্ট কিছু শুনি নি। ভাসাভাসা ভাবে কানে আসছে।

ভুবন বলে, আমরা সাবধান আছি। তবে জানেন তো আমাগো কপাল।

অঘোর বলে, আপনেরা যদি সহায় থাকেন, দুষ্ট লোকের সাধ্য কী কিছু করে ?

রাজু বলে, আপনাগোই ভরসা করি। সরকার কন বড়লোক কন, কেউ আমাগো পক্ষে নাই।

সাধনা বলে, আপনারা শক্ত থাকবেন, নইলে আমরাই বা কী করব ? এখানকার লোকদের সঙ্গে কোন কারণে যেন ঝগড়া না হয় খেয়াল রাখবেন। কেউ কেউ ভাবে, আপনারা এসে দুর্দশা বাড়িয়েছেন। না বুঝে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। ক্ষতি এরা করবে না বিশেষ, তবে মুখে একটু খোঁচা-টোচা দিলে সয়ে যাবেন, এড়িয়ে চলবেন।

:, ঠিক কথা।

হে রাখাল, একবার তোমার সেই সাধনার রকম-সকম দেখো, এতগুলি লোককে সে কেমন উপদেশ দিচ্ছে শোনো। কোথায় ছিলে কোথায় আছ একবার খেয়াল হোক।

সুমতি, বীরেন আর বিনয়ের সঙ্গে রাখাল এসে সাধনাকে এই অবস্থায় দেখতে পায় কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলকে নিয়ে সে এক রকম জমিয়ে বসেছে এটুকুই তার নজরে পড়ে, তার কথাগুলি শুনতে সে পায় না।

রাখাল বিরক্ত হয়েছে বোঝা যায়।

: তুমি আবার এখানে কী করছ ?

: এঁদের সঙ্গে কথা কইছি।

চটাং করে জবাবটা দেওয়া হয়। রাখালের বিরক্ত হবার জবাবে। এবং সকলেই সেটা টের পায়।

রাখাল অনির্দিষ্টভাবে সকলকে উদ্দেশ করে বলে, এখানকার সকলকে একটু ডেকে আনুন, একটা দরকারী কথা আছে।

কয়েকজন যারা বাকি ছিল তারা এলে রাখাল প্রভাত সরকারের বক্তব্যটা তাদের কাছে পেশ করে এবং তারই জের টেনে আপসোসের সুরে শেষ করে, আপনারা নাকি প্রভাতবাবুর মাথা ফাটিয়ে দেবেন বলেছেন? দেখুন, আমরা আপনাদের হয়ে প্রভাতবাবুকে বলে দিলাম তিনি যেন কোন হাঙ্গামা না করেন, কিন্তু আপনারা যদি—

তার কথা শেষ হবার আগেই সাধনা মুখ খোলে।

: প্রভাতবাবু এঁদের মেরে তাড়াবেন বলেছিলেন। এঁরা তাই তাঁর মাথা ফাটাবার কথা বলেছিলেন। এঁরা যেচে তাঁকে শাসাতে যান নি।

বিনয় সেন বলে, থাকগে রাখালবাবু, ওকথা আর তুলবেন না।

রাখাল কথাটার জের টানে না। বিস্ময় আর অস্বস্তিমেশানো দৃষ্টিতে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে।

সুমতি বলে, আমরা একটা মিটিং ডাকব। প্রভাতবাবু সকলের সামনে তাঁর প্ল্যানের কথা বলবেন, লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবেন যে কারখানা আর ব্যারাক তৈরি হলে আপনাদের ফিরিয়ে আনবেন, কাজ দেবেন। আপনারা কী বলেন?

সহজে কেউ মুখ খুলতে চায় না। খানিক আগেই সাধনা তাদের সতর্ক করে দিয়েছে। প্রভাত হঠাৎ এরকম ভালমানুষ হয়ে যাবে এ বিষয়ে এমনিতেই তাদের যথেষ্ট সংশয় জাগত, সাধনা সাবধান করে দেওয়ার ফলে সেটা আরও জোরালো হয়েছে।

ভুবন সাধনাকেই জিজ্ঞাসা করে, আপনে কী কন?

শুধু তার একবার প্রশ্ন হলে কথা ছিল না, সাধনা কী বলে শোনবার জন্য এমন আগ্রহের সঙ্গেই সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে যে রাখালেরা সত্যই থ বনে যায়।

এদের উপর এত প্রভাব সাধনার!

আর সাধনা নিজেকে বোধ করে অত্যন্ত অসহায়।

: আমি কী বলব বলুন? আপনারা ভেবেচিন্তে ঠিক করুন।

সে যে তাদের মঙ্গল করতে চাওয়ার ফিকিরে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি করতে

চায় না এটা সকলে বুঝতে পারে, বুঝতে পারে কর্তালি করার সুযোগ দলেও সাধনা সে ঝাপ করে নিয়ে নেয় না বলে।

তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর কর্তালি করার জন্য কত রকমের কত লোক যে চেষ্টা করছে দিনরাত। দরদী সেজে মাভৈ মাভৈ বুলি আওড়াচ্ছে।

কাজেই তার মতামত শোনার আগ্রহ সকলের আরও বেড়ে যায়।

বিষ্ণু বলে, আপনে কী মনে করেন কন, তারপর আমরা পরামর্শ করুম।

সাধনা বলে, আমার মনে খটকা আছে। প্রভাতবাবুর কী মতলব জানি না, তবে গোলমাল তিনি নিশ্চয় করবেন। এদের একবার তুলে দিতে পারলে আবার ফিরে আসতে দেবেন মনে হয় না।

ঘরের কোণে তর্ক বিতর্ক নয়, ভেবেচিন্তে রাখাল যা করবে স্থির করেছে এখানে প্রকাশ্যে দশজনের সামনে সাধনা করছে তার বিরোধিতা।

ধীরেন বলে, না না, ওরকম মতলব থাকলে প্ল্যানের কথা ঘোষণা করতেন না, লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হতেন না। তা হলে অন্য ব্যবস্থা করতেন।

বনয় আমতা আমতা করে বলে, আমারও তাই মনে হয়। আইনের প্যাঁচে একটু ঠেকেছেন কিন্তু সেজন্য আটকাবে না, শেষ পর্যন্ত পুলিস এনে উনি আপনাদের তুলে দিতে পারবেন।

বিষ্ণু বলে, না, তা পারবেন না। উকিলের পরামর্শ নিয়েছি।

সাধনা বলে, পুলিস দিয়ে তাড়াতে পারলে কি প্রভাতবাবু এত প্ল্যান ভাজতেন?

রাখাল বলে, তোমার এসব কথা বলার দরকার কী?

সাধনা বলে, আমার যা মনে হয় বললাম।

সুমতি বলে, আমরা খবর নিয়েছি, কারখানা উনি সত্যিই করবেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আপনাদের বিষয়ে কথা ঠিক রাখবেন কি না বলতে পারি না, তবে এখানে কারখানা হবে এটা মিথ্যা নয়।

রাখাল বলে, তা হলে আর কথা কী? ঝগড়া করে আপনারা টিকতে পারবেন না। প্রভাতবাবুর প্ল্যান আপনারা যদি না মানেন, লোকে আপনাদেরই দোষী ভাববে। তখন প্রভাতবাবু যাই করুন, আপনাদের পক্ষ হয়ে কেউ কিছু বলবে না।

বিষ্ণু ভুবনেরা সাধনার দিকে তাকায়। সাধনা আবার অসহায় বোধ করে।

ভেবেচিন্তে সে বলে, ওটা হিসেব করেই অবশ্য প্রভাতবাবু প্ল্যানটা করছেন। আপনাদের ভাল করতে চান অথচ আপনারা সেটা মানছেন না শুনলে কিছু লোক

বিগড়ে যাবে সত্যি। তাই বলে সবাই যে আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে তার কোন মানে নেই। প্রভাতবাবুকেও তো জানে সবাই?

রাখাল আবার বিস্ময় ও অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

সাধনা ভেবেছিল, বাড়ি ফিরে একচোট বেধে যাবে রাখালের সঙ্গে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাখাল ও প্রসঙ্গই তোলে না। বোধ হয় সাধনাকে চটাতে সাহস পায় না। বিরক্ত ও গম্ভীর ভাবটা তার বজায় থাকে।

দুদিন পরে মিটিংটা বসবার আগে সাধনাকে কাপড় বদলাতে দেখে রাখাল প্রশ্ন করে, মিটিং-এ যাবে নাকি?

: যাব।

: বক্তৃতা করবে তো?

: আমায় আবার কবে বক্তৃতা করতে দেখলে?

: আগে দেখি নি, এবার হয়তো দেখব। কোন কথা পছন্দ না হলে উঠে বলতে আরম্ভ করবে।

: দরকার মনে করলে যদি বলিই, তাতে দোষ আছে কিছু? তুমি কি চাও না আমি বাইরে যাই, কুনো ভাবটা কাটিয়ে উঠি? অন্য মেয়ে যারা সভায় বক্তৃতা দিতে পারে তাদের তো খুব শ্রদ্ধা কর তুমি! আমার বেলা বুঝি উলটো নিয়ম?

রাখাল কাবু হয়ে বলে, তুমিও সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াও না, আমি কি বারণ করছি? আমি বলছিলাম, পাড়ার দশজনের সামনে আমায় যেন অপদস্থ করো না।

সাধনা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তোমার কথা শুনলে সত্যি রাগ হয় মানুষের। আমি অবশ্য খালি দেখতে যাচ্ছি কী হয়, কিন্তু তোমার মতে সায় না দিতে পারলে তুমি অপদস্থ হবে কেন?

: হব না? এক সভায় এক ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে বলছে—

: স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে বলছে না? স্ত্রী তাতে অপদস্থ হয় না?

: আহা এ মিটিং-এ তোমার তো বলার কথা নয়! আমিই কথাটা তুলব।

: তাতে কী এল গেল? তুমি বলবে না আমি বলব সেটাই কি বড় কথা? অতগুলি লোকের ভালমন্দের কথাটা আসল নয়?

রাখাল আর তর্ক করে না।

কিন্তু মিটিং-এ কলোনির মেয়েদের কাছে তাকে বসতে দেখে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সুমতি আর সাধনা ছাড়া পাড়ার মেয়েরা কেউ এ সভায় আসেনি,

আসবার কথা নয় তাদের। সুমতি তাদের কাছে বসতে পারল, কলোনির মেয়েদের গা ঘেঁষে ছাড়া সাধনা বসবার জায়গা খুঁজে পেল না।

ছোট সভা। পাড়ার কিছু লোক, কলোনির লোক, আর নাগদের কলোনির সমিতির কয়েকজন সদস্য হাজির আছে। রাখাল প্রথমে সভার আলোচ্য বিষয়টি উপস্থিত করে। ছোটোখাটো যেমন হোক, প্রকাশ্য সভাতে দাঁড়িয়ে রাখাল জীবনে এই প্রথম বক্তৃতা দেয়।

নিরপেক্ষ ভাবে সব কথা বলে ভালই গুছিয়ে মোটামুটি সে। কিন্তু সাধনার মনে হয়, নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা যেন সে করছে বাড়াবাড়ি রকম। প্রভাতের পক্ষেই যেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তার অতিরিক্ত নিরপেক্ষতা।

প্রভাত আর তার পরিকল্পনাকে একেবারে আকাশে তুলে দিয়ে বামাচরণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে।

শুনে বড়ই রাগ হয় সাধনার।

কে কী ভাববে না ভাববে সে সব কথা তার মনেও আসে না, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমরা প্রভাতবাবুর গুণকীর্তন শুনতে আসি নি। প্রভাতবাবু যে নিজের কথা রাখবেন, পরে গোলমাল করবেন না, তার গ্যারাণ্টি কী আছে সভায় স্পষ্ট করে বলা হোক। সেটাই আসল কথা।

সভা থমথম করে। রাখালের মুখ লাল হয়ে যায়। আমরা! শুধু কলোনির লোকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে বলে নি সাধনা, তাদের সঙ্গে যেন এক হয়ে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি না দিতে পারলেই প্রভাত খুশী হত, কিন্তু সাধনার জন্যই শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয় না।

প্রভাত বলে, এতগুলি ভদ্রলোকের সামনে আমি কথা দিচ্ছি, তাই কি যথেষ্ট গ্যারাণ্টি নয়?

সাধনা বলে, না। মুখের কথা দুদিন বাদে অদল-বদল করা যায়। আপনি নিজেই হয়তো ভুলে যাবেন কী বলেছিলেন, বলবেন, আমি এরকম বলি নি, ওরকম বলেছিলাম। লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে আপত্তি হচ্ছে কেন?

বামাচরণ লাফিয়ে উঠে বলে, কিছু না, কিছু না। আপত্তি কিসের?

পরদিন সকালে দেখা যায় তাদের বাড়ির সদর দরজার এবং পাড়ার অনেকগুলি দেয়ালে সাধনার নামে ছড়া কেটে পোস্টার আঁটা হয়েছে রাতারাতি।

বাড়ির কাছে কলোনিতে সুন্দর ছোঁড়া থাকে,

সাধনাদিদি পোষ মেনেছেন, পিরীতের দড়ি নাকে।

রাখাল দাদার আক্কেল গুড়ুম—

বাকিটা অশ্লীল।

বাসন্তী বলে, সত্যি আক্কেল গুড়ুম করেছিস ভাই। কী খিঙ্গি হচ্ছিস দিন দিন? পাড়া তোলপাড় হচ্ছে তোর কথা নিয়ে।

: কেন? সুমতি তো হরদম সভা করে বেড়াচ্ছে। আমি একদিন একটা সভায় একটু বলেছি, সবার তাতে টনক নড়ল কেন?

: তুই কি সুমতি? ওর বিয়ে হয় নি, কলেজে পড়ে, অনেককাল মিটিং করছে, ওরটা সয়ে গেছে সবার। সবাই জানে, ও ওই রকম। তুই ছিলি ঘরের বৌ, হঠাৎ একদিন সভায় দাঁড়িয়ে কোমর বেঁধে স্বামীর সঙ্গে লড়াই করলি—চারদিকে হৈ-চৈ পড়বে না?

: স্বামীর সাথে লড়াই? আমি তো ঝগড়া করলাম প্রভাতবাবুদের সাথে?

: লোকে বুঝি জানে না রাখালবাবু ওদের দলে? তাই তো বলছে সবাই যে কাণ্ড দেখো! দুপক্ষের ঝগড়া, স্বামী নিয়েছে এ পক্ষ, বৌ গিয়েছে অন্য পক্ষে! রাখালবাবু চটেন নি?

: কথা বন্ধ করেছে।

: করবেন না? তেমন সোয়ামী হলে চুলের মুঠি ধরে পিটিয়ে দিত।

: ইশ। সে দিন আর নেই।

: নেই? তুই হাসালি ভাই। এ পাড়াতেই দু-চার জন মাঝে মাঝে পিটোয়।

একথা সেকথার পর বাসন্তী হঠাৎ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, কলোনির সুন্দর ছোঁড়াটা কে ভাই?

সাধনাও হেসে বলে, কে জানে। ওরাও জানে না, তা হলে নামটা বসিয়ে দিত।

: কি বজ্জাত, অ্যাঁ? ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিবি না?

: কেন ছিঁড়ব? দশজনের ভাল লাগলে পড়ুক।

ছড়া পড়ে লোকে যে হাসাহাসি করে না এমন নয়, কিন্তু বেলা নটা নাগাদ দেখা যায় পাড়ার লোকেই একে একে পোস্টারগুলি সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সাধনাদের দরজায় লাগানো পোস্টারটাই বরং ছেঁড়া হয় সবার শেষে।

কয়েকদিনের মধ্যে কুঁড়েগুলি সরে গিয়ে কলোনির জমিটা শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে।

সাধনার মনে হয়, শূন্যতা লেপে যেন মুছে দেওয়া হয়েছে একটা ছাবকে।

কিছুদিন পরে ফাঁকা জমিটাতে তোড়জোড়ের সঙ্গে কারখানা তৈরির কাজ আরম্ভ হলে সে স্বস্তি বোধ করে।

প্রভাত সত্যই কারখানা গড়ছে বলে শুধু নয়। জায়গাটার শূন্যতা ঘুচে গেছে ব'লেও।

রাখাল কথা বন্ধ করুক, তার নামে ছড়া কেটে পোস্টার লাগানো হোক, পাড়ার মেয়েরা তাকে নিয়ে ঘোঁট পাকাক, একটা প্রায় বৈঠকের মত ছোটখাটো সভায় উদ্বাস্তুদের পক্ষ নিয়ে তেজের সঙ্গে একটু তর্ক করায় সাধনার কপাল একদিকে গেছে খুলে।

সভাসমিতির পক্ষে তার মূল্য টের পেয়ে গিয়েছে আশেপাশের সভাসমিতির উদ্যোক্তারা।

কয়েকদিন বাদেই প্রকাশ্য সভায় যোগদানের জন্য তাকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়। শ্রোতা হিসাবে নয়, কিছু বলার জন্য।

সুমতির সঙ্গে আসে মধ্য-যৌবনা একটি মহিলা। সাদাসিধে চেহারা, সাদা-সিধে বেশ, চোখ দুটির শান্তভাবের জন্য দৃষ্টি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ধরা পড়ে না।

গলার আওয়াজ ও কথা মার্জিত ও সুস্পষ্ট বলে মিষ্টতাটাও হঠাৎ খেয়াল হয় না।

সুমতি পরিচয় করিয়ে দেয়, ইনি প্রমীলা বসু, আপনার সাথে আলাপ করতে এসেছেন।

নামটা ভালভাবেই শোনা ছিল। সাধনা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে জীবনে সে কখনো নামকরা মানুষের সংস্রবে আসে নি, পুরুষ বা নারী।

নার্ভাস হয়ে সে শুধু বলে, আসুন, বসুন।

সাধারণ আলাপ-পরিচয় হতে হতেই সে অবশ্য ধাত ফিরে পায়। এরকম নেতৃস্থানীয়া মহিলাকে বিনা নোটিসে একেবারে ঘরের মধ্যে পাওয়া অভ্যাস ছিল না বলেই প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিল।

খানিক আলাপ করে প্রমীলা বলে, সামনের রোববার আমরা একটা মিটিং ডাকছি—হাইস্কুলের হলটাতে হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য কী ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখছেন তো? এমনিতেই এদেশে শিশুমৃত্যুর হার কীরকম, একটু দুধটুধ না পেয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের কী অবস্থা এসব তো আপনার জানাই আছে। তার উপরে আরও কতকগুলি বাড়তি কারণ ঘটে একেবারে শেষ করে

দিচ্ছে ওদের। যেমন ধরুন, বাঙালী ছেলেমেয়েদের রুটি সয় না। কিন্তু চাল কমিয়ে দিয়েছে, বাধ্য হয়ে খেতে হয়। চীন থেকে বিনা শর্তে চাল দিতে চায়, সে চাল নেবে না। দুধ যেটুকু জোটে তাতেও ভেজাল—

প্রায় জানা কথাই সব বলে প্রমীলা। অবস্থা যে কী ভয়ানক, বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই কারো জানতে আর বাকি নেই। কিন্তু বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের দিক থেকে সমস্যাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে সামনে ধরে বলে প্রমীলার কথা শুনতে শুনতে সাধনার মনে হয় সব জানা থাকলেও সে অবস্থাটা একেবারেই ধরতে পারে নি।

প্রমীলা বলে, সাধারণভাবে শিশুকল্যাণ আন্দোলন তো চলছেই। এই মিটিং-এ আমরা বিশেষভাবে জোর দেব—সহজে অবিলম্বে যেসব বিষয়ে প্রতিকার করা যায়। যেমন ওই চালের কথাটা। খাদ্যসমস্যা নিয়ে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো নিয়ে সাধারণ আন্দোলন চলছে—আমরা ও দিকে যাব না। আমরা শুধু দাবি করব, ছোটোদের কার্ডে চালের পরিমাণ বড়দের সমান করা হোক। এই ধরনের সব আলোচনা। আপনাকে যেতে হবে।

সাধনা জানে তাকে শুধু মিটিং-এ যেতেই বলা হচ্ছে, সে তাই সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, নিশ্চয় যাব। শুধু মেয়েদের মিটিং ?

না, পাবলিক মিটিং। তবে মেয়েরা যাতে বেশী সংখ্যায় যান সে চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে।

: মিটিং-এ ? কী যে বলেন ! আমি বক্তৃতা দিতে জানি ?

: বক্তৃতা কেন দেবেন ? শুধু বক্তৃতায় আসর জমিয়ে ঘরে ফিরে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনোর দিন কী আছে ? আপনি সোজা ভাষায় আপনার মনের কথা বললেন।

: তাও কোনদিন বলি নি !

: তাতে কী ? আপনি তো বোবা নন, কথা বলতে জানেন।

প্রমীলা হাসে।—এই সেদিন একটা সভাতে সদ্য সদ্য গাঁ থেকে এতে গেরস্থ চাষী ঘরের বৌ - দশ-বারো মিনিট একটানা বলে গেল। কী চোখা চোখা ধারালো সব কথা ! নামকরা বড় বড় বক্তার চেয়ে বেশী কাজ হল বৌটার কথায়। প্রাণে যখন জ্বালা ধরে যায় সোজা স্পষ্ট কথা বলতে কি আর ট্রেনিং দরকার হয় ?

সাধনা আজকাল চালাক হয়েছে। সে একটু ভেবে বলে, ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

: রাখালবাবু? ওঁকেও যেতে হবে—কিছু বলতে হবে। আমরা ওঁকেও বলেছি।

সাধনা খুশী হয়। রাখাল নিশ্চয়ই আজ ভালভাবে তার সঙ্গে কথা কইবে। তাকে তুচ্ছ করতে পারবে না। কালোনির ব্যাপার নিয়ে যেচে কথা কইতে গিয়ে সে রাখালের বিরোধিতা করে বসেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তো রাখালের সঙ্গে তার কোন মতের অমিল নেই। ছোট ছেলেমেয়েরা ভাত না পেয়ে ভেজাল খেয়ে বিনা চিকিৎসায় অব্যবস্থায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেও চায় রাখালও চায় এর প্রতিকার।

তা ছাড়া সে যেচে সভায় যাবে না। তাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে সভায় গিয়ে কিছু বলার জন্য—শুধু সুমাতকে পাঠিয়ে দায়সারা হিসাবে নয়, স্বয়ং প্রমীলা বসু বাড়ি এসে তাকে অনুরোধ করে গেছে!

স্ত্রীর এ সম্মানে কি খুশী না হয়ে পারবে রাখাল?

রাখাল কথা বন্ধ করেছে।

তার মানে এই নয় যে বাড়িতে সে একেবারে বোবা হয়ে থাকে। সে বাজার করবে সাধনা রাঁধবে, সে ওষুধ এনে দিলে সাধনা সময়মত ছেলেকে খাওয়াবে, ডাক্তার তাকে নির্দেশগুলি জানিয়ে দিলে সাধনাই সেগুলি পালন করবে, দু ঘণ্টা অন্তর থার্মোমিটার দিয়ে ছেলের টেম্পারেচারের চার্ট রাখবে, এক বিছানায় না হলেও এক ঘরে শুয়ে রাত কাটাবে, জ্বরো ছেলেটার কান্নায় বহুবার দুজনের ঘুম ভেঙে যাবে,—একেবারে বোবা হয়ে থেকে কি আর এসব চালানো যায়।

কথা বন্ধ করেছে মানে একান্ত দরকারী সংসারী কথা ছাড়া একটা কথাও সে বলে না।

মিষ্টি কথা দূরে থাক, কড়া কথাও নয়।

সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা, সাধনাকে সে পনেরো দিন ছোঁয় নি।

এটা সংযম নয়। সংঘাতের সাংঘাতিক অঘটন।

ভয়ানক কলহ আগেও হয়েছে। চিরতরে সম্পর্ক ঘুচে যাবে এমন কুৎসিত নিষ্ঠুর কলহ। তখন কেঁদে মুখ ফোলায় নি সাধনা, ঘৃণা আর বিদ্বেষেই মুখ তার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে, গম্ভীর নিস্পৃহ ভাবে নীরবে সে রাতে রুটি বেড়ে খেতে দিয়েছে শ্রান্ত ক্ষুধার্ত রাখালকে। রাখালও তীব্র বিতৃষ্ণায় নিঃশব্দে খেয়ে উঠে খাটে বসে একটা সিগারেট টেনে মশারি ফেলে শুয়ে পড়েছে এবং হয়তো বা ঘুমিয়েও পড়েছে।

এ রকম কলহের পর সাধনা কিছু খেত না, জোরালো খিদে পেলেও খেত না।

কারণ দুর্ভিক্ষ এসে গেলেও সে তো আর সত্যি সত্যি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে নি —রাত্রে অনশন ধর্মঘট করবে ভেবেই কি বিকালে রাখাল ফিরবার অনেক আগেই রুটি সেঁকতে সেঁকতে সে তিন-চারখানা রুটি বিনা উপাদানে খেয়ে নিত?

না খেয়ে হেঁসেল গুছিয়ে সে ঘরে গিয়ে মেঝেটা আরেকবার ঝাঁট দিয়ে শুয়ে পড়ত। এবং বিশ্বাস করা কঠিন হলেও, সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়ত।

মাঝরাত্রে রাখাল এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে বলত, মেঝেতে শুয়েছ যে? ঠাণ্ডা লাগবে না? অসুখ করবে না? বিছানায় এসে শোও।

রাখাল তাকে ডেকেছে বিছানায় গিয়ে শুতে এবং সেও বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়েছে। এবং তারপর কল্পনা করাও অসম্ভব হয়ে গিয়েছে যে রাখাল নামক পুরুষ এবং সাধনা নামক নারীটির মধ্যে সেইদিন কোন কারণে মনোমালিন্য হয়েছিল।

দুজনে যেন চিরদিনই একদেহ একপ্রাণ।

সকালে অবশ্য তারা স্বীকার করে নি রাত্রে দুজনের কোন বিবাদ ছিল না গম্ভীর মুখেই রাখাল বাজার এনে দিয়েছে এবং ঘৃণায় বিদ্বেষে বিকৃত মুখ নিয়ে সাধনা রান্না করেছে।

তবু তখন তাদের ঘৃণা রাগ বিতৃষ্ণা যেমন সত্য ছিল তেমনি সত্য ছিল ও নিয়েও সারাদিন ঘরসংসার চালিয়ে যাওয়া এবং রাত্রে সব সমস্যা পরদিনের জন ধামাচাপা দিয়ে রেখে অভ্যস্ত মিলনে একাত্ম হওয়া।

এবার প্রায় পনেরো দিন দিনের বেলা তারা বিবাদ এবং পরস্পরকে ঘ- করার পাটটা বজায় রেখে এসেছে বেশ খানিকটা নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রতা ও উদারতার ঠাট দিয়ে, কিন্তু রাত্রে তারা জেগেছে ঘুমিয়েছে পরস্পরকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

খোকার জ্বর বলেই সাধনা যেন সেই অজুহাতে নতুন একটিও শয্যা পাত করেছে যুদ্ধের এমার্জেন্সিকে প্রাধান্য দিয়ে। মেঝেতে মশারিসমেত সে শয্যা রাখালের যেন প্রবেশ নিষেধ।

রাখালও যেন তাদের বহু বছরের পুরনো বাসর-শয্যার খাটে শুয়ে সাধনার প্রবেশ নিষেধ ঘোষণা করে গাঢ় ঘুমের দুর্ভেদ্য বাঁধ রচনা করেছে প্রতি রাত্রে।

শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। জ্বরে কাতর ছেলেটা কেঁদে ঘর ফাটিয়ে দিলেও তার ঘুম ভাঙে না।

আগেও ছেলের কান্নায় যে বার বার জেগে যেত, সাধনার সামান্য কাশির শব্দে যার ঘুম ভেঙে যেত, সে আজ চোদ্দ-পনেরটা রাত যেন বোমা-ঠেকানো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে।

এ সংযম সে পেল কোথায় ?

শুধু তাই নয়।

তার সম্পর্কে অদ্ভুত বৈরাগ্য আর গাঢ় ঘুম ছাড়াও আরেকটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে।

মাঝে মাঝে রাত্রের খাওয়াটা বাদ যাচ্ছে রাখালের!

আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর কখনো ঘটে নি। বাইরে নেমন্তন্ন থাকলেই কেবল রাত্রে বাড়িতে খাওয়াটা বাদ যেত রাখালের, তার জন্য রান্নাই হত না। আগে থেকে কিছু জানা নেই, হঠাৎ কোন যোগাযোগ ঘটে রাত্রির ভোজনটা জুটে গেল—এটা ঘটত কদাচিৎ।

এবারকার মনান্তরের পনের-ষোলটা দিনের মধ্যে এটা ঘটেছে সাতবার। গোনা গাঁথা হিসাব আছে সাধনার।

রান্না হয়েছে তার জন্য। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে সে জানিয়েছে যে খাবে না।

আজও ফিরে এসে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে বলে, আমি খেয়ে এসেছি

ঘুমে আর শ্রান্তিতে তার ঢুলু-ঢুলু চোখ দেখে সাধনার মনটা হঠাৎ কেমন করে ওঠে, মমতার যেন বন্যা বয়ে যায় তার হৃদয়ে।

প্রমীলার কথা শুনে আজ সে মিটমাটের আশা পোষণ করছিল কিনা, বোধ হয় সেইজন্য!

সব ভুলে যায় সাধনা। হাসিমুখে বলে, জানো রোববারের সভায় আমাকেও যেতে বলেছে। প্রমীলা বসু নিজে—

বলতে বলতে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল রাখালের। রাখাল মুখ ফিরিয়ে নেয়। খানিকটা তফাতে সরে যায়।

পক্ষাঘাতে সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে যায় সাধনার। যে ভাবে দোল খায় পায়ের নীচের পৃথিবী, কী করে যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ভেবে পায় না।

তবু জোর করে সাধনা নিজের মনকে বলে, সে নিশ্চয় ভুল করেছে। রাখালের মুখে সে গন্ধ নয়। নিজে সে ঠিক বুঝতে পারে নি।

কিংবা রাখাল হয়তো কোন ওষুধ খেয়েছে—ডাক্তারের নির্দেশমত। কথা বন্ধ, অসুখ হলেও রাখাল তো তাকে জানাবে না। ওষুধটার জন্যই গাঢ় ঘুমও হচ্ছে রাখালের।

যন্ত্রের মত রান্নাঘরে গিয়ে রুটি নিয়ে দুখানা কোন রকমে খায়, হেঁসেল তুলে

রান্নাঘর বন্ধ করে উঠানে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের মতই জ্যোৎস্নায় ভাসানো আকাশের দিকেও চোখ তুলে তাকায়।

তারপর ঘরে যায়।

রাখালের তখন নাক ডাকছে।

রুগ্ন ছেলেটা ক্ষীণস্বরে কাঁদছিল। তাকে উপেক্ষা করে সাধনা খাটের দিকে এগিয়ে যায়।

তখনও সে ভাবছে, সন্দেহ মিটিয়ে নেব? না, সংশয়টুকু আঁকড়ে থাকব?

কিন্তু তা তো আর হয় না। স্বামীর মুখে মদের গন্ধ পেয়ে নিজে ভুল করেছি মনে করে কতক্ষণ আর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

যেন আত্মহত্যা করেছে এমনিভাবে সে ঝুঁকে পড়ে রাখালের মুখের উপর।

এতখানি প্রত্যক্ষ নির্ভুল পরীক্ষার অবশ্য কোনই দরকার ছিল না। মশারি তুলতেই রাখালের নিশ্বাসের গন্ধ বেশ ভালভাবেই তাব নাকে গিয়েছিল।

গা গুলিয়ে বমি আসে। বাইরে ছুটে গিয়ে সাধনা যা কিছু খেয়েছিল সব বমি করে ফেলে।

অনভ্যস্ত পদার্থটা একটু বেশী পান করে ফেলায় রাখালেরও আজ বমি আসছিল। তার নিশ্বাসে পদার্থটার গন্ধ শুঁকেই সাধনা বমি করে ফেলে।

আশা ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কী হয়েছে ভাই? বমি করছ কেন?

সঞ্জীবও উঠে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছে দেখা যায়। ওর নেশা ভাল ভাল জিনিস খেয়ে দামী দামী জামা পরে সিনেমা-থিয়েটার দেখে সুখে থাকার জন্য ঋণ করে গোল্লায় যাওয়া।

আর সংঘাতের জাঁতাকল থেকে ত্রাণ পাবার আশায় রাখাল ধরেছে নতুন নেশা।

বমি করেছে। কাজেই দু-এক মিনিট কথা না বলাটা বেখাপ্পা হবে না। তাকে দম নিতে হবে তো।

সেই অবসরে সাধনা একটু ভেবে নেয়।

আশার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব তার ঠোঁটের ডগায় ঠেলে এসেছিল; তোমার মত আমারও বরাত খুলেছে ভাই!

কিন্তু জবাবটা সে ঠেকিয়ে রাখে। এইমাত্র টের পেল রাখাল মদ খেয়েছে।

যা ছিল অসম্ভব তাই সম্ভব হয়েছে। যা ছিল কল্পনাতীত তাই বাস্তব হয়েছে। আরও হয়তো কত কিছু জানবার বুঝবার ভাববার থাকতে পারে এ বিষয়ে।

হয়তো রোজ খায় না, আজ কোন বিশেষ কারণে রাখাল মদ খেয়েছে।

মদ-মেশানো ওষুধও তো থাকে। খোকা হবার পর সেও টনিক খেয়েছিল মদ-মেশানো।

এরকম একটা ধাক্কা খেয়ে তো এই অবস্থা। এখন তার এমন কিছু বলা উচিত কি আশাকে, পরে দরকার হলেও যা ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না?

অসম্ভব যখন সম্ভবই হয়েছে, তার কি উচিত নয় আগে ভেবে দেখা কী করে এটা হয়?

রাখালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সভায় দাঁড়িয়ে সে কথা বলেছে, তার মতের বিরোধিতা করেছে, প্রভাতকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছে, আরেক সভায় কিছু বলার নিমন্ত্রণ জানাতে প্রমীলার মত মানুষ বাড়ি বয়ে এসেছে, রাখাল মদ খেয়েছে বলেই তার কি আত্মহারা হওয়া উচিত?

মদ খেয়েছে কিন্তু মাতাল তো রাখাল হয় নি।

মুখের গন্ধ ছাড়া তো টেরও পাওয়া যায় নি সে মদ খেয়েছে।

আশা ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে না এলে আজ রাত্রেই সাধনা কত কি পাগলামি করত কে জানে। আশাকে সব বলে ফেলার ঝোঁকটা সামলাতে গিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা খুঁজে পায়।

ভিতরে তার যাই হোক, বাইরে নিজেকে সংযত রাখে অনায়াসে।

আশাও অবশ্য শুধু প্রশ্ন করেই দাঁড়িয়ে থাকে নি, ছুটে গিয়ে এক ঘটি জলও এনেছিল।

আশা আবার জিজ্ঞাসা করে, কী হল ভাই?

মুখ ধুয়ে একটু জল খেয়ে সাধনা শান্তভবে বলে, কী জানি, গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল।

: রাখালবাবু ফেরেন নি?

: খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্ছে।

: খুব শক্ত ঘুম তো রাখালবাবুর!

কানের কাছে মুখ এনে আশা চুপিসাড়ে প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার? আবার নাকি?

সাধনা বলে, যাঃ। অত বার-বার খায় না।

গলা একটু উঁচু করে সঞ্জীবকেও শুনিয়ে কৈফিয়ত দিয়ে বলে, কৃমির জন্য বোধ হয়।

সঞ্জীব এগিয়ে এসে বলে, কৃমিই হবে। বেশী রুটি খেলে ভীষণ কৃমি হয়। শ্যামবাবু বলেছিলেন, রুটি খেতে আরম্ভ করার পর বাড়িসুদ্ধ সকলে মাসে দুবার করে কৃমির ওষুধ খাচ্ছেন।

সাধনা প্রশ্ন করে, আচ্ছা সঞ্জীববাবু, অ্যালকোহল খেলে নাকি কৃমি মরে যায়?

সঞ্জীব বলে, কী জানি, বলতে পারছি না। কৃমির জন্য ভিন্ন ওষুধ আছে জানি।

ঃ রুটি খেয়ে খেয়ে আমারই বমি হল। ছোট ছেলেমেয়েরা কী করে রুটি খেয়ে সহ্য করে। মাগো!

রাত্রি প্রভাত হবেই। যেমন রাত্রিই হোক।

সকালে প্রথামত সাধনা রাখালকে চা আর খাবার দেয়—মুখহাত ধুয়ে রাখালও প্রথামত রান্নাঘরে একটা আস্ত ইটকে পিঁড়ি করে প্রাতরাশ খেতে বসে।

প্রথায় একটু তারতম্য করেছে সাধনা। রাখাল ঘুম ভেঙে উঠবার আগে পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে এগার পয়সার একছটাক নিরামিষ গাছগাছড়াগত ঘি মুদি-দোকান থেকে আনিয়ে বাসি রুটির বদলে দুখানা পরোটা ভেজে দিয়েছে রাখালকে।

রাত্রে রাখাল খায় নি। তার ডিমটাও গরম করে দিয়েছে—ঝোলটা নিজেই চেখে পরীক্ষা করে দেখেছে টক হয়ে গিয়েছে কি না।

রাখাল ডিম আলু ঝোল সব কিছু দিয়ে পরোটা খেতে খেতে বলে, ডিমে আলু দাও কেন? আলুর সের কত হয়েছে জান?

সাধনা চুপ করে থাকে। রাখাল দোকানে চলে যাবার পর নিজের ধৈর্যশক্তির জন্য সে গর্ব বোধ করে।

শেষ বোঝাপড়া করে ফেলার অদম্য সাধকে সে আজ অসীম সংযম দিয়ে দমন করেছে।

মন সে ঠিক করে ফেলেছে রাত্রেই। রাখালের সঙ্গে আর নয়। এবার চুকেবুকে যাওয়াই ভাল।

কোথায় যাবে কী করবে তাও সে ঠিক করে ফেলেছে রাত্রেই। কলোনির লোকেরা যেখানে সরে গিয়ে নতুন কুঁড়ে তুলেছে সেখানে ওদের সাহায্যে একটি কুঁড়ে বেঁধে বাস করবে। মান অভিমান বিসর্জন দেবে। পেট চালাবার জন্য একমাত্র দেহে বিক্রির উপায়টা ছাড়া যে-কোন উপায় মাথা পেতে নেবে।

সকালে সে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করে নি। বোঝাপড়াটা শুধু কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে।

রাখাল যে কী করে মদ ধরতে পারে এই অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য ব্যাপারটা সে কয়েকদিন একটু বুঝবার চেষ্টা করবে।

হয়তো এটা নিছক দুদিনের একটা পরীক্ষা রাখালের. -খাপছাড়া হলেও হয়তো রাখাল খেয়ালের বসেই নেশা করার অভিজ্ঞতাটা যাচাই করে দেখছে। হয়তো ব্যবসার জন্য—লাখ টাকা করার নতুন স্বপ্নটা সফল করার জন্য—অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারো সঙ্গে মদটা দু চারদিন বাধ্য হয়ে গিলতে হচ্ছে রাখালের।

কিংবা হয়তো তার জন্যই মদ খাচ্ছে রাখাল। তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েও এক বাড়িতে পরের মত বাস করার চাপটা হয়তো অসহ্য হয়ে উঠেছে রাখালের পক্ষে, তাকে বাতিল করে এক ঘরে রাতের পর রাত কাটানো অসাধ্য ও অসম্ভব হয়ে পড়ায় উন্মাদের মত হয়তো সে এই উপায় অবলম্বন করেছে মদ খেয়ে এসে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমানো যায়, সাধনার অদম্য আকর্ষণ ঠেকানো যায়, তার কাছে নত হতে হয় না।

এটাই যদি কারণ হয় রাখালের মদ খাওয়ার, তাহলে অন্তত শেষ বোঝাপড়ার সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিতেই হবে সাধনাকে।

পুরুষ-মানুষ দু-একদিন মদ খেলে তার জাত যায় না। সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে বাইরেই হোক বা বাড়িতে তার সামনেই হোক রাখাল দু-একদিন মদ খেলে সেটা তুচ্ছ করার মত উদারতা সাধনার আছে।

কিন্তু তার জন্যই যদি রাখাল মদ ধরে থাকে, তবে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্য রকম। দু-একদিন নয়, নিয়মিতভাবে নেশার বিকৃত তৃষ্ণায় রাখাল যদি মদ খেতে শুরু করে থাকে--তবু তাকে ক্ষমা না করে উপায় থাকবে না সাধনার।

শোধরাতে পারবে কি পারবে না সে ভিন্ন কথা। তারই জন্য মাতাল হয়ে থাকলে মাতাল স্বামীর ঘর সাধনাকে করতেই হবে।

অবশ্য, তারই জন্য রাখাল এই মারাত্মক কাণ্ড শুরু করেছে কিনা সাধনা তা জানে না। রাখালের মদ খাওয়ার কোন সঠিক মানেই ঢুকছে না তার মগজে। কয়েকদিন ধৈর্য ধরে রাখালের এই নতুন ব্যাধির মানেটা বুঝবার চেষ্টা তো অন্তত করতে হবে সাধনাকে।

মশা রক্ত শোষণ করে রক্তে রেখে যায় ম্যালেরিয়া—শোষক সমাজকে শুষে রেখে দেয় বেকারত্ব ইত্যাদির অভিশাপ। এই তো সেদিন রাখালের বেকারত্বকে

ব্যাধি বলে ভুল করেছে, অনেক অন্যায় করেছে। পরে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে অনেক ধিক্কার দিয়েছে সেজন্য।

রাখালের বেকারত্বের ব্যাধিটাও ছিল তার কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার। রাখাল বেকার হয়েছে এটা যেন ছিল রাখালেরই অপরাধ, এত লোকে চাকরি-বাকরি করছে তবু রাখাল কোন যুক্তিতে বেকার হয়—এই ছিল তার বিচার।

পাড়ার অনেকেই মদ খায় না। রাখাল কেন মদ খাবে—এরকম সিধে বিচার করে শেষ সিদ্ধান্ত করা আজ অসম্ভব হয়ে গেছে সাধনার পক্ষে।

বাসন্তীকেও কদিন খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

সাধনা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, মেয়েমানুষের যন্ত্রণার কি অন্ত আছে? মানুষটার রকমসকম সুবিধে লাগছে না কদিন ধরে—কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলছে না। নিজে থেকেই বলবে ভেবে চুপ করে আছি, কিন্তু এবার শুধোতে হবে।

: রকমসকম সুবিধে লাগছে না মানে?

: মানে একটু বেখাপ্পা চালচলন হয়েছে। বাইরে মুশকিলে পড়লে ব্যাটাছেলের যেমন হয়। দোকানে কিছু গোলমাল হয়েছে জানো? তোমার কত্তা কিছু বলেছে?

সাধনার মনে একটা প্রশ্ন ঝিলিক মেরে যায়—তাই কি তবে কারণ রাখালের মদ খাওয়ার? বাইরে কোন মুশকিলে পড়েছে—কারবারে কাজকর্মে গণ্ডগোল ঘটেছে? তার জন্য নয়!

: কিছু তো বলে নি আমায়। রাজীববাবুর কী বেখাপ্পা চালচলন হয়েছে?

: মন-মেজাজ ভাল থাকছে না।

ভাসা ভাসা জবাব দিয়ে বাসন্তী যেন কথাটা চাপা দিয়ে দেয়।

নেশা করে রাখাল মরার মত ঘুমায়। রাজীবের ধাত অন্যরকম, তার জাগে ফুর্তির ঝোঁক। তার ফুর্তির ঠেলা সামলাতে হয় বাসন্তীকে—হাসিমুখে। নেশার খেয়াল সব স্বীকার করে নিতে হয়। নইলে যে কোন লাভ নেই বাসন্তী তা জানে। রাগারাগি করলে, নেশার ঝোঁক ব্যাহত হলে মদ গিলে রাজীব আর বাড়ি আসবে না—একজনের ঘরে গিয়ে উঠবে যেখানে পয়সা দিয়ে অবাধে ফুর্তি করা যায়!

ওসব বদ খেয়াল রাজীবের কোনদিন নেই। কিন্তু নেশা করলে কতগুলি পাগলামি তার আসবেই। ঘরে তাকে নিয়ে পাগলামি করতে পেলেই তার চলে!

সে সুযোগ না দিয়ে তাকে নেশা করে বাজারের মেয়েলোকের ঘরে যেতে বাধ্য করার মত বোকা বাসন্তী নয়।

কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে তো একটা বোঝাপড়া চাই। চুপ করে থাকলে চলবে কেন?

বাসন্তী বলে, তোমার মুখে রোজ গন্ধ পাচ্ছি। এত বাড়াচ্ছ কেন? রোজ তুমি মাতাল হয়ে এসে দাপট চালাবে—আমার শরীরটা কি লোহা দিয়ে গড়া?

সকালে বেলা বাড়লে রাজীবকে খেতে দিয়ে বলে। রাত্রে রাজীবের কৃত্রিম উন্মত্তভাব কোন সমালোচনাই বাসন্তী করে না। রাজীব নেশার ঘোরে যা বলেছে যা চেয়েছে তাই সই।

মাথা হেঁট করে থায় রাজীব। বিবেক তার এখন অনুতাপে গলে যেতে চাইছে। রাত্রে কিভাবে নির্যাতন করেছে বাসন্তীকে কিছুই সে ভুলে যায় নি। রাত্রে সব সয়ে গেছে বাসন্তী। সকালে তাকে চা-খাবার দিয়েছে। কে জানে কাকে দিয়ে কিভাবে মাছ আনিয়ে ঝোল বেঁধে ভাত বেড়ে দিয়েছে দোকানে যাবার আগে।

আপিসা বাবুর বৌ নয। বিঁড়িপাতার দোকানদারের বৌ। তবু যেন আপিসী বাবুদের বৌ দর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে তাকে বাবুর মত আরামে রাখতে চায়। আঁধার থাকতে উঠে উনানে আঁচ দেয়।

চালতার টক অদ্ভুত বকম ভালবাসে রাজীব। টক-পাগল মেয়েদের চেয়েও।

চালতার টক পর্যন্ত বাসন্তী রেঁধেছে তার জন্য।

রাজীব বলে, না, টক খাব না।

বাসন্তী বলে, বকলাম বলে?

: না, দাঁত ব্যথা করছে। মাডির সেই দাঁতটা।

: আজ তবে না গেলে দোকানে? পুষ্পের মাকে দিয়ে একটা পাঁট আনিয়ে রেখো রাতে ব্যথা বাড়লে খেয়ো।

রাজীব হেসে বলে, সে জন্য নয় গো, দাঁতের ব্যথার জন্য নয়। তোমার কাছে লুকোই নাকি আমি কিছু? ভদ্দর লোকের ছেলের সঙ্গে ভিড়ে মোর দফা রফা হতে বসেছে। ঝোঁকের মাথায় ক'দিন যা মাল গিলছে রাখালবাবু।

: ওমা! এই ব্যাপার? রাখালবাবুর সঙ্গে খাচ্ছ!

: আর বল কেন! কোনদিন খেত না, হঠাৎ জোরসে চালিয়েছে। একদিন কামাই নেই।

: একটু সামলাতে পার না?

: হাঃ, ওকে সামলাবে! বিদ্বেওলী বৌ নিয়ে হয়েছে বেচারার মুশকিল! মাল টানতে টানতে বলে কি জানো? বলে বৌ নয়, যেন মাস্টার! যেন থানার মেয়ে দারোগা! কত লেখাপড়া শিখেছে, কী জ্ঞানবুদ্ধি—তবু কোনদিক সামলাতে পারছে না। মানুষটা ভেঙে যাচ্ছে দিন দিন।

: লেখাপড়া-জানা বাবুদের বড্ড বেশী মান অভিমান। একটু ছুঁলেই যেন ফোস্কা পড়ে। একটু বুঝিয়ে বলতে পারো না?

: কী করে বোঝাই বলো? এত জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা, সব জানে লোকে মুখ্যু মানুষের কথা শুনবে কেন?

বাসন্তী তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, মুখ্যু মানুষ? আমার বাবা মুখ্যু মানুষই ভাল! বইয়ের জ্ঞান না থাক, কাণ্ডজ্ঞান তো আছে!

রাজীব দাঁতের ব্যথা নিয়েই দোকানে যায়। বাসন্তীও জানে যে দাঁতের ব্যথা তেমন মারাত্মক না হলে দোকানে না যাওয়ার বিলাসিতার মানে হয় না। গাদের পোষায় না ওসব। দোকানে না গিয়ে বাড়ি বসে থাকলে কি দাঁতের ব্যথা রেহাই দেবে, কমে যাবে!

দাঁত যা ব্যথা দেবার দেবেই। ঘরেও দেবে দোকানেও দেবে। দোকানে গেলে বরং রোজগার হবে দুটো পয়সা!

রাখাল দোকানে যাবে বটে। রাজীব না গেলে যে দোকান খোলা হবে না এমন নয়। কিন্তু রাখালের উপর অন্য হিসাবে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা এখনো বজায় থাকলেও তার দোকান চালানোর ক্ষমতায় রাজীব বিশ্বাস হারিয়েছে।

সে শুধু যেন নীতি খাটায়। নীতি খাটিয়ে দোকান ভাল চললে খুশীই হত রাজীব। কিন্তু বিড়িপাতা শুখা তামাকের দোকান চালানোর নীতির সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না রাখালের বইয়ে পড়া উচিত-অনুচিতের জটিল অঙ্ক কষে বার করা নীতির!

বামাচরণকে সত্যই কি আর ভক্তি করত রাজীব! লোকটাকে সে বজ্জাত বলেই জানত। কিন্তু তার মুকশিল হল এই যে লোকটা কবিতা লিখতে পারত—কবিতার একটা বই লিখে ফেলা শুধু নয়, সেটা ছাপিয়ে একখানা উপহার দিয়েছিল রাজীবকে।

অগত্যা তাকে ভক্তি করতে হয়েছিল! কবি—ছাপার অক্ষরে ছাপানো বই-এর কবি! সে কেমন মানুষ জানবার অধিকার তো নেই বিড়িপাতা শুখার দোকানদার অল্প-শিক্ষিত রাজীবের। সাধু সন্ন্যাসী-যোগীর মত কবিও হল আলাদা জগতের

মানুষ, উঁচু জগতের মানুষ—লাখপতি কোটিপতি রাজা জমিদারদের বড়লোকামি উঁচু জাতটার কাছে ঘেঁষা ভিন্ন আরেকটা জগতের মানুষ।

কবিতা লিখে এবং ছাপোনো কবিতার পাঁচ সিকে দামের একখানি বই তাকে উপহার দিয়ে বামাচরণ বোধ হয় কয়েক বছরে তিন-চার শ টাকার সিগারেট ধারে খেয়েছে তার দোকান থেকে।

"বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না" কথাগুলি সোনালী অক্ষরে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার কোন অর্থই রাজীব বুঝতে পারে নি দশ বছরে। বাকি যারা নেবার তারা নেবেই। তাদের ঠেকানো যায় না।

চোরা কারবার চলছে দেশে। একটু সরকারী সুবিধা পেলেই একজন ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-নীতি উলটে দিয়ে মোটা লাভ বাগাচ্ছে। কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছে না লাভ টানবে কোথা দিয়ে কী ভাবে।

তখন যদি নতুনভাবে লাভ করবার কায়দা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য স্বয়ং একজন কবি ছাপানো কবিতার বই দিয়ে তাকে শিক্ষিত মার্জিত কারবারিকের মতন খাতির করে, সে কি ভড়কে না গিয়ে পারে?

কে জানে। হয়তো তার বিড়িপাতা শুখা তামাকের দোকান করাই ভুল। কালোবাজারী বড় ব্যাপারীদের দাপট সইতে হয়েছে বলেই হয়তো সে তেজী কালোবাজারী বাঘের তুলনায় স্রেফ ছুঁচো বনে গেছে।

এই গভীর আত্মগ্লানি বোধ করার সময় এসেছিল কবি বামাচরণ। কবি কি কখনো ছুঁচোকে কবিতার বই উপহার দেয়—এত বড় বড় মানুষ থাকতে?

কবির খাতির হতাশার গ্লানি দূর করে সত্যই জোর এনে দিয়েছিল রাজীবের মনে। নিজেকে ছোট মনে করার আপসোস কেটে গিয়েছিল।

কে বলে সে বাজে মানুষ?

বামাচরণ ধারে সিগারেট নিতে আরম্ভ করলে সে গোড়ায় বোধ করেছিল আনন্দ!

গুরুদেবকে কিছু দান করার সুযোগ পেলে তার বাবার যেমন আনন্দ হত।

ক্রমে ক্রমে জানা গিয়েছিল বামাচরণের ধারে জিনিস নেবার কৌশলটা। মাঝে মাঝে নগদ দিয়েও সিগারেট কিনত, মাঝে মাঝে পুরনো ধার দু-পাঁচ টাকা শোধও দিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যেত বাকির পরিমাণটা তার বেড়েই চলেছে।

কবির কাছে সম্মান লাভের ও আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শোনার জন্য কয়েক বছর ধরে এই খেসারত দিয়ে আসতে হয়েছিল রাজীবকে।

রাখালের সঙ্গে নতুন দোকান খোলার পর সে বাদ না সাধলে কবিকে যোগী

ভাবার দাম সে আরও কতকাল দিয়ে চলত কে জানে। তবে বামাচরণ আর নতুন কবিতার বই-টই বার না করায় এবং মোট বাকির পরিমাণটা অত্যধিক হয়ে দাঁড়ানোয়, ভক্তিতে একটু ভাঁটা পড়তে আরম্ভ করেছিল রাজীবের।

সন্ন্যাসী নতুন নতুন ক্ষমতার পরিচয় না দিলে পুরনো ম্যাজিকে মুগ্ধ ভক্তের মোহ যেমন ক্রমে ক্রমে কেটে যেতে থাকে।

বামাচরণকে সোজাসুজি ধারে সিগারেট দিতে অস্বীকার করায় রাজীব রাখালকেই প্রায় ভক্তি করে বসেছিল।

দীর্ঘদিনের একটা আধ্যাত্মিক বাঁধনের ফাঁস থেকে এমন অনায়াসে যে তাকে মুক্তি দিতে পারে সে তো সহজ সাধারণ মানুষ নয়!

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ভক্তি ও আস্থা নষ্ট হয়েছে রাজীবের।

রাখালের বাস্তব-বুদ্ধি কেমন যেন খাপছাড়া। কখনও লোহার মত শক্ত আর কখনও মাখনের মত নরম হয়ে সে তার বাস্তব বুদ্ধি খাটায়। দু-একবার ঠিকমত লেগে যায় না এমন নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিক উলটো রকম হয়। যখন শক্ত হওয়া দরকার—যেমন বামাচরণের বেলা সে হয়েছিল—তখন সে হয় নরম আর যখন নরম হওয়া উচিত, যেমন সরকারের লোক নরেশবাবু দোকানে এলে একটু ভদ্রতা করা দরকার—তখন সে হয় শক্ত আর গরম।

লুকানো গাঁজার খোঁজে তাই না সেদিন দোকানে তার খানাতল্লাসী হয়ে গেল। গাঁজা অবশ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু নরেশবাবুর সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার না করলে পরের বার গাঁজা যে তার দোকানে পাওয়া যাবে না তার স্থিরতা কি?

বিনা দোষে লোক ছাঁটাই হয় বলে, দেশে ভাতকাপড়ের অভাব বলে, চোরা কারবার আর দুর্নীতি চলে বলে সরকারের উপর তার ভীষণ রাগ। নরেশ ঘুষ খায় বলে গায়ে তার ভীষণ জ্বালা। বেশ তো—এ সবের প্রতিকার যে ভাবে হয় করবে যাও। একটা দোকান দিয়ে আর দশটা দোকানের মত চালাবে না, গোয়ার্তুমি করে দফা শেষ করবে দোকানের, তা হলে দোকান করার দরকারটা কি ছিল?

মুদিখানা হোক বিড়ির দোকান হোক কিছু লোকের সঙ্গে বাকিতে কারবার করতেই হবে। চাকরে বাবু মাসের শেষ ভাগে ধার নিয়ে মাসকাবারে শোধ দেয়। এক দোকানে না দিলে অন্য দোকান তাকে বাকি দেবে। পুরনো চেনা খদ্দেরের হাতে কোন সময়ে টাকা নেই—কয়েকদিনের জন্য বাকিতে মাল চাইলে তাকেও দিতে হবে।

বাকি দিলে সবটা আদায় হবে না, টাকা মারা যাবে, এটা হিসাবে ধরে নিয়েই বাকিতে কারবার করতে হয়। এটা সাধারণ চলতি নিয়ম।

নইলে খদ্দের মারা যাবে। অন্য দোকানী বাগিয়ে নেবে।

কিন্তু রাখাল এ নিয়ম বুঝতে চায় না, মানতে চায় না। কী হওয়া উচিত আর কী হওয়া উচিত নয় শুধু এই হিসাব কষে সে বাস্তব নিয়ম-নীতি উলটে দিতে চায়।

রাখালের জন্য কয়েকজন ভাল ভাল খদ্দের তারা হারিয়েছে।

এদিকে কারবার বাড়াবার জন্য তার মনগড়া অবাস্তব পরিকল্পনা এবং অবাস্তব ঝোঁকটাও ক্রমাগত সামলে চলতে হচ্ছে রাজীবকে।

শুধু চাইলেই যে কারবার হু-হু করে বাড়ানো যায় না, সেটাও বাস্তব নিয়ম নির্দিষ্ট রেটে ঘটে, এই সহজ সাধারণ কথাটাও যেন বুঝতে চায় না রাখাল। রাজীবকে ভীরু কাপুরুষ জড়ধর্মী মানুষ মনে করে।

সেটা টের পায় রাজীব। সাধারণ দোকানদার বলে অশ্রদ্ধা টের না পাবার মত ভোঁতা সে নয়।

রাখাল বলে, আপনি অতিরিক্ত সাবধান। একটু রিস্ক না নিলে উন্নতি করা যায়?

রাজীব বলে, বাজারটা দেখছেন না রাখালবাবু? এ বাজারে টিকে থাকা দায়, রিস্ক নেবেন কোন ভরসায়?

: একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে যে।

: এই সেদিন তো রিস্ক নিয়েছেন, আগের পার্টনারের সঙ্গে। সে একবার ডুবিয়ে দিয়েছে বলে বুঝি আর সাহস পাচ্ছেন না?

: আপনি বুঝছেন না রাখালবাবু। রিস্ক আমি নিতে যাই নি। সে ব্যাটা কতগুলি ভাঁওতা দিয়েছিল, আমি সেটা ধরতে পারি নি। কেন পারি নি জানেন? আমার ঘাড় ভাঙবার মতলবে ভাঁওতা দিয়েছিল, কিন্তু মিছে কথা বলে নি। যা বলেছিল সব ও ব্যাটা করতে পারত—আমরা দুজনেই আজ কোথায় উঠে যেতাম। আমাকে ঠকিয়ে সস্তায় কিছু মেরে দেবার কোন দরকার ছিল না। কত আর মারলি তুই? প্ল্যানটা খাটালে যে দুইজনেই ফেঁপে যেতাম দু-তিন বছরে—হাজারগুণ বেশী জুটত তোর। কিন্তু মানুষের দুর্মতি হলে সে কি বাঁকা পথ ছাড়া চলে?

রাখাল সাগ্রহে বলে, ওরকম একটা প্ল্যান করুন না?

রাজীব মনে মনে বলে, এই রোগেই তো ঘোড়া মরে। রাতারাতি বড়লোক হতে না চাইলে বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষটা তুমি এমন বোকার মত কথা বল।

মুখে বলে, কী নিয়ে প্ল্যান করব বলুন? ওর সুযোগ সুবিধা ছিল—ক্ষমতাওলা

লোকের সাথে পর্যন্ত যোগাযোগ ঘটেছিল। সম্ভব অসম্ভব অবস্থা বিবেচনা করে তবে তো প্ল্যান করা চলে। আমাদের না আছে টাকার সম্বল, না আছে অন্য সম্বল। কী দিয়ে প্ল্যান করবেন?

রাখালের মুখে হতাশা ঘনাতে দেখে রাজীবও দমে যায়।

রাখালের সাহায্যেই নতুন দোকানটা খোলা সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু ইতিমধ্যেই রাখালকে সে ভয় করতে শুরু করেছে।

ধাতটা হল ভদ্রলোকের, চাকুরে মানুষের। খেয়ালের বশে দোকানটাকে সেই আবার ডুবিয়ে না দেয়।

বাসন্তী বলে, এ কি আবার ধিঙ্গিপনা লো? এ সব কি শুনছি? খুব নাকি কর্তালি শুরু করে কর্তাকে নেশায় ডুবোচ্ছ?

: কার কাছে শুনলি?

: আমি আবার কার কাছে শুনব, গেরস্ত ঘরের বৌ? যার কাছে শোনার কথা তার কাছেই শুনেছি।

: কী বললেন তিনি?

: বললেন আপনার গুণপনার কথা—আপনার কর্তাটির কাছে যেমন শুনেছেন তাই বললেন।

সাধনা অধীর হয়ে বলে, কী বলেছে বল না শুনি ভাই।

বাসন্তী চোখ পাকিয়ে তাকায়, কড়া সুরে বলে, আমার কাছে ন্যাকামি করিস নে ভাই। আমি তো জানি তুই কেমন ব্যবহার জুড়েছিস মানুষটার সঙ্গে? এই দিনকাল, বাইরে হাজার রকম ঠেলা সামলাতে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, ঘরে তুই একটু শান্তি দিস না মানুষটাকে। তোর জন্য আমার ওই মানুষটাকে পর্যন্ত বেশী মাল টানতে হচ্ছে।

: মাল মানে মদ, না? উনিও খান?

বাসন্তী ছাদের দিকে মুখ উঁচু করে বলে, ভগবান!

মুখ নামিয়ে বলে, সত্যি ন্যাকামি করছিস, না, সত্যি সত্যি কথা কইছিস বুঝতে পারছি না ভাই। নইলে আজ তোতে আমাতে শেষ ঝগড়া হয়ে সম্পর্ক চুকে যেত।

সাধনা উদাসভাবে বলে, চুকিয়ে দিলেই হয় সম্পর্ক।

তার এই ভাবান্তর বাসন্তীকে সতর্ক করে দেয়। মনপ্রাণ দিয়ে সখী হয়ে সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল যে তারা দুজনে একস্তরের জীব নয়। একেবারে উপর-

তলার মানুষের পদাঘাতে প্রায় তাদের স্তরে নেমে এলেও সাধনা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে নিছক একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার বেশী আত্মীয়তা করতে চায় নি।

তাহলেই তো বাসন্তীর মুশকিল। আপন ভেবে যার মঙ্গল করতে সে ছুটে এসেছে, কয়েকটা সহজ বাস্তব কথা যাকে বোনের মত বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, সে যদি না আপন ভাবে তাকে, তার প্রাণখোলা সহজ সরল কথা না শুনতে চায়, যুক্তি দিয়ে তর্ক-বিতর্কের ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে মনের কথা বুঝিয়ে বলার শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা ভব্যতা তো তার নেই!

ওভাবে মনের কথা খুলে বলার চেষ্টা ত্যাগ করে সে অগত্যা ঘটনাটা খবরের কাগজে রিপোর্ট দেওয়ার মত সোজাসুজি সাধনাকে জানাবার চেষ্টা করে, বলে, সন্ধ্যা হতে না হতে তোমার কর্তা ওনাকে মাল খেতে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। উনি তো দশটার আগে দোকান ছেড়ে বেরোবেন না, মিছিমিছি রোজ মালও উনি খান না—তোমার কর্তাটি তাই দোকানে মাল আনিয়ে খান। গোড়ার দিকে গুম খেয়ে চুপচাপ একলাটি খান। তারপর ওনাকে দু-এক পাত্র চুমুক দিতে এগিয়ে দেন। এমনি উনি খেতেন না, কিন্তু এভাবে একজন এগিয়ে দিলে মানুষ না খেয়ে পারে? তোমার কর্তার মান রাখতে ওনাকেও গিলতে হয়।

সাধনা বলে, সে তো বুঝলাম। আসল কথা বল।

: আসল কথা মানে তোমার কথা তো? রোজ নাকি তোমার কথা ওঠে? কিছুক্ষণ চুপচাপ মাল টেনে নেশা হলে রাখালবাবু তোমার কথা পাড়েন। কতরকম যে গুণকীর্তন করেন তার নাকি ঠিক-ঠিকানা নেই। সে সব যাক, আসল কথা বলেন, তুমি নাকি আর বৌ নেই, ওসব পাট তুলে দিয়েছ। তোমার কর্তার মুখে শুনে আমার কর্তাটি যা বলেছে আমি কিন্তু তোমাকে তাই বলছি ভাই!

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বলে যাও।

: ওই তো বললাম। তোমার কর্তা নালিশ করেন, তুমি নাকি বৌ নেই, একদম স্বাধীন কলেজে পড়া কুমারী মেয়ে হয়ে গেছ—ছেলেটার দিকেও নাকি তুমি তাকিয়ে দেখ না। তুমি নাকি ইস্তিরি-ধর্ম পালন কর না, এক মাসের ওপর কাছে ঘেঁষতে দাও নি বেচারাকে।

সাধনা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচালি ভাই!

: কী রকম?

: আমিও তাই ভাবছিলাম। আমার জন্যেই কি মদ ধরেছে? বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তুই আমাকে বুঝিয়ে দিলি, আমারি দোষে বেচারা ছাইপাশ খেয়ে গোল্লায় যাচ্ছে।

বাসন্তী গালে হাত দিয়ে পলকহীন বড় বড় চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। এতদিন সে যেন একেবারেই চিনতে পারে নি সাধনাকে।

: সত্যি অবাক করলি ভাই। তোর বিদ্যাবুদ্ধিকেও বলিহারি যাই। কী দিয়ে মানুষটাকে এতদিন বশে রাখলি তাই আমি ভাবি। তোর গুণে নয়, মানুষটা নিজের গুণে তোর বশ হয়ে ছিল। তোর সত্যিকার চেহারা ধরা পড়েছে, তাই আজ বেচারা মদ খায়।

: তার মানে?

: তোর সঙ্গে অমিল হয়েছে বলে মাল খাচ্ছে ভাবছিস? পুরুষ মানুষের গরজ পড়েছে বৌয়ের খাতিরে মদ খাবার! তোর জন্যেই যদি মদ খাবার অবস্থা হয়ে থাকে—অনেক আগে তোকে লাথি মেরে দূর করে দিয়ে মনের মত আরেকটা বৌ সে আনতে পারত না? বৌ যেন এতই দামী যে ব্যাটাছেলে আরও দু-চারটে বৌ পোষার মত টাকা খরচ করবে, শরীর নষ্ট করবে, একটা বৌয়ের জন্য! কেন নিজেকে বাড়াস ভাই, নিজেকে ভাঁড়াস? সোজা কথা বাঁকা করে নিয়ে কেন মিছে অশান্তি সৃষ্টি করিস?

: সাধনা মৃদুস্বরে বলে, সোজা কথাটা কী?

: সোজা কথাটা হল, রাখালবাবুর মত লোক যখন হঠাৎ মদ ধরেছে, এমনিতে নিশ্চয় কিছু হয়েছে মানুষটার, ধাক্কা সামলাতে প্রাণান্ত হচ্ছে। ঘরে কোথায় একটু শান্তি দিবি, ঠিক উলটোটা করছিস—শত্রুতা জুড়েছিস।

: কিছু হয়ে থাকলে বলবে না আমায়?

: তেমন ব্যবহার করলে হয়তো বলত। ভালবাসা থাকলে পুরুষ মানুষ সব সময় সব কথা কি বৌকে বলে? বৌকে ভয় ও ভাবনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও অনেক সময় অনেক কথা চেপে যায়। জানার সাধ থাকলে অবিশ্যি পেটের কথা বার করতে কতক্ষণ?

সাধনা তিক্ত সুরে বলে, সে তুমি পার। তোমাদের সে সম্পর্ক বজায় আছে। আমরা বিগড়ে গিয়েছি একেবারে।

: তোমরা বিগড়ে যাও নি। তোমাদের সব ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছে কি না, সেটাই হয়েছে মুশকিল। রাখালবাবু অফিস করছেন বিড়ির দোকানে, ঘর-সংসার ফেলে বৌ মানুষ তুমি বাইরে করছ ধিঙ্গিপনা—এসব কি আর মিছিমিছি ঘটেছে?

দিনকালটাই গেছে বিগড়ে, তোমরা খাপ খাচ্ছ না। তোমরাও বিগড়ে গেলে তো ভাবনাই ছিল না, দিব্যি খাপ খেয়ে যেতে!

অবস্থা বদলে গেছে। নতুন অবস্থার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না।

এই কথা তাকে শুনিয়ে গেল বাসন্তী।

তার এই অনেকদিনের জানা কথাটা।

এমনভাবে শুনিয়ে গেল যেন আসল অপরাধটা অবস্থার, সব কিছুর জন্য দায়ী পরিবর্তনটা, তাদের খাপ খাওয়ার অক্ষমতা নয়।

কথাটা সত্য এবং সহজ। বাসন্তী পর্যন্ত এটা ধরতে পেরেছে মধ্যবিত্ত হিসাবে তাদের জীবনে ভাঙনটা অবশ্যম্ভাবী, নীচের স্তরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাকার তাদের হতেই হবে, কিন্তু সেটা এমন কদর্য কুৎসিত প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই ঘটতে হবে এমন তো কোন কথা নেই!

ভাঙনের বাস্তবতা সুখকর হয় না, হতে পারে না, তা জানে সাধনা। মধ্যবিত্তের অনেক মিথ্যা স্বপ্ন ও কল্পনা, বিশ্বাস ও ধারণা, অবাস্তব আরাম বিলাস ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া রীতিমত বেদনাদায়ক হবেই।

যদিও ভাঙার সঙ্গে গড়াও চলে, নতুন সম্পর্কের মধ্যে জীবন আরও ছড়ানো ও জমাট হয়, নতুন আশা জীবনের আনন্দ ও সার্থকতার নতুন রূপ চিনিয়ে দেয়।

কিন্তু এ তো তা নয়। এ ভাঙনে মিশেছে অকথ্য মিথ্যা ও ফাঁকি, অকারণ কুৎসিত বিড়ম্বনা! দেশ জুড়ে গায়ের জোরে যেভাবে বিষাক্ত করা হয়েছে জীবনকে, তারাও তার ভাগীদার হয়েছে বৈকি!

এই বিকৃত অমানুষিক অবস্থাটা তাদের ভদ্র জীবনে রূপান্তর ঘটাবার জন্য অপরিহার্য ছিল না এবং তাদের ভেঙে নতুন মানুষ করার প্রয়োজনেও এ অবস্থা সৃষ্টি হয় নি!

ভাঙন নয়। এই অবস্থাটাই অসহ্য হয়েছে তাদের। রাখাল শুধু বেকার হয় নি বিনা দোষে, শুধু অর্থাভাবই ঘটে নি তাদের—রাখাল আজ শুধু অনভ্যস্ত উপায়ে জীবিকাই অর্জন করছে না—তখন যেমন আজও তেমনি ফাঁকি আর ধাপ্পাবাজি দিয়ে টিকিয়ে রাখা বিকারের বিরাট বেড়াজালে তাদের আটক রাখা হয়েছে!

রাখালদের বেকার হয়ে না খেয়ে মরার দশা হয় কিন্তু বেকারত্বের প্রতিকারের বদলে বিরাট তোড়জোড়ের সঙ্গে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা চলে ভদ্র জীবনের

কৃত্রিমতা, অবাস্তবতা সম্পর্ক মিথ্যা মোহ। রাখালের মত ভদ্রলোকদের জীবনের বাস্তবতা যেমনই দাঁড়াক, ভদ্র থাকাই অসম্ভব হয়ে যাক, ভদ্র জীবনে নিছক সাজানো গোছানো খোলসগুলি, কৃত্রিমতাগুলি, অবাস্তব ভাবাবেগগুলি জীবনের সেরা সম্পদ হিসাবে মহাসমারোহে বাঁচিয়ে রাখা হয়!

তলিয়ে সব না বুঝুক, বাসন্তী জীবনের সহজ নিয়ম মানে। সে তাই টের পেয়েছে জীবনে কত অনিয়ম আমদানী হওয়ায় আজ তাদের কী দশা! নীচের তলায় সাধারণ গরিব মানুষের সব রকম দুর্দশাই আছে, একেবারে না খেয়ে মরা পর্যন্ত চরম দুর্দশা,—কিন্তু মৃত জীবনের ভূতের বোঝা তাদের সইতে হয় না।

তারা যতই পিছিয়ে থাক, সংস্কার ও বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাক, তারা নিজের জগতেই আছে, রুক্ষ কঠোর বাস্তবতা নিয়েই আছে।

সেখান থেকে শিশুর মত হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোলেও প্রতিদিন এগোচ্ছে।

রাখাল সাধনাদের মত চুমকি বসানো লাল নীল বাতি দিয়ে সাজানো হাতির দাঁতের কারুকার্য করা কৃত্রিম অবাস্তব মিনার ঘাড়ে বয়ে বেড়ানোর ঝনঝাট তাদের নেই।

ভদ্রঘরের ছেলে বাধ্য হয়ে কারখানায় খাটছে, কণ্ডাক্টরি করছে, ফেরিওলা হয়েছে—কিন্তু সেটা যেন জীবনটাকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বাঁচার জন্য নয়, ভদ্র জীবনটাকে কোন রকমে বাঁচাবার জন্য!

এ দায় নেই বাসন্তীদের। ছলনা চাতুরী নিয়ে নয়, হিসাব করা পলিসি নিয়ে নয়, রাজীবের জ্বর হলে সালসা খাওয়ানোর মত প্রয়োজনীয় মনে করেই অন্যভাবে তার শরীর মন অসুস্থ দেখলে বাসন্তী অনায়াসে তাকে বলতে পারে: শরীর খারাপ লাগছে? একটা পাঁট এনে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড় না।

সোজা কথাটা সে বোঝে। দরকার হলে পাঁট রাজীব খাবেই। মৃত্যু পণ করে চেষ্টা করলে একদিন কি দু-দিন হয়তো সে ঠেকাতে পারবে রাজীবকে—তার পর দিন তার মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে রাজীব বাইরে পাঁট খেয়ে আসবে!

অসুখের মতই এরকম একটা অবস্থা আসে শরীর মনের। পাঁট না খেয়েও অবশ্য সে অবস্থার প্রতিকার করা যায়। কিন্তু যে অবস্থায় তারা আছে তাতে সেটা সম্ভবপর কোন প্রতিকার নয়—অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা।

সোভিয়েটে নাকি এভাবে এই কারণে কারো মদ খাবার দরকার হয় না। এসব উদ্ভট রোগের নাকি মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে সে দেশে।

ভাগ্যবান দেশ। ধন্য দেশ।

কিন্তু বাস্তব জীবন পিষে দমিয়ে দিয়েছে রাজীবকে। এটা কোন বীজাণু-ঘটিত রোগ নয়, সমগ্র জীবনের মাস-বছর ঘটিত বাস্তবতার সৃষ্টি করা রোগ।

পাঁট না খেলে রাজীব তিন ভাগ রাত ছটফট করবে। মদ না খেয়েও মাতালের চেয়ে বেশী আবোল-তাবোল বকবে—শ্যামা সঙ্গীত উলটে-পালটে গাইবে, কপাল চাপড়াবে—শরীর মনের যন্ত্রণায় যেন মদ-মাতালের চেয়েও কষ্ট পাবে।

পরদিন হয়ে থাকবে নির্জীব প্রাণহীন মানুষ।

তার চেয়ে কী আসে যায় এসময় একটু খেলে? শরীর মনের কষ্টটা ভুলে বেলা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে অনেকটা তাজা বোধ করলে?

মাসে দু তিন দিনের বেশী তো আর দরকার হয় না।

যারা নেশার জন্য নিয়মিত খায় তাদের কথা আলাদা। তাদের সাংঘাতিক রোগ। সব দিক দিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে।

ডেকে আনে কিন্তু সেও তো রোগী? নীতিকথায় কি রোগ সারে? বাস্তব লাগসই চিকিৎসা ছাড়া?

তাই বটে। নইলে কারখানার প্রাণপাত করে যারা খাটে? তাদেরও অনেকে রক্ত-জল করা পয়সা দিয়ে কয়েক আউন্স জল-মেশানো আধ্যাত্মিক দাওয়াই খেতে যাবে কেন?

জীবনের বাস্তবতাই এ রোগের জন্য দায়ী।

কী করবে ভেবে পায় না সাধনা।

বেকার রাখাল তাকে ভাইএর কাছে পাঠাতে চেয়েছিল। চরম দুরবস্থা বলে সে যেতে রাজী হয় নি। এবার কিছুদিন ঘুরে আসবে।

কিন্তু কী লাভ হবে তাতে? তাকে নিয়ে যখন আসল সমস্যা নয় রাখালের, তার জন্য যখন মদ খাওয়া নয়, সে সরে গেলে কি আসবে যাবে রাখালের।

ঘরের অশান্তি থেকে রেহাই পাবে? আগে হলে এভাবে উভয় পক্ষের অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব মনে করত সাধনা। সেদিন আর নেই। তফাতে সরে গেলে দুজনে যে ধরনের শান্তি পাবে তার দাম খুবই সামান্য হয়ে গেছে তার কাছে।

সে জানে, সম্পর্ক বজায় রেখে ঘরে সরে গেলে তুচ্ছ খুঁটিনাটি সংঘাতগুলিই শুধু বাতিল হবে, রাগ দুঃখ অভিমান আর দুশ্চিন্তায় যা পুষিয়ে যাবে শতগুণ।

রবিবার রাখাল জানায়, সে সভায় যাবে না।

: আমি যাব বলে?

রাখাল চুপ করে থাকে।

: আমার বাইরে যাওয়া তুমি পছন্দ করছ না কেন?

: পছন্দ-অপছন্দর কথা নয়। এক মিটিঙে দুজনের যাওয়া উচিত নয়।

: কেন?

: তোমার আমার মত মেলে না বলে। আবার একটা কেলেঙ্কারি হবে।

আগেকার সভায় সংঘর্ষ ঘটবার পর আজ প্রথম তাদের মধ্যে সংক্ষেপে সংসারের দরকারী কথা ছাড়া বোঝাপড়ার কথা হয় কয়েকটা।

সাধনা থেমে না গিয়ে বলে, একটা বিষয়ে মত মেলে নি বলে কি সব বিষয়ে অমিল হবে?

: কোন বিষয়ে আমাদের মতের মিল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি একরকম ভাব, আমি আরেক রকম ভাবি।

: আগে মিল ছিল। নতুন কথা কী এমন ভাবতে আরম্ভ করেছি যে সব দিক দিয়ে অমিল হয়ে গেল?

: ভাবছ বৈকি। আসল কথাটাই অন্যভাবে ভাবছ। স্ত্রীর যেটা বড় কর্তব্য হওয়া আমি উচিত মনে করি, তুমি তার উলটোটা উচিত মনে করছ। আমার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছ—

: আমি করেছি? তুমিই কথা বন্ধ করেছ, আমায় এড়িয়ে চলছ, মদ খাচ্ছ। তুমি যা বলবে তাই আমাকে শুনতে হবে, যেমন চাইবে তেমনিভাবে চলতে হবে, এটাই যদি আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে কর—

রাখাল চুপ করে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

: তুমি বুঝবে আশা করি না। কতকগুলি বাঁধা বুলি আর ছাঁকা নীতি শিখেছ, তুমি আর কিছু শুনতেও চাও না, বুঝতেও চাও না। আমার হুকুম মেনে চলবে কি চলবে না, সে প্রশ্নই আলাদা। আগে কি হুকুম মেনে চলতে? আমি বলছি স্ত্রী হিসাবে তোমার যেটা করা উচিত, নিজে থেকেই করা উচিত। তোমার আমার স্বার্থ এক, এই সোজা কথাটা মানার সঙ্গে আমার হুকুমে চলার সম্পর্ক কী? আমি বড় হলে, টাকা করলে, নাম কিনলে তুমিও সেসব ভোগ করবে, আমি পথের ভিখারী হলে তুমি পথে বসবে, উপোস করবে। এটা তো অতি সহজ সরল কথা। আমি সুখী না হলে তোমার সুখী হবার সাধ্য আছে? তুমি বলবে এটা অন্যায়, সমাজের এটা বিশ্রী অনিয়ম, এরকম ব্যবস্থার জন্যই স্ত্রীকে স্বামীর দাসী হয়ে থাকতে হয়। বেশ কথা, আন্দোলন চালাও, অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করো। কিন্তু স্ত্রী হয়ে থেকে স্বামীর স্বার্থ দেখবে না কোন যুক্তিতে?

: তোমার কোন স্বার্থের হানি করেছি? সেদিন সভায় বলেছিলাম বলে তোমার কোন ক্ষতি হয়েছে? বরং দেখতেই পাচ্ছ দশজনের কাছে তোমার আমার দুজনেরই মর্যাদা বেড়েছে।

: তোমার বেড়েছে—আমার নয়। লোকে বলছে রাখালবাবুর স্ত্রী না থাকলে প্রভাত ওদের ঠকাত। অর্থাৎ রাখালবাবু ছিলেন বটে কিন্তু তিনি বাজে লোক, তাঁর দ্বারা কিছু হত না।

: তুমি উলটো মনে করছ। আমায় ভাল বললে তোমায় বাজে লোক ব- হয় না। আসলে, তুমি ভুল করতে যাচ্ছিলে, আমি ঠিক করেছি, তাই তোমার রাগ। তোমায় না বলে লোকে আমায় কেন ভাল বলবে!

তীব্র বিরক্তি আর হতাশা ফোটে রাখালের মুখে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলে, তোমায় কিছু বলা বৃথা। তুমি নিজের ভাবনাতেই মশগুল। তোমায় হিংসা করব আমি? তুমি যাও না দশটা সভায়, নাম কেনো, মর্যাদা বাড়াও। আমি বারণ করছি? আমি যার মধ্যে আছি সেখানে মাথা গলিয়ে আমার বিরোধিতা করবে কেন? দেশে কি আর আন্দোলন নেই, সমিতি নেই, সভা হয় না? দেশের লোককে কি অন্য ভাবে কেউ ঠকাচ্ছে না? তোমার মতামতের স্বাধীনতা আছে, সেটা প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে—কিন্তু যেখানে তোমার স্বামীর মর্যাদার প্রশ্ন, সেখানে তোমার স্বার্থটাই তুমি দেখবে আগে। সেদিনের সভায় আমার জন্য তোমার মাথাব্যথা দেখা যায় নি, এটাই আসল কথা। আমার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ার বদলে কমে যাক, আমি ছোট হই দশজনের কাছে, সেজন্য তোমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই।

রাখাল একটু থেমে যোগ দেয়, তুমি ভাবছ একদিনের একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি। সামান্য ব্যাপার নয়। সেদিন আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আমার সমস্ত স্বার্থই তুচ্ছ হয়ে গেছে তোমার কাছে। আমি নাম করব, টাকা করব শুধু এই স্বার্থ নয়—তাহলেও একটু ভরসা থাকত। আমার বদনাম হলে যে তোমারও লজ্জা, আমি পয়সা না কামালে যে তুমিও উপোস করবে, তাও তুচ্ছ হয়ে গেছে তোমার কাছে। আমি আর স্বামী নই তোমার কাছে। একটা অভ্যাস টেনে চলছ, নিয়ম রক্ষা করছ, এই মাত্র।

সাধনা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

: তুমি আর স্বামী নেই মানে তোমার জন্য আমার ভালবাসা নেই?

: ভালবাসা? ভালবাসা আছে কি নেই সে আলাদা কথা, স্বামী-স্ত্রী না হয়েও ভালবাসা নিয়ে মানুষ একসাথে থাকে। তাদের কথাও আলাদা। আমি বলছি,

আমরা স্বামী-স্ত্রী, একটা বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক আছে আমাদের। সমাজটা খারাপ হোক, এ সমাজে স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ সম্পর্ক না থাক—সম্পর্কটা তো আছে। এ সম্পর্কের মূল নিয়ম হল--স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ এক হবে। ছোটখাট খুঁটিনাটি স্বার্থ নিয়ে দুজনে হাজার বিরোধ থাক—মূল স্বার্থে তফাত থাকবে না। হাতের বাড়তি টাকাটা দিয়ে স্ত্রীর একখানা গয়না হবে, না স্বামীর একটা শখ মিটবে তা নিয়ে মারামারি হোক--স্বামীর রোজগার বাড়ুক এটা হবে দুজনেরই স্বার্থ।

সাধনা নতমুখে ভাবে।

মনের কথাটা বলবে রাখালকে? রাখাল আরও বেশী রাগ করতে পারে, আরও বেশী ত্যাগ করতে পারে তাকে, এ আশঙ্কা থাকলেও বলবে?

রাখাল হয়তো বুঝতেও পারে তার কথাটা। একেবারে তো মূর্খ নয় মানুষটা।

ভেবেচিন্তে বলাই ঠিক করে সাধনা। যে অবস্থায় তারা এসে পৌঁচেছে, খোলাখুলি কথা বলাই ভাল।

: টাকার চেয়ে নামের চেয়ে স্বামী মানুষ হিসাবে বড় হোক এই স্বার্থটা যদি বড় হয় স্ত্রীর কাছে?

: আমি অমানুষ হয়ে যাচ্ছি? কদিন মদ খাচ্ছি বলে? তোমার জন্যই আমি মদ খাচ্ছি। এ অবস্থা মানুষের সহ্য হয় না।

বাসন্তীর কাছে সাধনা কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সহজ মোটা একটা কথা সেদিন সে বুঝিয়ে না দিলে আজ নিজের ভাবপ্রবণতার ফাঁকি নিয়ে সে ফাঁপরে পড়ে যেত।

: তুমি তাই ভাবছ—কিন্তু স্ত্রীর জন্য কেউ মদ খায় না। তোমার কী হয়েছে আমি জানি না—কিন্তু মদ খাওয়ার জন্য আমায় দায়ী করো না।

রাখাল অপলক চোখে চেয়ে থাকে।

সাধনা বলে, তোমায় অমানুষ বলি নি। মানুষ হিসাবে বড় হও মানে বলছি না যে গান্ধীজির মত সাধুপুরুষ হতে হবে। টাকা-পয়সা নাম-যশের চেয়ে দশজনের স্বার্থ তোমার কাছে বড় হবে—আমি শুধু এইটুকু চাই।

: টাকা করব না? দেশের লোক খেতে পরতে পায় না, তাই বলে টাকা করে নিয়ে সুখে থাকার চেষ্টা করা আমার পক্ষে অপরাধ?

: নিশ্চয় না। মানুষের ঘাড় না ভাঙলেই হল। তুমি আমি দশজনের মত সাধারণ মানুষ—তোমায় অসাধারণ মানুষ হতে বলব কেন? সব ছেড়ে দিয়ে তুমি শুধু দেশোদ্ধার করতে নামলে ভাল হত, এমন কথা আমি ভাবিও না। আমিও কি ঘরসংসার ফেলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব ভাবছি? তুমি ভাল

জিনিসটি আনলে তৃপ্তির সঙ্গে খাই না? ভাল কাপড় পরি না? তবে কিনা দশজনের জন্য যতটা সাধ্য করতে হবে। আগের মত শুধু নিজেদের নিয়ে থাকলে আমাদের চলবে না।

: আমিও তো তাই বলছি। আমি কি নামের কাঙাল, না নেতা হবার শখ আছে আমার? গা বাঁচিয়ে না থেকে যতটা পারি দশজনের লড়ায়ে এগিয়ে যাব —তাতেই দশজন আপন ভাববে। সুমথেরা ভুল বুঝে সব গণ্ডগোল করে দেবে টের পেয়েছিলাম বলেই না এগিয়েছিলাম? অতগুলি লোকের সর্বনাশ হবে বলে? আগে অনায়াসে এড়িয়ে যেতাম আজকাল চেষ্টা করেও পারব না। রাতে ঘুম হবে না।

সাধনা জোর দিয়ে বলে, তা হলে, তোমার আমার মতের অমিলটা হচ্ছে কোথায়?

রাখালও সঙ্গে সঙ্গে জোরের সঙ্গে জবাব দেয়, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন হবে তাই নিয়ে।

সাধনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

রাখাল বলে, বাস্তব জগৎ বদলে যাচ্ছে, আমাদের জীবনটা বদলাচ্ছে, তুমি আমি দুজনেও বদলাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি এ পরিবর্তনটার সঙ্গে অন্য সব কিছুর সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলবার, বাস্তব যতটা বদলেছে, আমি যতটা বদলেছি তার সঙ্গে। যে রেটে বদলেছি তার সঙ্গেও। যেন বাড়াবাড়ি করে না ফেলি, যেন না ভাবি যে সব কিছু বদলে নতুন হয়ে গেছে বা ত চারদিনের মধ্যে হল বলে, যেন না ভাবি আমিও আর সেই রাখাল নেই—একেবারে অন্য একটা মানুষ হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি গা ছেড়ে দিয়েছ, ধরে নিয়েছ যে তুমিও আর সে সাধনা নেই, তোমার জীবনটাও একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। যতটা পরিবর্তন সত্যি ঘটেছে, তুমি সেটাকে কল্পনায় বাড়িয়ে নিয়েছ হাজার গুণ।

একটু ইতস্তত করে রাখাল যোগ দেয় বাঁধছ বাড়ছ ছেলেমানুষ করছ আমার সেবা করছ, কিন্তু ভাবছ যে তোমার আমার যে সম্পর্কটা ছিল সেটা শেষ হয়ে গিয়ে একেবারে নতুন রকম একটা সম্পর্ক হয়েছে। নিজেকে তুমি আমার স্ত্রী ভাবছ না, আমাকে তোমার স্বামী ভাবছ না। মানুষ হিসাবে আমি তোমার অধিকার মানছি না, শুধু অন্যায় আর অবিচার করছি। আমি তোমায় স্ত্রী হিসাবে চাই—সেটা আমার ভীষণ অপরাধ! তোমায় আগে মানুষ ভাবতে হবে—তারপর তোমার স্ত্রী ভাবা চলবে। আমি যেন তোমায় মানুষ ভাবি না—তোমায় গোরু-ছাগল ভেবে এতদিন তোমার সঙ্গে ঘরসংসার করেছি।

সাধনা চুপ করে থাকে।

সে আরও শুনতে চায় বুঝতে পেরে রাখাল বলে, আমি তোমার মালিক, তুমি আমার সম্পত্তি এটা কি তুমি অস্বীকার করছ? আমি কি এটা জানি না? আমি কি কালা যে যাঁরা এই সত্যটা আবিষ্কার করে পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছেন, আমি তাঁদের কথা শুনতে পাব না? আমি কি নতুন মার্কিনী দর্শন প্রচারের দালাল যে এ সত্যটা অস্বীকার করব? আমি রোজগার করে তোমায় খাওয়াই পরাই, আমার ভাড়া করা ঘরে থাকতে দিই,—আমি তোমার মালিক বৈকি! খোকনকে খাঁটি দুধ খাওয়ানোর জন্য একটা গোরু কিনে পুষলে আমি তারও মালিক হতাম। তাই বলে আমি কি তোমাকে আর গোরুটাকে সমান করে দিতাম? আমার সম্পত্তি হলেও তোমাকে মানুষ ভাবতাম না? মানুষ বলেই তোমাকে আমি বিয়ে করেছি, তোমার স্বামী বা মালিক হয়েছি।

রাখাল একটু থামে। সাধনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে দেখেও তার সংশয় জাগে যে সে তার কথার মর্ম বুঝবে কি না! তার নিজের সম্পত্তি, নিজের স্ত্রী—শাস্ত্র এবং আইন যাকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করার অধিকার তাকে দিয়েছে—অথচ প্রায় তিন সপ্তাহ সে তাকে স্পর্শ করে নি! তাকে মানুষ ভাবে বলেই যে তার এই প্রাণান্তকর সংযম—এটুকু কি মাথায় ঢুকবে সাধনার?

এ যে তার অভিমান নয়, এতে যে তার বাহাদুরি নেই, সত্যই তাকে মানুষ মনে করে বলে তাকে বাধ্য হয়ে এ সংযম পালন করতে হচ্ছে, এই সহজ সরল কথাটা?

সাধারণ কলহ বিবাদ হলে আলাদা কথা ছিল। এখনকার অচল অবস্থায় সাধনাকে অপমান করার সাহস তার নেই! সে মানুষ বলেই নেই!

কোনদিক দিয়ে কিভাবে তার প্রতিক্রিয়া আসবে সে জানে না। কিন্তু সাধনা মানুষ বলেই প্রতিক্রিয়াটা যে সাংঘাতিক হবে এটুকু জানে।

ধীরে ধীরে সে বলে, মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে সেন্টিমেণ্টাল হলে, ঝোঁকের মাথায় যন্ত্রের মত বিচার করলে, ফলটা মারাত্মক হয়। আসল কথাটাই গুলিয়ে যায়। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। এটা মানুষের কীর্তি,—একদল মানুষের। এই দলের সঙ্গে বাকি মানুষের একটানা বিবাদ। পৃথিবীতে যত যুদ্ধ বিগ্রহ বিক্ষোভ বিদ্রোহ সব কিছুর গোড়ায় ওই সংঘাত। সোভিয়েট চীনে বিপ্লব ঘটেছে এই কারণে—পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষেরা ক্রমে ক্রমে জয়ী হচ্ছে। এসব মোটামুটি তুমিও জানো আমিও জানি। এখন কথাটা হল এই, তুমি আমি চাইলেই মানুষের সব অধিকার পেয়ে যাব না।

আমাদের ক্ষোভ আছে, দাবি আছে, লড়াই চলছে নানা ভাবে—এ একটা প্রক্রিয়া। ক্ষোভ আছে—কিন্তু বাস্তবকে ভুলে শুধু ক্ষোভটা ফেনিয়ে পাগল হলে তো চলবে না আমাদের। আমাদের বাঁচতেও হবে—যতই বঞ্চিত হই আর অপমান সই, জীবনটা আমাদের ফেলনা নয়। এটুকু বুঝে লড়াই চলছে জেনে, ধৈর্য আমাদের ধরতেই হবে। বাস্তবকে মানতেই হবে। তা না হলে হতাশা আসবে, বৈরাগ্য জাগবে, মন বিগড়ে যাবে, জ্বালাটা অসহ্য হয়ে খুন করার কিংবা আত্মহত্যার ঝোঁক আসবে।

: আমাব কী হয়েছে ?

: তোমার মন বিগড়ে গেছে, জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছে। চব্বিশ ঘণ্টা তুমি শুধু ভাবছ স্ত্রী হওয়ার জন্য তোমার জীবনে কত অপমান পরাধীনতা অসম্পূর্ণতা। জ্বালাটা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে তুমি একটা অবাস্তব অসম্ভব জীবন চাইছ—এ জীবনটা ভাল লাগছে না। জীবনটা মায়া, জগৎটা মায়া, সব কিছু বাজে, ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে যেমন বৈরাগ্যের বিকার আসে, চোখ বুজে একটা আধ্যাত্মিক জগতে বাস করতে সাধ হয়—তোমারও তাই হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে আড়ি করলে এই বিপদ হয়। আমি যে চাকরি করতাম—কতকগুলি অন্যায় অবিচাব অপমান মেনে নিয়েই করতাম। আজ ব্যবসা করি বলেই কি আমি স্বাধীন হযে গেছি ? আরও দশজনের মত মানুষ হিসাবে অনেক অপমান সইতে হয়। আমার কি জ্বালা ছিল না ? এখন জ্বালা বোধ করি না ? কিন্তু অনেক অন্যায় অবিচার সংকীর্ণতা ব্যর্থতা আছে বলে নিজের জীবনটা খারিজ করি নি। প্রতিকার চেয়ে লড়াই করব, বাস্তবকে বদলে দেব—কিন্তু প্রাণের জ্বালায় বেঁচে থাকার ওপরেই বিতৃষ্ণা আনব কেন ? তাহলে তো সব ফুরিয়ে যাবে। নিজের জীবনকে ভাল না বাসলে কিসের জন্য আমি লড়াই করব ? আমার লড়াই তা হলে একটা ফাঁকা আদর্শের জন্য লড়াই দাঁড়িয়ে যাবে।

: যিনি সব কিছু ছেড়ে সারা জীবন শুধু লড়াই করেছেন, শুধু আন্দোলন নিয়ে আছেন, তাঁর কি ফাঁকা আদর্শের লড়াই ?

: নিশ্চয় না। তিনিও নিজের জীবনকে ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর ধাতটা বিশেষ রকমের বলে সৈনিকের জীবনটাই তাঁর ভাল লাগে। নিজের জীবনটা যদি কেউ তুচ্ছ ভাবে, জীবনটা বিস্বাদ লাগে—দশজনের জন্য সে লড়াই করতে যায় না, বনে গিয়ে তপস্যা করে।

সাধনা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

: আমি যে সভা-সমিতিতে যাব, কিছু কিছু আন্দোলনে যোগ দেব ভাবছি—

: তুমি মুক্তি চাইছ, একটু বৈচিত্র্য আর উত্তেজনা চাইছ। নইলে আমি মানুষ ভাবি না বলে তোমার প্রাণে এত জ্বালা, জীবন ঘেন্না ধরে গেল—তুমি একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে না লড়ায়ে? কিন্তু তোমার গোড়া আলগা হয়ে গেছে —তুমি জোর পাবে কোথায়? তুমি সাধারণ মানুষ, ক্রমে ক্রমে তুমি তৈরি হবে —বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তোমার লড়ায়ের ঝোঁক আসে নি, এসেছে বৈরাগ্য। তোমার সাধারণ স্বামীটা প্রাণপাত করছে তোমায় সুখী করার জন্য, সাধারণ একঘেয়ে জীবনটা কোথায় তুমি—

সাধনা আচমকা জিজ্ঞাসা করে, তুমি মদ খাচ্ছ কেন?

রাখাল বলে, তোমার জন্য। তবে তুমি যেভাবে ভাবছ, সেভাবে তোমার জন্য নয়। তুমি সত্যি দায়ী নও। আমি সন্ন্যাসীও নই, আদর্শ নিয়ে আমার দিন কাটে না, জীবনটা আমি ভোগ করতে চাই! কিন্তু এ জীবনটার ওপরেই তোমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। প্রাণ দিয়ে এত চেষ্টা করলাম—সব গেল ভেস্তে। মনের দুঃখে অবশ্য মদ খাচ্ছি না—কদিন থেকে ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব। কিন্তু মনস্থির করতে পারছিলাম না। এভাবে চলে না, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—তবু মন ঠিক করতে পারছিলাম না; ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। রাজীবের সঙ্গে একদিন খানিকটা গিলে দেখলাম—প্রাণটা ঠাণ্ডা করা যায়। রাত্রে তোমার কথা ভুলে গিয়ে ঘুমানো যায়।

: কিন্তু মদ খেলে শুনেছি—

: না, নেশা চড়লে ওসব ঝিমিয়ে যায়। বেশী খেলে বৌকে মারধোর করার ঝোঁক আসে। অন্যের কাছে তোমায় গালাগালি করেই আমার সাধ মিটে যেত। ঘুম পেলে বাড়ি আসতাম।

মন ঠিক করেছ?

করেছি।

আমায় তাড়িয়ে দেবে?

তাড়িয়ে দেব কেন? আমরা ভিন্ন থাকব।

ও! ত্যাগ করবে! মন স্থির করেছ, আর খাবে না তো?

আবার কেন খাব?

এত কথার পরেও সভায় যাওয়ার সময় হলে সাধনা বলে, চলো না দুজনেই যাই? যে কদিন একসাথে আছি ঝগড়া করে লাভ কী? সভায় তোমার আমার মত মিলবে।

রাখাল থতমত খেয়ে বলে, চলো।

পাওনাদারের তাগিদে বাড়িতে টেঁকা দায়।

সঞ্জীবের পাওনাদার।

দোকানে দোকানে দেনা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে দেনা, বাড়িওলার কাছে দেনা। চক্ষুলজ্জার বালাই এখনো শেষ হয়ে যায় নি সঞ্জীবের, সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। শেষরাত্রে উঠে আশা রান্না করে, ভোর-ভোর খেয়ে সঞ্জীব বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফেরে অনেক রাত্রে।

পাওনাদার তাগিদ দিতে এলে সে প্রথমে আশাকে বলেছিল, বলে দাও বাড়ি নেই।

: আমি বলতে পারব না।

তারপর সঞ্জীব সকাল থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত বাইরে কাটাবার ব্যবস্থা করেছে।

বাড়িভাড়া নিয়ে মুশকিলে পড়েছে রাখাল। নিজে বাড়িওলা না হয়েও সে দাঁড়িয়ে গেছে সঞ্জীবের পাওনাদার। বাড়িটা সে ভাড়া নিয়েছিল নিজের নামে, সঞ্জীবকে ঘরভাড়া দিয়েছে সে। বাড়িওলা মাসে মাসে সমস্ত অংশের ভাড়া তার কাছে আদায় করে নেয়, সঞ্জীবের টাকাটা সে পায় না।

তিন মাসের টাকা বাকি পড়েছে। চারিদিকে তার যেমন ঋণের বহর, ভাড়া পাবার আশা রাখাল রাখে না।

নতুন মাসের পয়লা তারিখে অনেক রাত্রে সঞ্জীব বাড়ি ফিরতেই রাখাল রাগারাগি করে কড়া সুরে বলে, মাইনে পেয়েছেন, আমার টাকাটা এখুনি দিয়ে দিন।

: আজ বেতন পাই নি। কাল পেলেই আপনাকে দিয়ে দেব।

পরদিন দুপুরে রাখাল বাড়ি নেই, সঞ্জীব একটা লরী নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তাড়াহুড়ো করে মালপত্র যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই গাড়িতে তুলতে আরম্ভ করে।

আশা এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়।

: আমরা চললাম।

: কী ব্যাপার?

: ব্যাপার আর কী, পালিয়ে যাচ্ছি। আমায় কিছু জানায় নি, একেবারে গাড়ি নিয়ে এসেছে। বলছে পাওনাদারের জ্বালায় টেঁকা যাবে না। কিছুদিন সময় নিয়ে সামলে নিই, তারপর সকলের টাকা শোধ দিয়ে দেব।

: কিন্তু আপিসে গিয়ে সবাই ধরবে না ?

: আপিস কোথা—আপিস নেই। চাকরি থেকে ক-মাস আগে ছাঁটাই হয়েছে। কাল টের পেলাম।

তার শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সাধনার ভিতরটা শিরশির করে ওঠে। আজকালের মধ্যে যার প্রসব-বেদনা জাগার সম্ভাবনা, নিঃসম্বল নিরুপায় স্বামীর সঙ্গে সে কোথায় চলেছে কে জানে।

খাওয়া-পরার কষ্ট সইতে পারে না বলে চাকরি থাকতে ধার করতে শিখেছিল। চাকরি যাবার পর সেই উপায়ে কয়েক মাস চালিয়েছে। পালিয়ে গিয়ে সে নয় পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচবে—কিন্তু আশাকে সে বাঁচাবে কী করে, নিজে বাঁচবে কী দিয়ে ? ঋণ করার অফুরন্ত উৎস তো মানুষের থাকে না।

: আমার কাছে থেকে যাও। আমি যে ভাবে পারি—

শীর্ণ বিবর্ণ মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফোটে আশার।

: সে তো বাপের বাড়ি গিয়েও থাকতে পারি। না ভাই, মরতে হয় ওর কাছে থেকেই মরব। ভাড়ার টাকাটা বাকি রয়ে গেল—

হাসিটুকু মিলিয়ে যায় আশার।

: জীবনে আর কারো সঙ্গে ভাব করব না। আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? তোমার সঙ্গে ভাব করে তোমাদের ঠকিয়ে পালাচ্ছি, ঠকাবার জন্যই যেন ভাব করেছিলাম।

: তোমার কী দোষ ?

: দোষ বৈকি। অনেক আগেই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল। আমি কি ওর সঙ্গে পালাতাম ভেবেছ ? কী করব, দায়ে ঠেকেছি। অনেক পাপ করে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি।

বাড়ি ফিরে সব শুনে রাখাল রেগে টং হয়ে বলে, আমার এতগুলি টাকা মেরে দিলে !

: একলা তোমার নয়। অনেকের মেরেছে।

: এসব মানুষকে ধরে চাবকানো উচিত !

বাসন্তী বলে, আহা বেচারী ! কী করবে ? যা দিনকাল। ভদ্রঘরের ছেলে, নরম ধাত নিয়ে গড়ে উঠেছে। ঠেলায় পড়লে কি সামলাতে পারে ? জিনিস-পত্রের দামে যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের পুড়িয়ে মারা উচিত ! মাইনেতে কুলিয়ে গেলে কি বেচারা ধার শুরু করত, এভাবে ডুবত ?

রাখাল সঞ্জীবকেই চাবকাতে চেয়েছিল। বাসন্তী তাকে দোষী করতে রাজী নয়।

সাধনা বলে, ধারের জন্য কিন্তু চাকরিটা যায় নি। আপিসের কর্তার সঙ্গে তর্ক করেছিল।

বাসন্তী বলে, ওমা! এত তেজও ছিল মানুষটার? তবেই দেখো, মানুষ কি আর ছাঁচে গড়া হয়! একটা মানুষের মধ্যে কত রকমের ধাত মেশাল থাকে। এদিকে বেহায়ার মত ধার করে, অন্যদিকে তেজ দেখাতে গিয়ে চাকরি খোয়ায়।

আনমনে কী যেন ভাবে বাসন্তী।

সাধনা বলে, খালি-খালি লাগছে বাড়িটা।

বাসন্তী বলে, আমি আসব। বাড়িতে হাট বসিয়েছে, খুঁজতে বলে দিয়েছি—আর খুঁজতে হবে না। ভাড়াও কম লাগবে।

: ওই একখানা ঘরে হবে? মালপত্র আঁটবে তোর?

: আঁটালেই আঁটবে। গাদাগাদি ঘেঁষাঘেঁষি হবে।

কদিনের অসুখে শোভার দাদার বৌ মারা যায়। বাঁচানো যেত, তবু মারা যায়।

চোখে জল, মুখে রেহাই পাবার নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে শোভা এসে ধরা গলায় বলে, বৌদিই শেষে আমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

শোভা চোখ মোছে। আবার চোখে জল আসে। হাসবে বলে কাঁদে।

: এবার একটা লোক রাখতেই হবে—তার বদলে আমি খাটব। এবার জোর গলায় বলতে পারব, বিয়ে ভেঙে দাও।

সাধনা চুপ করে থাকে।

শোভা বলে, আমি কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করেছিলাম সাধনাদি। আপনারা তো কাজ-টাজ জুটিয়ে দিলেন না, আমি নিজেই জুটিয়েছিলাম।

: কী কাজ?

: রাঁধুনীর কাজ। আর কী কাজ জোটাব বলুন? আর কী শিখেছি রান্না করা বাসন মাজা ছাড়া? ও বাবা, রাঁধুনীর কাজ জোটানোও কী কঠিন ব্যাপার! কেউ আমাকে রাখতে চায় না! বিনয়বাবুর রাঁধুনী পালিয়েছে, আমি গিয়ে ধরে পড়লাম আমাকে রাখতেই হবে। বিনয়বাবু সুহাসিনীদি দুজনেই কিছুতে রাজী হল না। আমি যত জোর করি, ওরা তত বলে, না বাবা, তোমায় রাখলে তোমার বাপদাদা গোলমাল করবে। প্রভাতবাবুর বামুনটা দেশে যাবে শুনে আমি গিয়ে ধরে পড়লাম, ওরাও কিছুতে রাজী হয় না। আমার বাপদাদা হাঙ্গামা

করবে। ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে জন্মানো কি ঝকমারি ভাবুন তো? শেষকালে প্রভাতবাবুর বন্ধু বামাচরণবাবু বললেন, পাড়ার এত কাছে রাঁধুনীর কাজ নেওয়া তো উচিত নয়, বাপ-ভায়ের একটা সম্মান আছে তো? দূরে এক বাড়িতে আমায় কাজ জুটিয়ে দেবেন। ভদ্রলোক আবার একটা কবিতার বই লিখেছেন।

সাধনা গম্ভীর হয়ে বলে, বৌদি মরে গিয়ে সত্যি তোমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। বুড়োর হাত থেকে শুধু নয়, আরেকটা সর্বনাশের হাত থেকে। বামাচরণ তোমায় রাঁধুনীর কাজ দিত বিশ্বাস করলে তুমি?

শোভাও গম্ভীর হয়ে বলে, না দিলে না দিত। যে কাজ দিত তাই করতাম।

: তবু বাড়িতে বলতে না বিয়েতে তোমার মত নেই?

: আপনি বুঝছেন না। কোন মুখে বলতাম? ওরা আমাকে খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্পষ্ট কথা। ঝি রাঁধুনী হিসাবেও পুষতে পারবে না—ঠিকে ঝি শুধু বাসন মাজত, তাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে ঠিক হবার পর বাড়িতে আমায় কোন কাজ করতে দিত না। রাঁধতে গেলে বাসন মাজতে গেলে বৌদি বলত, থাক থাক, দুদিন বাদে আমাকেই তো সব করতে হবে। মাও সায় দিত বৌদির কথায়। এবার উপায় নেই, লোক রাখতেই হবে। বৌদি মারা যাবার ঠিক দুদিন পরে দাদা সুর পালটে মাকে বলেছে, বড্ড বুড়ো, শোভাকে ওর হাতে দিতে আমার মন সরছে না! ছেলেমেয়ে রাখছি রাঁধছি বাড়ছি—আমাকে ছাড়া তো এখন চলবে না। নিজেরাই এবার বিয়ে ভেঙে দেবে, আমার কিছু বলারও দরকার হবে না।

শোভা একটু হেসে খোঁচা দিয়ে বলে, আপনি বুঝবেন না সাধনাদি। রাখালবাবু বেশ রোজগার করছেন, স্বামীর আদরে একটি বাচ্চা নিয়ে সুখে আছেন -আমাদের ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।

কথা হচ্ছিল রান্নাঘরে। রাখাল দাড়ি কামিয়ে তেল মাখতে এসে রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনছিল।

এবার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে বলে, তুমিও কিন্তু ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থাটা ঠিক জানো না শোভা। তুমি শুধু তোমাদের একটা ঘর দেখেছ। স্বামী বেশ রোজগার করে আনলেও ভদ্রঘরে সুখশান্তি থাকছে না।

আগে হলে সাধনা চটে যেত। রাখালের আসল জ্বালাটা টের পেয়েছে বলে আজ সে একটু বিরক্তও হয় না।

শোভা চটপট জবাব দেয়, কী করে থাকবে? দশটা ভদ্রলোকের ঘরে সুখশান্তি থাকবে না—একটা ঘরে শুধু খানিকটা রোজগার হচ্ছে বলে কখনো তা থাকে?

রাখাল একটু ভড়কে যায়।

সরষের তেলের শিশিটার দিকে চেয়ে দেখতে পায়, শুধু তার গায়ে মাথার মতই একটু তেল অবশিষ্ট আছে। সে পাঁচ ছটাক করে তেল আনে—একবারে বেশী তেল আনলে সাধনা নাকি বেশী তেল খরচ করে!

তার বেশ রোজগারের এটাই তো বেশ একটা নমুনা।

কিন্তু হার রাখাল মানবে না কিছুতেই। অন্তত তকে তার জেতা চাই, কথায় জেতা চাই।

সে বলে, কিন্তু শোভা, তোমার দাদা তো আবার বিয়ে করবে। বাড়ির চাকরি তখন তো থাকবে না তোমার?

: দাদা আবার বিয়ে করবে? আগে চাকুরে লোক বৌ মরতে মরতে আবার বিয়ে করত। সেদিন আছে আজকে? বৌদির জন্য কাঁদতে কাঁদতে দাদা একথাও ভাবছে না যে বাঁচা গেছে, একটা বোঝা কমেছে, রেহাই পেয়েছি? আবার একটা বৌ এনে বোঝা বাড়াবে দাদা? আপনারা শুধু আগের দিনের হিসাব কষছেন, ব্যাপার কিছু বুঝছেন না।

সাধনা ও রাখাল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

আগের দিনের হিসাবের জের টানছে ওরা!

শুধুই কি পরের বেলা? নিজেদের বেলা নয়?

রাখাল তবু গোঁয়ারের মত গায়ের জোরে মুখে হাসি ফুটিয়ে হালকা তামাসার সুরে বলে, আমায় বিয়ে করবে শোভা?

শোভা বলে, এক্ষুনি। সাধনাদির সতীন হব, সে তো আমার ভাগ্য!

প্রভাতের কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। কবে কারখানায় কাজ শুরু হবে, কবে দুর্গা বিষ্ণুরা ফিরে আসবে, তারই প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে থাকে বলে মনে হয় খুবই যেন ধীরে ধীরে উঠছে শেডটা।

বাসন্তী আসবে বলেও এ বাড়িতে উঠে আসে নি। বলেছে, থাকগে ভাই, এইটুকু ঘরে ওঁর অসুবিধা হবে সত্যি!

আসলে মায়া কাটাবার মানুষ তো নয় বাসন্তী! উড়ে এসে যারা তার ঘরবাড়ি দখল করেছে ভাড়াটে হয়ে উড়ে এসে, তারাই তাকে বেঁধেছে নতুন মায়ায়। একপাল ছেলেমেয়ে সমেত চরণ দাসের পরিবারটি বাড়িতে ভিড় করায়

তার দম আটকে এলেও ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বাসন্তীর।

তাড়াতাড়ি উঠে গেলে অন্য কথা ছিল। এক বাড়িতে মানুষ বাস করলে তাদের বেশীদিন এড়িয়ে চলা, একপাশ ছেলেমেয়ে হৈ-চৈ করে বলে খারাপ লাগা কি আর বাসন্তীর পক্ষে সম্ভব।

নিরীহ গোবেচারী রাধাকে হাসি মুখে চব্বিশ ঘণ্টা সংসার নিয়ে বিব্রত হয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু গরম গরম মমতা বোধ করে বাসন্তী, নীচের তলায় গিয়ে তার সংসার করা দেখতে দেখতে তাকে মায়া করতে তার ক্রমেই যেন বেশী বেশী ভাল লাগে।

তার মেয়েটাকে প্রায় বেদখল করে ফেলেছে রাধার বড় তিনটি ছেলে মেয়ে। তাদের বাচ্চা ভাইটি বড় রোগা, খেলাধূলা করে না, হাসে না, আদর সইতে পারে না। বাসন্তীর নাদুসনুদুস মেয়েটাকে ওরা তাই কাড়াকাড়ি করে কোলে নেয়, আদর করে, খেলা দেয়।

আর রাধার রোগা বাচ্চাটার বড় বড় চোখের করুণ চাউনি দেখে এমন মায়া হয় বাসন্তীর যে দিনে দশ বার তাকে না নিয়ে সে পারে না।

কাজেই বাড়ি বদলের কথাটা এখনো মুখে বললেও কাজে আর সেটা হয়ে ওঠে না।

রাখাল বলে, ওর বাপের বাড়িতে নিশ্চয় অনেক লোক?

সাধনা বলে, মস্ত সংসার।

: বিয়ের পর শুধু একলাটি থাকা অভ্যাস। ভাড়াটের ভিড় আসতে প্রথমটা একটু খারাপ লেগেছিল, এখন আবার ভাল লাগছে।

: তুমি দেখছি মনস্তত্ত্বে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠেছ।

রাখাল চেষ্টা করে একটু হাসে।

সাধনাও হাসে।

সিদ্ধান্ত তাদের বজায় আছে। রাখাল মন ঠিক করে ফেলেছে যে আর নয়, এবার তারা ভিন্ন বাস করবে। সাধনাও সেটা মেনে নিয়েছে শান্তভাবেই।

সেজন্য দুজনেই তারা পরস্পরকে কী দিলাম আর কী পেলাম তার হিসাব, বিরোধ আর তিক্ততার হিসাব, নিয়ে মাথা ঘামানো স্থগিত রেখেছে।

যে কদিন একসাথে আছে ঝগড়া করে লাভ কী?

সব চাওয়া পাওয়া কলহ বিবাদের চরম মীমাংসা তো হয়েই গেছে, আর মিছে কেন কামড়াকামড়ি করা?

স্বামী-স্ত্রীর মত থাকলেও তারা যেন আর স্বামী-স্ত্রী নেই। দুটি বন্ধু কিছুদিন একসাথে বাস করছে, যথাসময়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে দূরে চলে যাবে। প্রত্যাশা নেই, রোমাঞ্চ নেই, উন্মাদনা নেই, ভাবের আকাশের ঝড় থেমে গেছে।

নতুন ভাড়াটে এসেছে আশাদের ঘরে।

চেনা ভাড়াটে। সুমতি আর তার স্বামী অশোক।

সুমতির বিয়ে হল হঠাৎ। বিয়েটা অবশ্য তাদের স্থির হয়েছিল অনেক কাল আগে থেকেই। অশোক মেসে থেকে চাকরি খুঁজছিল বহুদিন, একটা চাকরি পেয়ে যাওয়ায় সুমতিকে বিয়ে করেছে।

তার আপনজনেরা থাকে পশ্চিমে। বিয়ে উপলক্ষে তারা এসে আবার ফিরে গেছে। সুমতিকে নিয়ে অশোক নীড় বেঁধেছে আশাদের ঘরে।

গড়া নীড় ভেঙে পড়ায় এ ঘর থেকে পালিয়ে গেছে সঞ্জীব আর আশা, নতুন চাকরি নিয়ে সুমতি আর অশোক এসে উঠেছে সেই ঘরে।

সুমতি বলে, আমিও একটা চাকরি পেয়ে গেলাম নইলে কি আর একজনের সামান্য মাইনের ভরসায় আমরা বিয়ে করতাম? দুবছর অপেক্ষা করে আছি, আরও দু-এক বছর অপেক্ষা করতাম।

বলে, এখনও কিরকম সব পচা ব্যবস্থা চালু আছে দেখুন। চাকরি পেলাম বলেই কি বিয়ে করলাম? বিয়ে করলাম বলেই আবার চাকরিটা পেলাম! ম্যারেড মেয়ে চাই—বিয়ে না হলে চাকরিটা পেতাম না। সামান্য বেতন, একজনেরি ভাল চলবে না, সেজন্য আবার ম্যারেড হাওয়া চাই।

নব-দম্পতি। ভালবাসার বিয়ে—দুবছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর।

সাধনা ভেবেছিল, কত কাণ্ডই না জানি করবে দুজনে। ভালবাসার কত বিচিত্র লীলাখেলা দিয়ে রোমাঞ্চকর করে তুলবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মিলনকে।

রাখালকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাবার দিনটির প্রতীক্ষা করতে করতে তার কি সহ্য হবে চোখের সামনে ওদের উদ্দাম উচ্ছল ভালবাসা, সরস মধুর মিলন, পৃথিবীতে স্বপ্নজগৎ রচনা করা?

দুজনের কাণ্ড দেখে সে থ বনে যায়। সে যেমন ভেবেছিল সে রকম কিছুই দুজনকে করতে না দেখে।

হাতে যেন স্বর্গ তারা পায় নি, সুখে আনন্দে অন্তত কিছুদিনের জন্য দিশেহারা হবার মত কিছুই যেন ঘটে নি!

মিলনটা যেন তাদের একটা সাধারণ ঘটনা।

দুজনের আনন্দ টের পাওয়া যায়। সুমতির মুখে কেমন একটু রুক্ষতার ছাপ ছিল, সেটা উপে গিয়ে নতুন লাবণ্যের সঞ্চারটা স্পষ্টই চোখে পড়ে।

দুজনে সুখী হ'য়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু দুজনের হাসি গল্প মেলামেশা ঘরকন্না সবই যেন শান্ত আর সংযত। হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্দামতা নেই।

একদিন রাত্রে ওরা দুয়ার বন্ধ করলে সাধনা চেষ্টা করেও নিজেকে ঠেকাতে পারে না, খানিকক্ষণ চুপিচুপি দুয়ারের ফুটোয় চোখ পেতে উঁকি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে মনে হয়, সে যেন নতুন রকম ম্যাজিক দেখে এল।

বিয়ের এতকাল পরে সংঘাতে সংঘাতে সম্পর্ক একরকম ছিঁড়ে যাবার পর, ভিন্ন হয়ে শান্তিতে থাকা ঠিক করার পর, তার আর রাখালের সম্পর্ক যেমন দাঁড়িয়েছে, রুদ্ধ ঘরের গোপনতায় ওই নব বিবাহিত মানুষ দুটির সম্পর্কও প্রায় সেই রকম —উচ্ছ্বাস নেই, গদগদ ভাব নেই।

তফাত শুধু এই যে তাদের ঝিমানো নিস্তেজ ভাবের বদলে ওরা অনেক বেশী সতেজ, হাসিখুশী।

রাখালকে কয়েকদিন খুব চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

বাসন্তীর কাছেই কারণটা জানতে পারায় সাধনা তাকে আর কোন প্রশ্ন করে নি।

কোথা থেকে সংগ্রহ করে রাখাল নাকি আরও দশ হাজার টাকা ব্যবসায়ে লাগাবে।

তাদের দুজনের বর্তমান দোকানে নয় নতুন একটা ব্যবসায়ে।

দশ হাজার টাকা দিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করবে রাখাল। কোথায় টাকা পাবে, কিসের ব্যবসা করবে কোন কথাই সে সাধনাকে জানায় নি!

আগে হলে সাধনা ক্ষেপে যেত, এখন নিশ্বাস ফেলে সে শুধু ভাবে, না জানাবারই কথা। তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কি?

নাঃ, আর দেরি করা নয়। এবার সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে দাদার কাছে চলে যাবে।

কিন্তু পরদিন রাখাল নিজে থেকেই তাকে সব জানায়। বলে, কদিন ধরে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলাম। তোমার কি মনে হয় বল তো?

সতীশের অসুখটা চাপা পড়েছে কিন্তু দেহের অনেক কালের অনেকগুলি চাপা

রোগ তাকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। আরও কিছুকাল বাঁচবে, কিন্তু বিছানাতেই কাটবে তার বেশীর ভাগ সময়।

বিশুর মা অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়েছে। কিছু আয়ের ব্যবস্থা না হলে এভাবে আর কতদিন চলবে ? পুঁজি কমছে—কিছুকাল পরে পুঁজি খাটিয়ে আয়ের ব্যবস্থা করার উপায়টাও হাতের বাইরে চলে যাবে।

একটা ব্যবস্থা রাখালকে করে দিতেই হবে এবার। ছেলের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে রাখাল তার। রাখাল নিজে কী অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় সামনে উঠেছে বিশুর মা তা জানে, রাখাল তার জন্য একটা উপায় করে দিক।

: গয়না বেচে হাজার দশেক টাকা দেবেন। আমি ভাবছি দায়িত্বটা নেওয়া যাক। নতুন ব্যবসায়ে খাটানো যাক টাকাটা। আমিও ওঁর কাছে ঋণী—

: ঋণী—?

: তোমার কাছে একটা কথা গোপন করেছিলাম। রাজীবের সঙ্গে দোকান করার টাকাটা বিশুর মা'র কাছেই পেয়েছিলাম।

: ও!

: সে উপকার ভোলা যায় না। প্রাণ দিয়ে খেটে নতুন ব্যবসাটা যদি দাঁড় করাতে পারি—আমার খাটুনির দামে ওই ঋণটাও শোধ হবে, পরে লাভের অংশও পাব।

: কী ব্যবসা করবে ?

: ভাবছি, যে সব ব্যবসার কিছুই জানি না তার কোন একটার মধ্যে না গিয়ে এতদিন যে কারবারের খুঁটিনাটি জানলাম বুঝলাম সেটাই করব। দোকান আছে থাক, ওই সঙ্গে বিড়ি বানাবার ছোট একটা ফ্যাক্টরি করব। শুধু ব্যবসা নয়, এর আর একটা দিকও আছে। কতকগুলি লোককে খেটে খাবার সুযোগ দিতে পারব।

: না চললে, টাকাটা নষ্ট হলে, তোমার দায়িত্ব কি ?

: এমনি কোন দায়িত্ব থাকবে না। ইচ্ছা করলে টাকাটা আমি মেরেও দিতে পারব। আমাকে এতটা বিশ্বাস করছেন, এ সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।

: আশ্চর্য ব্যাপার আবার কি ? মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে না সংসারে, চেনা-জানা মানুষকে ? এতদিন দেখছেন তোমায়, বুঝতে পেরেছেন বিশ্বাস করতে হলে তোমাকেই করা যায়। ওর বোন তো তোমাকে প্রায় দেবতার মত ভক্তি করে।

শান্তভাবে সহজভাবে তারা কথা বলে।

: কে বলতে পারে, ছোটখাট বিড়ি ফ্যাক্টরি থেকেই হয়তো বিশুর মা আর আমাদের কপাল ফিরে যাবে। হাজার বিড়িতে কিছু বেশী মজুরিও হয়তো দিতে পারব।

এ কথাটাও এমনভাবে বলে রাখাল যে বেশ বোঝা যায় আশা ও আবেগ উদ্দীপনা জাগিয়ে সাধনার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা সে সত্যই ত্যাগ করেছে, সাধনাকে বিশ্বাস করানোর প্রয়োজন যেন তার সত্যই ফুরিয়ে গেছে।

ইচ্ছা করলে সাধনা সোজাসুজি প্রতিবাদও করতে পারে। বলতে পারে, ছাই পারবে, তোমার দ্বারা কিছু হবে না ওভাবে কোন কথা না বললেও সাধনা তাকে সাবধান করে দেয়, বলে, রাজীববাবুর পরামর্শ নিও। উনি এ লাইনে অনেককাল আছেন।

নিজে উদ্যোগী হয়ে তাড়াতাড়ি দাদার কাছে যাবার ব্যবস্থা করার কথাটা এরপর সাধনা ভুলে যায়।

প্রভাতের কারখানার শেডটা উঠছিল ধীরে ধীরে, হঠাৎ একদিন খুব তাড়াতাড়ি কাজ এগোচ্ছে দেখা যায়।

চশমাপরা প্রৌঢ়বয়সী মোটাসোটা অচেনা এক ভদ্রলোককে মোটরে চেপে প্রতিদিন কাজ পরিদর্শন করতে আসতে দেখা যায়।

বিড়ির কারখানা আরম্ভ করা নিয়ে রাখাল খুব ব্যস্ত ছিল, তবু পরদিন সে ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তার মোটর এলে কথা বলতে যায়।

ফিরে আসে ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে।

বলে, প্রভাত সত্যিই আমাদের ভাঁওতা দিয়েছে।

: কী ব্যাপার?

: কারখানা করবার কোন মতলব প্রভাতের ছিল না। সব এই ভদ্রলোককে বেচে দিয়েছে। ওদের উঠিয়ে না দিলে জমি বিক্রি হয় না, তাই ওসব ভাঁওতা দিয়েছিল। ফ্যাক্টরি করবে, সকলকে কাজ দেবে, থাকবার ঘর করে দেবে,--সব বাজে কথা। রামাচরণ মাঝখানে ছিল, দুজনের কাছে কমিশন বাগিয়েছে।

রাগটা প্রভাতের উপর, কিন্তু সে তো আর সামনে নেই, সাধনার দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে থাকে যে মনে হয় এখুনি সাধনাকেই মেরে বসবে!

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, তোমার কথাই ফলল। আমায় বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিল।

সাধনা শান্তভাবে বলে, তোমার একার দোষ নয়, আরও অনেকে তো ছিল। এঁকে সব কথা বললে না?

: বললাম বৈকি! ইনি বললেন, প্রভাত কী বলেছে না বলেছে তার দায়িত্ব ইনি নেবেন কেন? কারখানায় আনাড়ি লোক দিয়ে কী করবেন? তবে ছুটকো কাজের জন্য দরকার হলে দু-এক জনকে নিতে পারেন—সে তখন দেখা যাবে!

সাধনা ফোঁস করে ওঠে।

: ইস, বললেই হল দেখা যাবে। প্রভাতবাবু নিজের হাতে লিখে দিয়েছে, জমি যে কিনবে ওই চুক্তিটাও তাকে মানতেই হবে। অত আইন বাঁচিয়ে বজ্জাতি করা চলবে না। এতগুলি লোকের কাছে কথা দিয়েছে সেটা ঢের বড় আইন।

সাধনা সত্যি রেগেছে। এতকাল রাগ দেখাত শুধু তারই উপর, বুঝি রাখালের চোখে পড়ত না তার রাগের ভঙ্গিটা কত সুন্দর। এক অন্যায় কারসাজির বিরুদ্ধে তাকে রাগতে দেখে রাখাল আজ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

সে হেরে গিয়েছে। প্রভাত বজ্জাতি করবে কি করবে না এই নিয়েই কি তীব্র মন কষাকষি হয়ে গেছে তাদের—প্রকাশ্য সভায় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কলোনির লোকেদের পক্ষ নেওয়ায় সাধনাকে সে প্রায় শত্রু মনে করে বসেছিল।

সাধনার কথাই ফলেছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সাধনার কাছে হেরে গিয়ে এতটুকু জ্বালা তো রাখাল বোধ করছে না! বরং কি ভাবে যেন জুড়িয়ে গেছে সাধনার উপর রাগ আর অভিমানের জের।

অন্যায়টা বড় হয়ে ওঠায় তাদের দুজনেরি এবার অন্যায়টার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে জেনে তারা যেন সরে এসেছে কাছাকাছি, তুচ্ছ হয়ে গেছে তাদের সংঘাত।

সাধনা বলে, কাজেই একটা মিটিং ডাকতে হবে। এ ভদ্রলোককে জানিয়ে দিতে হবে জমি আর কারখানা কেনার সঙ্গে উনি প্রভাতবাবুর চুক্তিটাও কিনেছেন।

রাখাল বলে, নিশ্চয়। কলোনির ওদের সঙ্গে আগে কথা বলা দরকার।

: ঠিক বলেছ। ওরা প্রত্যাশা করে আছে, ব্যাপারটা ওদের জানাতে হবে। চলো না, তুমি-আমি এখুনি যাই? আলু-কুমড়োর তরকারি আর ডাল হয়েছে, এসে তোমায় বেগুন ভেজে দেব।

: তাই চলো।

সাধনা শুধু একনজর তাকায় পরনের কাপড়টার দিকে, বদলায় না। শুধু চুলটা একবার আঁচড়ে নিয়ে স্যাণ্ডেলে পা গলায়।

বলে, পয়সা নিও, মাখন আনতে হবে। এমনি মাখন খাবে, পাতে খাবার

সময় একটু একটু গালিয়ে ঘি করে দেব'খন।—এ আবার কী? একেবারে চমকে গেছি।

অনেকক্ষণ এভাবে রাখাল আচমকা তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে নি, সাধনার তাই চমক লেগে খানিকক্ষণ বুকটা ধড়াস ধড়াস করে!

পথে নেমে চলতে চলতে রাখাল বলে, সেদিন তোমায় অনেক কথা শুনিয়ে ছিলাম। আমার হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল।

: আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠিক ধরতে পারি নি, কিন্তু একটু খাপছাড়া মনে হচ্ছিল কথাগুলি। ঠিক কথাই যেন বলছ কিন্তু কোন একটা হিসাবে যেন গোলমাল হচ্ছে।

: আসল হিসাবেই গোল হয়েছিল। আমি যে বলেছিলাম স্বামীর স্বার্থ সম্পর্কে তুমি উদাসীন হয়ে গেছ, সাধারণ স্ত্রীর জীবনে তোমার বিতৃষ্ণা এসেছে—ওটা ভুল বলেছিলাম।

: জীবনে আমার বিতৃষ্ণা আসে নি মোটেই! তবে তোমার সম্পর্কে মনটা বিগড়ে গেছে কিনা ঠিক জানি না। মিথ্যে বলব কেন, আগের মত ভাবতে পারি না তোমাকে। তুমি আদর করবে আর আমি আহ্লাদী খুকীর মত গলে যাব ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে!

: আমারও করবে। আসলে আমিই মনে মনে চাইতাম আমরা আবার আগের মত হই, আগের জীবনটা ফিরে আসুক! তুমি বিগড়ে গিয়েছ, তোমার জন্য সেটা হচ্ছে না ভেবে তোমায় দোষী করেছিলাম। দোষ হয়তো তোমার আছে খানিকটা, কিছু বাড়াবাড়ি সত্যি করেছ—কিন্তু সেটা তোমার একার দোষ নয়। আমিও বুঝতে না পেরে বাড়াবাড়ি করেছি। তোমার পক্ষে যেমন হওয়া বা দেওয়া আর সম্ভব নয়, তাই দাবি করেছি। আসল কথা কী দাঁড়িয়েছে সেটাই হিসেব করি নি। আমাদের আগের জীবন আর ফিরে আসবে না। বাস্তব জগৎ যতটা পালটেছে আর আমরা যে অবস্থা আর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসেছি তাতে অনেক কিছু অবাস্তব অসম্ভব হয়ে গেছে—স্বামী-ভক্তি-টক্তি অনেক কিছু।

রাখাল একটা বিড়ি ধরায়।—অন্য রকম ভাবলেও আমি আসলে কিন্তু ভুল করে তোমার কাছে একটু স্বামীভক্তিই চাইছিলাম।

রাখাল হাসে।—তুমি ওটা দিতে পারলে আমার চৈতন্য হত নিশ্চয়, দেখতাম আমার কাছেও মিথ্যা হয়ে গেছে জিনিসটা, বিশ্রী লাগছে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন রকম সম্পর্ক সম্ভব নয়। এটাই হবে শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ-

ভালবাসার মূল কথা যে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। আমরা একদেহ একপ্রাণ, আমি খেলে তোমার পেট ভরে, ওসব ফাঁকি আর চলবে না।

বাসের জন্য বড় রাস্তার মোড়ে সুমতি আর অশোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। দুজনে একসঙ্গেই চাকরি করতে বেরিয়েছে।

সাধনা বলে, ওদের কিছু বোলো না এখন। আপিসে লেট হয়ে যাবে। ফিরে এসে তো শুনবেই সব।

মোড়টা পেরিয়ে জোর দিয়ে রাখাল বলে, আমি রোজগার করি, তুমি ঘরে বসে খাও--এজন্য কিছুটা ফাঁকি থাকবেই আমাদের সম্পর্কে—সব দিক দিয়ে তোমাকে আমার সমান মানুষ আমি কিছুতেই ভাবতে পারব না। সেটা হবে অবাস্তব স্বপ্ন দেখা – নিজেদের ফাঁকি দেওয়া। তবু মোটামুটি ওটাই হবে আমাদের নতুন সম্পর্কের ভিত্তি। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা আমাদের ভাল লাগবে। মাসখানেক আমরা তো দিব্যি আছি।

: সত্যি।

: কত বিষয়ে আমাদের ভুল বোঝা রয়ে গেছে, ভিন্ন হব ভেবে মনমরা হয়ে যাচ্ছ, কী রকম বিশ্রী বাধো বাধো ভাব রয়ে গেছে— তবু একটা মাস বেশ কাটল আমাদের। জঞ্জাল সাফ করে নিলে আমরা আরও ঢের বেশী সুখে দিন কাটাবো— ঝগড়া করতেও আবার মজা লাগবে মাঝে মাঝে ঝাল খাওয়ার মত।

সাধনা হাসে। বলে, খোকাকে বাসন্তীর কাছে রেখে এসেছি। কথা আমাদের সারা জীবনে ফুরাবে না, পা চালিয়ে এগিয়ে চলো।

সমাপ্ত